Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মুসলিম উম্মাহর অধঃপতনের কারণ ও প্রতিকার

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

Marjana Akter

রোলঃ 228021647

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মুসলিম উম্মাহর অধঃপতনের কারণ ও প্রতিকার

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

Marjana Akter
রোলঃ 228021647

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " মুসলিম উম্মাহর অধঃপতনের কারণ ও প্রতিকার " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে Marjana Akter, আইডিঃ 228021647 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " মুসলিম উম্মাহর অধঃপতনের কারণ ও প্রতিকার " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: মুজিবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

Marjana Akter

আইডিঃ 228021647

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

পাথেয় ছাড়া সফর
আল ওয়াহহান
দ্বীনের জন্য কুরবানি না করা
নফসের গোলামি
জানমাল খরচ না করা
ভুল প্রায়োরিটি লিস্ট

প্রতিকারের উপায়সমূহ

রবকে চেনা
দ্বীনের প্রকৃতরূপ উপস্থাপন
ফরজিয়্যাতের ব্যাপারে সজাগ করানো
ইলমের সাথে থাকা
নিয়তের পরিশুদ্ধি
কিতাব অধ্যয়ন ও চশমা বদল
আত্মশুদ্ধি ও নেক সোহবত
সীরাহ ও সাহাবীদের জীবনী পাঠ এবং জীবন সাজানো
সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা
দাওয়াহ ও হিসবাহকে আঁকড়ে ধরা
নারীদের মাঝে ব্যাপক দাওয়াহ
শাহাদাতের তামান্না রাখা ও জিহাদ করা
দুনিয়ার মুহাব্বত ত্যাগ
আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা
দ্বীনের জন্য কুরবানি করার মানসিকতা
নফসে লাগাম পরানো
প্রায়োরিটি লিস্ট ঠিক করা
পাথেয় সংগ্রহ
তাকওয়া
ইলম
ইয়াক্বীন
তাওয়াক্কুল
শোকর
সবর
দুনিয়ার উপর আখিরাতকে প্রাধান্য
ইসলামিক সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসার ও হাকিকত জানা
আল- ওয়ালা ওয়াল বারার উপর পরিপূর্ণ আমল করা
এক উম্মাহ কনসেপ্ট ও কুরআনকে আঁকড়ে ধরা

ইখতিলাফকে পাশে রেখে জামাআতবদ্ধ হওয়া
খিলাফাত প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হওয়া

ভূমিকা

উম্মাহকে তুলনা করা হয়েছে একটি দেহের সাথে, যেন এটি একটি একক সত্তা, যার রশি হলো দ্বীন ও কুরআন। উম্মাহ আজ ক্ষতবিক্ষত, নির্যাতিত, নিপীড়িত, অরক্ষিত, পরাজিত, বিচ্ছিন্ন ও অধ:পতিত। মুসলিমদের অধঃপতনকে বুঝতে হলে বর্তমান ফিলিস্তিনকে প্যারামিটার কল্পনা করলেই বিষয়টি সহজে উপস্থাপন করা সম্ভব। ৫৭টি মুসলিম দেশ এতবড় জুলুম ও যুদ্ধের নিয়মের লঙ্ঘন করে চলে যাওয়া আগ্রাসনে সামান্য খাবার-পানীয় আর কাফনের ব্যবস্থাও করতে পারে নি। কারণ? এরা সেক্যুলার রাষ্ট্র, মুসলিমপ্রধান রাষ্ট্র কিন্তু ইসলামিক রাষ্ট্র নয়। এরা পশ্চিমা মতবাদের গোলামির জিঞ্জিরে আবদ্ধ, সামরিক দিক দিয়ে ব্যর্থতার এক বিরাট উদাহরণ। দায়িত্ব হিসেবে নিন্দা জানিয়েছে, এটুকুই। আন্দোলন হয়েছে, কিন্তু তাতে গাযার আগ্রাসন কতটুকু বন্ধ হয়েছে? এইগুলো হলো সেক্যুলার সিস্টেমের প্রতিবাদের ধরণ, যা আদতে আগ্রাসন মোকাবেলায় অকার্যকর। জিহাদ ফরজ- এই ফতোয়া জারির পরও উম্মাহর মাঝে কোনো পরিবর্তন নেই। উম্মাহর অবস্থা তো বরং এমন যে- বয়কট করার মতো ন্যূনতম একটি পদক্ষেপে হার মানছে নফসের কাছে, ধিক্কার এমন নির্দয়দের প্রতি যাদের হৃদয় মৃত। কিছু মুসলিম জিহাদ করার ব্যাপারে আগ্রহী হলেও জামাআতের নেতৃত্বের আসনটি ফাঁকা থাকায় ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও অগ্রসর হওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

পাশ্চাত্য সভ্যতা বিশ্ব-নেতৃত্বের আসন গ্রহণ করার পর নিজেদের জন্য একমাত্র হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহকে। পাশ্চাত্য সভ্যতাকে পরাজিত করে বিশ্ব-নেতৃত্ব গ্রহণ করার একমাত্র শক্তি মুসলিম উম্মাহর অনুসৃত দ্বীনের ভিতরেই আছে। ফলে পশ্চিমাবিশ্ব ইসলামের বিরুদ্ধে এক সামগ্রিক যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে - বুদ্ধিবৃত্তিক বা মনস্তাত্ত্বিক আগ্রাসন ও সামরিক আগ্রাসন। মনস্তাত্ত্বিক আগ্রাসনের একটি ময়দান হলো ইসলামের মৌলিক ধারণাকে মুসলিমদের মাঝে বিকৃত ও সংস্কারমূলক রূপে তুলে ধরা এবং বিভিন্ন শব্দের মাধ্যমে এই আগ্রাসনের বিষয়টিকে আগ্রাসন হিসেবে নয়, বরং ‘কল্যাণকামিতা’র রূপে উপস্থাপন করা। এই ধোঁকায় পড়ার কারণ ওয়ালা-বারা থেকে বিচ্যুত হওয়া। হযরত ইলিয়াস রহমাতুল্লাহি আ’লাইহি তাঁর মালফুজাত কিতাবে ওয়ালা-বারাকে দ্বীনের দুইটি ডানা সাব্যস্ত করেছেন। খিলাফাহর পতনে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধটাই তাদেরকে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করেছিল, ‘আধুনিকায়ন’-শব্দের মোড়কে সেক্যুলারিজম নামক ধর্মকে মুসলমানদের মন-মগজে প্রবেশ করানো ও খিলাফাহকে ‘সাম্রাজ্যবাদ’- শব্দে আখ্যায়িত করা। আরেকটি বিষয় হলো, ‘অবাধ যৌনতা ও অশ্লীলতা’-কে মুসলিম সমাজে

'বিনোদন' এর নামে ও 'নারী-পুরুষের সমতা'-র নামে ফ্রীমিক্সিংকে ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে আত্মিক অধঃপতনও ঘটেছে। এটা আরও একধাপ পিছিয়ে দিয়েছে উম্মাহকে। আরেকটি ময়দান হলো দুনিয়ার ভোগ-বিলাসিতা ও উন্নতিতে মুসলিম উম্মাহকে ডুবিয়ে রাখতে মিডিয়ার প্রচার-প্রচারণা, এর ফলে নিজেদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতিকেও জলাঞ্জলি দিতে দ্বিধা করেনি উম্মাহ, ফলে উম্মাহ তার মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত। 'অসাম্প্রদায়িকতা'র মুখোশে ওয়ালা-বারার মূলনীতিকে ভুলিয়ে দেওয়া, শিক্ষা-কারিকুলামে তাদের মতাদর্শকে অন্তর্ভুক্ত করে নীরবে কিন্তু সফলভাবে তাদের আগ্রাসন পরিচালনা করে পরাজিত অবস্থাকে স্থিতিশীল কিংবা আরো অধিক পরাজিত অবস্থায় নেওয়ার হীন ষড়যন্ত্রকে অব্যহত রেখেছে।

উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে এসব বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের মোকাবেলা করতে দাওয়াহ-হিসবাহ, আত্মশুদ্ধি, ফরজে আইন ইলম অর্জন, জাহেলিয়াতের স্বরুপ ও শব্দসন্ত্রাসের মুখোশ উন্মোচনের মতো কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া সময়োপযোগী ও শরীয়াহসম্মত সিদ্ধান্ত। নারীদেরকে দাওয়াহ দিয়ে ঘরে ফিরানোর পরে তাদেরকে দিয়ে সালাহউদ্দিন -এর মতো বীর তৈরি করতে হবে, এরাই উপযুক্ত পরিবেশে মুসলিমদের মুক্ত করতে ঝাঁপিয়ে পড়বে। মাওলানা ইফতেখার সিফাত(হাফিজাহুল্লাহ) তার 'হিউমান বিয়িং' গ্রন্থে বলেন, "আমাদের কর্তব্য হলো ইসলামের যেসব বিষয়কে এরা অপপ্রচারের মাধ্যমে বিতর্কিত করতে চায়, তাকে আপসহীনভাবে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা। যেসব মুসলিম ব্যক্তিত্ব ইসলামের হুদুদ, জিহাদ, খিলাফাহ, ওয়ালা বারা, হাকিমিয়্যাহ ইত্যাদির ব্যাপারে ধোঁয়াশা সৃষ্টি করে, তাদের থেকে নিজের সাবধান হওয়া এবং অন্য মুসলিমদের সতর্ক করা। নিজেদের খেয়াল-খুশি মোতাবেক ইসলাম না খুঁজে শরিয়াহর অকাট্য দলিলের আলোকে ইসলাম বুঝা।" ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর (ঘোষিত) পবিত্র জিনিসগুলোর পবিত্রতা লঙ্ঘিত হতে দেখে, তাঁর দেওয়া সীমা লঙ্ঘিত হতে দেখে, তাঁর দ্বীন পরিত্যক্ত হতে দেখে, তাঁর রাসূল ﷺএর সুন্নাহকে অবহেলিত দেখে, তারপরও নির্লিপ্ত থাকে, মেজাজ ঠাণ্ডা রাখে, নীরব শয়তানের মতো চুপ করে থাকে, তার মধ্যে আর কী কল্যাণ থাকতে পারে? এমন ব্যক্তিরা আল্লাহর ঘৃণা অর্জন করার পাশাপাশি সবচেয়ে খারাপ রোগে আক্রান্ত হয়। সেই রোগ হলো অন্তরের মৃত্যু। কারণ অন্তরের জীবনীশক্তি যত বেশি হয়, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল-এর বিরুদ্ধে কিছু হতে দেখলে তা ততই রাগান্বিত হওয়ার ক্ষমতা রাখে। দ্বীনের জন্য ততই তার সমর্থ্যন ততই শক্তিশালী ও পূর্ণাঙ্গ হয়ে থাকে।" এজন্য আত্মশুদ্ধির ব্যাপারে উম্মাহকে জোর দিতে হবে, এটা অবহেলার কোনো বিষয় নয়। মনস্তাত্বিক যুদ্ধে উম্মতের মৃত অন্তরের জীবনীশক্তি ফিরিয়ে আনা অতীব জরুরি।

জামাআতবদ্ধ হয়ে যোগ্য নেতার তত্ত্বাবধানে দাওয়াহ-জিহাদ করে খিলাফাহকে প্রতিষ্ঠা করা হবে চূড়ান্ত সমাধান, তবে হক্কানি আলেমের নির্দেশেই করতে হবে। সামরিক আগ্রাসনের মোকাবেলায় এটিই সমাধান যা শরীয়াহ প্রণয়ন করেছে।

ইলমের ঘাটতি

রবকে না চেনা

সৃষ্টির উপর আল্লাহ সর্বপ্রথম যে বিষয়টি ফরজ করেছেন তা হলো স্রষ্টা আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা। তাঁর সম্পর্কে মানুষ জানতে পারলে প্রকৃতভাবে তাঁর ইবাদত করতে সক্ষম হবে। [১]

আফসোসের বিষয় হচ্ছে এই যে এই ফরজ বিষয়টি নিয়ে এই উম্মাহর অবহেলা, অথচ তারাই হলো শ্রেষ্ঠ নবীর ﷺ শ্রেষ্ঠ উম্মত। তারা মালিককে চেনে না, তারা তাঁর সম্পর্কে খুব অল্পই জানে। তাওহীদের সামগ্রিক দিক তার নিকট স্পষ্ট নয়।

সে তার জীবনের বেশিরভাগ সময় গায়রুল্লাহকে নিয়ে কাটায়, আল্লাহকে নিয়ে তাদের খুব অল্প সময় কাটে বা কারো হয়তো আল্লাহর জন্য সময়ই হয় না। আবার যতটুকু সময় সে আল্লাহকে নিয়ে কাটায়, তাতেও খুব কমই খুশু থাকে, কেবল আদায় করতে হবে বলেই আদায় করে। রবকে চেনে না, মালিককে চেনে না, গুনাহর পর গুনাহ করে যায়, মালিকের রহমান গুণের কথা সে জানে, কিন্তু তিনি যে আযীয, ক্বহহার, আ'যীম নিতান্তই সে তা স্মরণ রাখে না, লিপ্ত হয় অবাধ্যতায়। মালিক যে তাকে পিছন থেকে ডাক দেন, “হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার কারীম রবের ব্যাপারে ধোঁকায় ফেলেছে?” (৮২:০৬), সে তা ঘুণাক্ষরেও টের পায় না।

কি এক আজিব অবস্থা! সে এতটাই কম জানে তার মালিকের ব্যাপারে যে তিনি যে তাকে নাফরমানির সময় পিছন থেকে ডাক দেন তা-ও জানে না। ইমানের দাবিদার ব্যক্তি যদি জানত তার মালিক রহমান হয়ে তাকে কিভাবে ডেকে যান তাহলে তা-ই তাকে গুনাহ থেকে বাঁচানোর জন্য যথেষ্ট হতো। কিন্তু সে তাঁর রব সম্পর্কে খুব কমই জানে, এভাবে নাফরমানির চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গিয়ে মালিকের নারাজি হাসিল করে, হৃদয় হয়ে যায় কঠিন, আর কঠিন হৃদয় তো ইবাদতের স্বাদ হারিয়ে ফেলে।

ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, “অন্তর শুকিয়ে যায় যখন নিচের পাঁচটি জিনিস অনুপস্থিত থাকে......
ক.আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা
খ.তাঁর ব্যাপারে জ্ঞান
গ.আল্লাহর স্মরণ (যিকির)
ঘ.তাঁর নিকট দুআ’ ও প্রার্থনা
ঙ.এবং তাওহীদে বিশ্বাস

এর কারণ হলো, প্রবৃত্তির তেজ ও লালসা প্রতিনিয়ত হৃদয়কে দগ্ধ করতে থাকে। এতে করে হৃদয়ের শাখা-প্রশাখা ইবাদাতে বাধাপ্রাপ্ত হয়, নিস্তেজ হয়ে পড়ে। ফলে হৃদয়ও একসময় আগুনেরই উপযুক্ত হয়ে পড়ে। আল্লাহ বলেন,
فَوَيْلٌ لِّلْقَٰسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ أُو۟لَٰٓئِكَ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ

অতএব ধ্বংস সে লোকদের জন্য যাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেছে আল্লাহর স্মরণ থেকে। তারা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে নিপতিত।(৩৯:২২)[২]

আসলেই এই ৫ বিষয়ের অনুপস্থিতিতে কঠিন হৃদয় হয়ে পড়ে এবং তার একটি হলো তাঁর ব্যাপারে জ্ঞান না থাকা। কঠিন হৃদয় হক কথা গ্রহণের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে এবং আল্লাহর হুকুম থেকে দূরে সরতে থাকে। একপর্যায়ে নাফরমানি করতে করতে তথাকথিত এই কঠিন হৃদয়ের মুসলিম অধ:পতনের প্রান্তে অবস্থান করে। কারণ সে তখন পদে পদে আল্লাহকে প্রাধান্য না দিয়ে গায়রুল্লাহকে প্রাধান্য দেয়। তাকওয়া- তাওয়াক্কুল ছাড়া হয় সে সফর, কঠিন বিপদে মালিককেই দোষারোপ করে কিংবা ফয়সালাকে পারে না মানতে। ইমানী দিক দিয়ে পতন হয়।
আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহ সর্ম্পকে জ্ঞান রাখার ব্যাপারে ও গাফিলতি করার কারণে আল্লাহকে চিনতে পারছে না উম্মাহর মুসলিমরা। মুসলিমরা আজকাল ব্যস্ত দুনিয়াবি ইলম ও মান-মর্যাদার পিছনে। আসমাউল হুসনার মাঝে কেবল রহমান আর রহিম নামকেই তারা জানে, গফুর আর গাফফার রবকে তারা চিনে । চিনে না আহকামুল হাকিমীনকে, ফলে তাকে বিধানদাতা মানতে নারাজ মুসলিম নামধারীরা। মুসলিমরা চিনে না ইনসাফকারী মাওলাকে, তার হুকুমের ইনসাফের উপরই প্রশ্ন আর আপত্তি তুলে বসে। কারণ তাদের কাছে অস্পষ্ট আল্লাহর গুণবাচক নামগুলো। অবস্থা এমন যেন তার নামগুলো কেবল কয়েকটি অক্ষরের সমষ্টি কিন্তু সেগুলো যে তাঁর সিফাত এবং সেই সিফাতের অর্থ জানা যে কালিমার শর্তসমূহের একটি, সেই শর্ত সর্ম্পকেও ইলম নেই। একজন মুসলিমের যে আল্লাহর সিফাতগুলো সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকা দরকার তার ব্যাপারে কোনো চিন্তা-ফিকির নেই, নেই আন্তরিক আগ্রহ। ফলে আল্লাহর স্বরূপ তাদের কাছে স্পষ্ট নয়,

এ কারণে পরিপূর্ণ দ্বীন পালন করছে না। বিধান প্রণেতা হিসেবে আল্লাহর সাথে শরিক করছে সংসদের নির্বাচিত প্রার্থীদেরকে।
নিজের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কস্থিত জ্ঞানকে আল্লাহর জ্ঞানের উপর স্থান দিয়ে আল্লাহর প্রণীত হুকুমকে বিচার-বিশ্লেষণ করতে থাকে মুসলিমরাই, তার ইলম দিয়ে আসমানী ইলমের ভুল-ত্রুটি অন্বেষণ করে, নজরে আসে- ইনসাফকারী আল্লাহর বিধানে ইনসাফের ঘাটতি! এভাবে ইলমের ঘাটতির কারণে নিজের ইমানকে ধ্বংস করে ফেলেছে উম্মাহ। ইলমী অধ:পতন রূপ নেয় ইমানী অধ:পতনে।
রবকে না চেনার কারণ কালিমার শর্ত 'হলো কালিমায় সাব্যস্ত সত্বা সম্পর্কে ইলম রাখা। তিনি কেমন তা জানা জরুরি।
তাওহীদে বিশ্বাসী যে উম্মাহর বিশ্ব শাসন করার কথা সেই উম্মাহ আজ অধ:পতিত এক জাতি কেননা তাওহীদের উপর থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে রবের পরিচয় না জানার কারণে । রবকে চিনতে পেরে আল্লাহমুখী হওয়াই এখন সময়ের দাবি। কুরআনে এসেছে,

فَفِرُّوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ إِنِّى لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ

অতএব তোমরা আল্লাহর দিকে ধাবিত হও। আমি তো তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য এক স্পষ্ট সতর্ককারী। (৫১:৫০)

টার্গেট ভুলে যাওয়া

আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হলো মালিক আল্লাহকে চিনে আল্লাহর ইবাদত করার দ্বারা তাঁর সন্তুষ্টি হাসিল করা। উম্মতের চলাফেরা, জীবনযাপন কোনোটাই এই উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, অথচ তা-ই হওয়া উচিত ছিল।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ؕ قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ؕ قَالَ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

আর স্মরণ কর, যখন তোমার রব ফেরেশতাদেরকে বললেন, 'নিশ্চয় আমি যমীনে একজন খলীফা সৃষ্টি করছি', তারা বলল, 'আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যে তাতে ফাসাদ করবে এবং রক্ত প্রবাহিত করবে? আর আমরা তো আপনার প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করছি এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। তিনি বললেন, নিশ্চয় আমি জানি যা তোমরা জান না। (২:৩০)

এই আয়াতের সারসংক্ষেপ এই – মহান পরওয়ারদেগার আল্লাহ পাক যখন আদম (আ:) কে সৃষ্টি করেন এবং বিশ্বে তাঁর খেলাফত প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা করেন তখন এ সম্পর্কে ফেরেশতাদের পরীক্ষা নেয়ার জন্য তাঁর এ ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এতে ইঙ্গিত ছিল যে তাঁরা যেন এ ব্যাপারে নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করেন।কাজেই ফেরেশতাগণ অভিমত প্রকাশ করলেন যে, মানবজাতির মধ্যে এমন অনেক লোক হবে, যারা শুধু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে ও রক্তপাত করবে। সুতরাং, এদের উপর খেলাফত ও শৃঙ্খলা বিধানের দায়িত্ব অর্পণের হেতু তাঁদের পুরোপুরি বোধগম্য নয়। এ দায়িত্ব পালনের জন্য ফেরেশতাগণই যোগ্যতম বলে মনে হয়।...............। এ জগতের শাসনকার্য পরিচালনা ও শৃঙ্খলা বিধানের কাজও হয়তো তাঁরাই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হবেন। তাঁদের এ ধারণা যে ভুল ও অমূলক, তা আল্লাহ পাক শাসকোচিত ভংগীতে বর্ণনা করে বলেন যে, বিশ্ব খেলাফতের প্রকৃতি ও আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তোমরা মোটেও ওয়াকেবহাল নও।[৩]

এর পরবর্তী আয়াতে আদম আ. এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। এতে ফেরেশতাদের উপর আদম আ. এর শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশ্ব খেলাফতের যোগ্যতা স্পষ্ট করা হয়েছে, আর তাঁর বংশধরেরা সে দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালন করবে এটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু উম্মাহ আজ তা ভুলে বসেছে যে আল্লাহ তাদেরকে দিয়ে বিশ্বে তাঁর খেলাফত প্রতিষ্ঠা করার ইরাদা করে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তারা আজ ভুলতে বসেছে সেই ঘটনা ও ঘটনার শিক্ষা । আর লক্ষ্যহীন জাতির অধ:পতনের কারণ তো এটাই যে সে তার সৃষ্টির ইতিহাস আর তার জীবনের উদ্দেশ্য ভুলে যায়।

আল্লাহ বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

আর জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে তারা আমার ইবাদাত করবে।(৫১:৫৬)

এই আয়াতে আল্লাহ তাঁর বিধিগত (শরয়ী) ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করেছেন, যা তিনি ভালবাসেন ও চান। আর তা হল, সমস্ত মানুষ ও জ্বিন কেবল এক আল্লাহর ইবাদত করবে এবং আনুগত্যও শুধু তাঁরই করবে। এর সম্পর্ক যদি তাঁর সৃষ্টিগত ইচ্ছার সাথে হত, তবে কোন মানুষ ও জ্বিন আল্লাহর আনুগত্য থেকে বিমুখতা অবলম্বন করার কোন ক্ষমতাই রাখত না। অর্থাৎ, এই আয়াতে সকল মানুষ ও জ্বিনকে জীবনের সেই উদ্দেশ্যের কথা স্মরণ করানো হয়েছে, যেটাকে তারা ভুলে গেলে পরকালে কঠোরভাবে জিজ্ঞাসিত হবে এবং এই পরীক্ষায় তারা অসফল গণ্য হবে, যাতে মহান আল্লাহ তাদেরকে ইচ্ছা ও এখতিয়ারের স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছে।[৪] অর্থ্যাৎ আল্লাহ মানুষদের ইখতিয়ার দিয়েছেন বাছাই

করার, সে কি করতে চায়। আবার রহমতের চাদর দিয়ে আবৃত করেছেন এটা জানিয়ে দিয়ে যে কি আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য, কেন আমাদের বানানো হলো, কি করা উচিত। কিন্তু বান্দা এ সম্পর্কে গাফেল। তার জীবনের উদ্দেশ্য যে আল্লাহর ইবাদত করা তা তার জেহেনে নেই, তার জীবন চতুষ্পদ জন্তুর মতো হয়ে গেছে, জন্ম হওয়ার পর খায়-দায়-ঘুমায়-জরুরত পুরা করে-সন্তান জন্ম দেয়- একসময় মারা যায়, এই জীবনে যে হুক্কুল্লাহ আর হুক্কুল ই'বাদ আছে তা নিয়ে তার না আছে জানাশুনা , না আছে জানার ব্যাপারে কোনো তামান্না।

তাফসিরে-মাযহারিতে এর সরল তাফসির এই বর্ণিত হয়েছে যে, জিন ও মানবকে সৃষ্টি করার সময় তাদের মধ্যে এবাদত করার যোগ্যতা ক্ষমতা প্রকৃতিগতভাবে বিদ্যমান থাকে।এরপর কেউ এই প্রতিভাকে সঠিক পথে ব্যয় করে কৃতকার্য হয় এবং কেউ একে গোনাহ ও কুপ্রবৃত্তিতে বিনষ্ট করে দেয়। [৫] ইবাদত করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর ইবাদত না করার কারণ সে তাকে সৃষ্টি করার কারণ ও উদ্দেশ্য জানে না। সে জানে না যে তার জীবনে উদ্দেশ্যটা ঠিক করে রেখেছেন তার রব, আহকামুল হাকিমীন আল্লাহ তায়ালা। সেই উদ্দেশ্যকেই তার জীবনে মূল টার্গেট বানাতে হবে।

আল্লাহর জমিনে আল্লাহর হুকুমকে বাস্তবায়ন করতে হবে, ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে।

আল্লাহ বলেন,

هُوَ الَّذِى جَعَلَكُم خَلَٰئِفَ فِي الارض

তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে স্বীয় প্রতিনিধি করেছেন(৩৫:৩৮)

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, তিনিই মানুষকে জমিনে একজনকে অন্যজনের প্রতিনিধি করেছেন। অর্থাৎ একজন জমিনে আসবে, তার সময় শেষে চলে যাবে আবার অন্যজন দুনিয়াতে আসবে, জমিন আবাদ করবে, এভাবেই কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

(وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ) "এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেন।" (সূরা নামল ২৭:৬২)[৬]

এতে আল্লাহ্ তা'আলার দিকে রুজু করার জন্য শিক্ষা রয়েছে। তাছাড়া, *আয়াতে উম্মাতে মুহাম্মদীকেও বলা হতে পারে যে, আমি বিগত জাতিসমূহের পরে তাদের স্থলাভিষিক্তরূপে তোমাদেরকে মালিক ও ক্ষমতাশালী করেছি।* সুতরাং পূর্ববর্তীদের অবস্থা থেকে তোমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য।[৭]

আজকাল উম্মাহর অবস্থা তো এমন যে তারা নিজের সাড়ে তিন হাত শরীরটাকেই আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী চালাচ্ছে না অথচ বিশ্বে রবের খেলাফত

প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব তাদের উপর অর্পণ করা হয়েছে। আফসোস, আজ মুসলিম উম্মাহ তাদের দায়িত্বের ব্যাপারে অবহেলা করছে। পরিবারের দায়িত্বে থাকা পুরুষ যখন পিতা–সে অবহেলা করছে সন্তানের এবং যখন সে স্বামী কিংবা ভাই–সে অবহেলা করছে বিবি-বোনদের ব্যাপারে। অথচ উম্মাহর ইতিহাসে কত সুন্দর নজির আছে। উমর ইবনুল আব্দুল আজিজ রহ. এর পিতা যখন মিসরে, আর তিনি তখন মদিনায়, পিতা তাঁর শিক্ষক নিয়োগ দেন সালেহ বিন কায়সান রহ. কে। একদিন জামাতে দেরি হওয়ায় সালেহ রহ. কারণ জিজ্ঞেস করলে কারণ হিসেবে চিরুনি চুল পরিপাটি করার কথা বলেন। এ বিষয়টি পিতা আবদুল আজিজ রহ. কে জানালে তাঁর পিতা দূত প্রেরণ করেন যে কিনা উমর রহ. কে কিছু না বলেই মাথা মুণ্ডন করে দেয়। এই হচ্ছে পিতা, এই হচ্ছে উম্মাহর আদর্শ, যে চুলের জন্য মালিকের ডাকে সাড়া দিতে দেরি বা মালিকের হুকুম পালনে গাফিলতি আসে সে চুলের দরকার নেই। পরবর্তীতে উমর রহ. হয়েছিলেন এমন এক মুত্তাকী খলিফা যে কারণে অনেকেই তাকে ৫ম খলিফা বলে অভিহিত করে। আজকাল পিতারা যদি এমন হতেন তাহলে উম্মাহর শেষ দুর্গ পরিবার সুরক্ষিত থাকতো, কিন্তু পরিবারের দায়িত্বে থাকা পুরুষ আজ তার দায়িত্বের ব্যাপারে গাফেল, বিশেষ করে দ্বীনের ব্যাপারে। এভাবে ভাই কিংবা স্বামীও তার দ্বীনী দায়িত্ব পালনে অবহেলা করছে, ভরণপোষণের দায়িত্বকেই তারা মূল দায়িত্ব মনে করে নিয়েছে। দিনশেষে সকলকেই যে রবের অভিমুখী হতে হবে, সেই রবের হুকুম-আহকাম যে নিজের অধীনস্থদের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে হবে তার পরোয়া নেই, কারণ দুনিয়াবি সফলতাই তাদের উদ্দেশ্য। প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরে গেছে উম্মাহর বড় একটা অংশ। মুসলিমদের পক্ষ থেকে এমন আচরণ কোনোরূপে কাম্য নয়। মুসলিমরা আল্লাহর সাহায্য পায় এই কারণেই যে মুসলিমরা তাঁর নির্ধারণ করে দেওয়া উদ্দেশ্যকে আমাদের জীবনের টার্গেট বানিয়ে আখিরাতের জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু এখন মুসলিম উম্মাহর দৃষ্টি এই দুনিয়াবি জীবন তথা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত গিয়ে ঠেকেছে, এজন্য উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে সিরাত্বল মুস্তাক্বীম থেকে ছিটকে গিয়েছে। এজন্যই তাদের অধঃপতন।

ফরজিয়্যাতে অবহেলা

আল্লাহ তায়ালা দ্বীন ইসলামের অনুসারীদের উপর কিছু ফরজ বিধান দিয়েছেন যা পালন করা তার জন্য আবশ্যক। কিন্তু উম্মাহর অধিকাংশের অবস্থা তো এই যে, এই ফরজ পালনে তাদের অনীহা, উদাসীনতা, অবহেলা কিংবা পালন করলেও তা নামেমাত্র আদায় করে। নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত, পর্দা, হিসবাহ, দাওয়াহ-সহ সকল ফরজ বিধানগুলো আজ অবহেলার কারণে পালন করছে না। পূর্ববর্তী

উম্মাহ যখন এরূপ অবহেলা করেছে তখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব এসেছে।এই উম্মতের ক্ষেত্রেও আল্লাহর নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি।

সুরা মায়িদার আয়াত-১৩ এর ব্যাখ্যায় এসেছে,

“বনী ইসরাইল দুর্ভাগ্যবশত: এসব সুস্পষ্ট নির্দেশের প্রতি কর্ণপাত করেনি এবং অঙ্গীকারের বিরুদ্ধাচারণ করে।ফলে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে বিভিন্ন আযাবে নিক্ষেপ করেন।

বনী ইসরায়েলের প্রতি কুকর্ম ও অবাধ্যতার ফলে দুই প্রকার আযাব নেমে আসে।(এক)বাহ্যিক ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আযাব। যেমন রক্ত, ব্যাঙ ইত্যাদির বৃষ্টি বর্ষণ, প্রস্তর বর্ষণ, ভূমি উল্টিয়ে দেওয়া ইত্যাদি।.....

(দুই)আত্মিক আযাব। অর্থ্যাৎ, অবাধ্যতার ফলে তাদের অন্তর ও মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে যায়।তাতে চিন্তা-ভাবনা ও বুঝার ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়। ফলে তারা পাপের পরিণামে আরও পাপে লিপ্ত হতে থাকে।.....”[৮]

মুসলিম উম্মাহর জন্য বারবার এভাবে পূর্ববর্তী জাতির ভুল ও তার পরিণাম তুলে ধরার কারণ কি? কারণ মালিক চান আমরা সেই ভুল না করি আর নিজেরা শুধরে যাই। উম্মাহ যেহেতু কালিমা বিশ্বাস করার দ্বারা আনুগত্যের স্বীকারোক্তি দিয়েছে এবং প্রতিটা রুহই রুহজগতে আনুগত্যের ওয়াদা করে আসার পর আগের জাতির মতো আনুগত্যের ওয়াদা প্রতিনিয়ত ভঙ্গ করছে মুসলিম উম্মাহর এক বিরাট অংশ। বছরের পর বছর সালাত আদায় করে না, অথচ সে নিজেকে মুসলিম দাবি করে।পর্দার কোনো পরোয়া নেই, যাকাতের ব্যাপারে অবহেলা আর হজ ফরজ হওয়ার পরও তা আদায় না করে উম্মাহ আজ আযাবে উপযুক্ত, তাই যেই উম্মাহ বিশ্ব চালানোর কথা সেই উম্মাহ আজ অন্যের অধীনে অপমানের জীবন চালাচ্ছে। বনী ইসরাইলকে যে আত্মিক আযাব দেওয়া হয়েছিল আজ এই উম্মাহও সেই একই আযাবে ভুগছে, কিন্তু তারা এটাকে আযাব মনেই করছে না।পাপের পর পাপে লিপ্ত হয়েই যাচ্ছে প্রতিনিয়ত।

ফরজ হুকুমগুলোর ব্যাপারে অবহেলার সীমা নেই। নামাজ আদায় না করা এবং আদায়কারীরাও রুকনের ব্যাপারে মারাত্মক অবহেলা করছে। আল্লাহ বলেন,

فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِۖ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيًّا

তাদের পরে আসল এমন এক অসৎ বংশধর যারা সালাত বিনষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করল। সুতরাং শীঘ্রই তারা জাহান্নামের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে(১৯:৫৯)

নামাজ নষ্ট করার বিভিন্ন অর্থ এসেছে..অসময়ে নামাজ পড়া,সময়সহ আদব ও শর্তসমূহের মধ্যে কোনোটিতে ত্রুটি করা কিংবা কারো মতে জামাআত ছাড়া নিজ গৃহে নামাজ পড়া। আফসোসের সাথে বলতে হয়, এর চেয়েও জঘণ্য অবস্থা এই উম্মাহর,তাদের অধিকাংশ নামাজই পড়ে না। আবার শরীয়তসম্মত ওজর ছাড়াই অনেক নামাজী মানুষও অসময়ে নামাজ পড়েন,ইচ্ছাকৃত নামাজ কাযা করছে। আবার ৫ ওয়াক্ত সালাত সময়মত আদায় করা মানুষদের অনেকেই নামাজের রুকনগুলো ঠিকমতো জানেন না, ফলশ্রুতিতে আদায়ও করে না।

“খলিফা হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) সকল সরকারি কর্মচারীদের কাছে এই নির্দেশনামা লিখে প্রেরণ করেছিলেন: ‘আমার কাছে তোমাদের সব কাজের মধ্যে নামাজ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। অতএব যে নামাজ নষ্ট করে,সে দ্বীনের অন্যান্য বিধিবিধান আরোও বেশি নষ্ট করবে’।(মুয়াত্তা মালেক)
হযরত হুযায়ফা (রা) এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে,সে নামাজের আদব ও রুকন ঠিকমত পালন করছেন না।তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃতুমি কবে থেকে এভাবে নামাজ পড়ছো? লোকটি বললঃ চল্লিশ বছর ধরে। হুযায়ফা(রা) বললেন: তুমি একটি নামাজও পড়নি। যদি এ ধরণের নামাজ পড়েই তুমি মারা যাও, তবে মনে রেখো-মুহাম্মাদ ﷺ-এর আনীত আদর্শের বিপরীতে তোমার মৃত্যু হবে।”[৯]

উপরোক্ত রেওয়ায়েতের আলোকে বর্তমান উম্মতের অবস্থা খুবই করুণ, তারা নামাজের ব্যাপারে গাফিলতির বিভিন্ন পর্যায়ে আছে। এমনকি সালাত আদায় না করেও ইমান ঠিক আছে বলে তাদের বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গেছে, এটা তাদের কত বড় আত্মিক অধঃপতন তা সহজেই অনুমেয়। এর কারণও আয়াতে বলে দেওয়া আছে যে কুপ্রবৃত্তির অনুগামী হওয়া, এত অধিক দুনিয়ার পিছনে ছুটে তারা রবের হকের ব্যাপারে চরম মাত্রার উদাসীনতায় লিপ্ত।

যাকাত আদায় করার ব্যাপারেও উম্মতের অবহেলার কমতি নেই, যাকাত আদায় করতে হবে এই ভয়ে স্বর্ণ বিক্রি করে জমি ক্রয় করা, হিসাব না করেই একটা এমাউন্ট দিয়ে দেওয়া কিংবা বনী ইসরাইলদের মতো হঠকারিতা প্রদর্শন করতেও কুন্ঠাবোধ করেনি উম্মাহ। তাছাড়া কখন যাকাত ফরজ তা সম্পর্কে ইলমের ঘাটতিও আছে উম্মাহর, যেই তিন ধরণের বস্তুর/সম্পদের উপর যাকাত আসে সেই তিন ধরণের সম্পদের দুই ধরণের সম্পদ থাকলে রুপার উসুলে যাকাতের

নিসাব পরিমাণ হিসাব করে যাকাত আদায় করার বিষয়টি অজানা থাকায় অনেক মানুষ যাকাত আদায় করছে না।

যাকাতের ব্যাপারে আল্লাহর সাথে তামাশা করার নজিরস্বরূপ বাংলাদেশের সিলেট বিভাগের একটি ঘটনা এইরূপ..."যাকাত দিতে হবে বিধায় নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়ার পর ছেলে একবছর হওয়ার পূর্বেই মাকে উদ্দেশ্য করে বলে 'এসকল সম্পদের মালিক তুমি'। ঠিক পরবর্তী একবছর হওয়ার পূর্বে মা ছেলেকে উদ্দেশ্য করে বলে 'ছেলে, তুমি এসকল সম্পদের মালিক'। এভাবে কেউই পূর্ন একবছর নিসাবের মালিক না হওয়ায় শরীয়ত মোতাবেক যাকাত ফরজ হয় না ঠিক, কিন্তু এটা বনী ইসরাইলদের শনিবার জাল না ফেলে শুক্রবার জাল ফেলে রেখে রবিবার মাছ ধরার মতো। এগুলো আল্লাহর আযাবকে ত্বরান্বিত করছে।আল্লাহ বলেন,"(সাবধান)আল্লাহর আয়াতসমূহকে কখনো হাসি-তামাশার বস্তু মনে করো না"(২:২৩১)

রোজা, হজ, পর্দা এসকল ফরজ বিধানেও গাফিলতির অন্ত নেই। হজ ফরজ হওয়ার পরও সন্তানের বিয়ে না করিয়ে হজ করাকে তারা অপ্রয়োজনীয় কিংবা বেঠিক কাজ মনে করে, অথচ ফরজ হওয়ার পর হজ না করা সুস্পষ্ট কবিরা গুনাহ।

পর্দার ব্যাপারে নারী-পুরুষ সবাই চূড়ান্ত মাত্রার গাফেল। খুব কম সংখ্যক মানুষ পর্দার হুকুম মেনে চলছে, এই পর্দা না করার কারণে কত শত পাপ যে সমাজে ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়ছে, তা অকল্পনীয়। পশ্চিমা ভাবধারায় বেড়ে উঠা মুসলিমরাও পর্দা সম্পর্কে শিথিল অবস্থানে। সুরা মায়েদার ১৩ আয়াতের তাফসিরে আসা আত্মিক আযাবের নমুনা হচ্ছে এগুলো। জিনা-ব্যভিচার এখন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে উঠার কারণ এই ফরজ বিধানে অবহেলা।

মাসিক আলকাউসার পত্রিকায় এসেছে..... কুরআন মাজীদ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে মুসলিম নারী ও পুরুষের জন্য পর্দার বিধান দান করেছে। এটি শরীয়তের একটি ফরয বিধান। এ বিধানের প্রতি সমর্পিত থাকা ঈমানের দাবি। কিন্তু বেদনার বিষয় এই যে, পশ্চিমা সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাবে আমাদের 'মুসলিম-সমাজ' এতটাই প্রভাবিত হয়ে পড়েছে যে, কুরআন ও সুন্নাহর বিধানও তাদের কাছে অপরিচিত ও অপ্রয়োজনীয়! (নাউযুবিল্লাহ) ইসলামের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিধান তো-আল্লাহ হেফাযত করুন-মুসলিম পরিচয় বহনকারীদের দ্বারা আক্রমণেরও শিকার। ঐসব বিধানের মধ্যে একটি হচ্ছে পর্দা বিধান। এই সব 'মুসলমানদের' কে বোঝাবে যে, এটা নিজের পায়ে কুঠারাঘাতের শামিল।[১০]

হিসবাহ তথা সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ এই ফরজ বিধানটিও অবহেলিত, এই বিধানটির বিষয়ে সচেতনতা যত বাড়বে আল্লাহর হক আদায়ে উম্মত ততটাই যত্নবান হতো। কিন্তু বড়ো আফসোসের বিষয়, এটাও যে ফরজ তা অনেক দ্বীনদার মানুষেরও অজানা, ফলে কালিমার হকের অবমাননা হতেই থাকছে। "হুজুরে পাক ﷺ বলেন, কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু যাহারা পাঠ করিবে যতক্ষণ তাহারা উহার অবমাননা না করিবে, ততক্ষণ তাহারা উপকার করিতে থাকিবে। সাহাবারা জিজ্ঞেস করিলেন, হুজুর! কালেমার হকের অবমাননার মতলব কি? হুজুর ﷺ উত্তর করিলেন,যখন আল্লাহর নাফরমানি প্রকাশ্যে করা হয় এবং উহা বন্ধ করার কোনো চেষ্টাই না করা হয়। (তারগীব) [১১]

এভাবে কালিমার হকের অবমাননা করার দ্বারা আল্লাহর হক আদায়ের ব্যাপারে অবহেলা করতে করতে উম্মাহ নিজেরা নিজেদেরকে আযাবের উপযুক্ত করে তুলছে, আল্লাহ বলেন,

قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ٱنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ

বল, 'তিনি তো সক্ষম তোমাদের উপর থেকে অথবা তোমাদের পায়ের নীচ থেকে তোমাদের উপর আযাব প্রেরণ করতে, অথবা তোমাদেরকে বিভিন্ন সন্দেহপূর্ণ দলে বিভক্ত করতে এবং তোমাদের একদলকে অন্য দলের ভীতি আস্বাদন করাতে'। দেখ, কীভাবে আমি আয়াতসমূহ নানাভাবে বর্ণনা করি, যাতে তারা ভালভাবে বুঝতে পারে (৬:৬৫)

দাওয়াহ, জিহাদের মতো ফরজ বিধানগুলোও আজ অবহেলিত। দ্বীনের ফরজ হুকুমের ব্যাপারে এরূপ উদাসীনতা কেবল পরকালীন ক্ষতির কারণই নয়, বরং তা দুনিয়াতেও ধ্বংস ডেকে আনবে। কেননা এই দ্বীন মানলে দুনিয়াতেও কামিয়াবি হাসিল হয়, ঠিক বিপরীত কথাটাও সত্য। দ্বীন না মানলে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে জীবন। আর তা আজ উম্মাহর অবস্থা দেখে সহজেই অনুমান করা যায়।

ইলম থেকে দূরে সরে যাওয়া

ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য ফরজ, তবে সকল ইলম নয়। বরং মুসলমান যখন যে বিষয়ের সম্মুখীন হয়, তখনই সে বিষয়ের উপর জ্ঞানার্জন করা ফরজ। আর যে সকল বিষয় ওয়াজিব আদায়ের মাধ্যম হিসেবে সাব্যস্ত হয়, সে সকল বিষয় অর্জন করা ওয়াজিব। [১২]

যাবতীয় লেনদেন, আচার-আচরণ, পেশা, মুআ'মালাত ইত্যাদি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যখন যেটার সাথে জড়িত হবে তখন সেই পরিমাণ জ্ঞান অর্জন করা তার জন্য ফরজ যে পরিমাণ জ্ঞান অর্জন করলে হারাম থেকে বেঁচে থাকা যায়।তার সাথে সাথে তার উপর তাওয়াক্কুল, ইনাবাত, আল্লাহর ভয় ও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকাসহ হৃদয়ের সাথে সম্পর্কিত বিষয়সমূহের উপর জ্ঞানার্জন করাও ফরজ। কারণ এসব বিষয় সর্বাবস্থায় অন্তরে থাকা বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু আজকাল উম্মাহ জ্ঞানার্জনের হাদিসকে ভুল ব্যাখ্যা করে দুনিয়াবি ইলমকে ফরজ ইলম ভাবছে কিংবা কুরআন কোনোমতে তিলাওয়াত করতে পারাটাকেই কেবল ফরজ ইলম ভেবে বসে আছে। এ-কারণে ফরজ ইলমের অভাবে হালাল-হারামের জ্ঞান নেই, হারাম কাজে জড়িয়ে যাচ্ছে অহরহ, এভাবে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা ক্রমাগত লঙ্ঘন করে আল্লাহর নারাজি হাসিল করছে, আল্লাহর অসন্তুষ্টি একটা জাতির অধ:পতনের জন্য যথেষ্ট। ফরজ ইলম অর্জনে সকলকেই সচেষ্ট হওয়া উচিত, উম্মাহর ইলম থেকে দূরে থাকা অনুচিত।

ইলমের উদ্দেশ্য ভুলে যাওয়া

ইলমের দ্বারাই আল্লাহ ফেরেশতাদের উপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করে সিজদা করতে বলেছিলেন। ইলমের কারণেই আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব, আর সেই ইলমের উদ্দেশ্যকেই ভুলতে বসছি আমরা। ইলমের উদ্দেশ্য যখন ভুলে যাবে উম্মাহ, তখন তার শ্রেষ্ঠত্বও হারাবে, হবে এক অধঃপতিত জাতি।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস(রা:) বলেছেন, "আলেমগণ যদি তাদের ইলমের সম্মান করতো এবং ইলম অনুযায়ী আমল করতো তাহলে আল্লাহ তায়ালা, ফিরিশতাগণ এবং সকল সৎলোক তাদেরকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতো। কিন্তু তারা ইলমকে পার্থিব স্বার্থ অর্জনের উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছে। তাই আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েছেন আর সৃষ্টিজগতের মাঝে তাদের গুরুত্ব হারিয়ে গেছে।"......... আল্লাহকে পাওয়ার জন্য কেউ ইলম অর্জন করে না। তাদের নেশা হলো দুনিয়াবি স্বার্থ। নিয়তের ত্রুটির কারণে এই অধঃপতন।[১৩]

ইলম অর্জনের নিয়ত থাকবে (১) অর্জিত ইলম অনুযায়ী আমল করা এবং সে অনুযায়ী নিজেকে গঠন করা।(২)অর্জিত ইলম অন্যকে শিক্ষা দেওয়া এবং প্রচার-প্রসার করার মাধ্যমে দ্বীন ও শরীয়তকে জিন্দা রাখা।(৩) সর্বোপরি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জন করার মাধ্যমে উভয় জগতের কামিয়াবী হাসিল করা। এই তিনটি উদ্দেশ্যের বাইরে ইলম হাসিল করার উদ্দেশ্য যদি হয় দুনিয়ার সম্পদ

উপার্জন করা,মানুষের কাছে সম্মান লাভ করা,পদ বা নেতৃত্ব লাভ করা,মূর্খদের সঙ্গে তর্কে জয়ী হওয়া ইত্যাদি, তাহলে তা হবে গলদ নিয়ত।[১৪]

ইলম হাসিলের গলত আর সহিহ নিয়ত সম্পর্কে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে,....

“নিজামুল মুলক যখন মাদ্রাসা-ই-নিজামিয়া প্রতিষ্ঠা করেন তখন সেখানে বিপুল ছাত্র ভর্তি হলো। প্রাথমিক কয়েক বছর জ্ঞানার্জনের পরিবেশ ছিল দেখার মতো। পরে ধীরে ধীরে ছাত্রদের মধ্যে দ্বীনী প্রেরণা আর পরকালের ভাবনা হ্রাস পেতে থাকে। তখন এক ব্যক্তি গিয়ে নিজামুল মুলকের কাছে অভিযোগ করলো-আপনি ছাত্রদের জ্ঞানার্জনের স্বার্থে এত বিশাল অংকের অর্থ খরচ করছেন অথচ সে মাফিক তো ফলাফল আসছে না। তিনি ছদ্মবেশে ইশার নামাজের পর প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য মাদ্রাসায় গেলেন, সেখানে ছাত্রদেরকে ২/৩ করে পড়তে দেখলেন। তাদের কাছে গিয়ে সালাম দিয়ে একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এখানে কি করছো? সে বললো, ‘আমি ইলম হাসিল করতে এসেছি’। জিজ্ঞেস করলেন, ‘ইলম হাসিল করে কি করবে?’ তালেবে ইলম বললো, আমার বাবা একজন বড় মুফতি, আমি ইলম হাসিল করার পর তার স্থলাভিষিক্ত হবো।দ্বিতীয় জনকে তার ইলম হাসিলে উদ্দেশ্য জিজ্ঞেস করলে সে বলে যে তার বাবা খতিব এবং সে তার স্থলাভিষিক্ত হবে। এভাবে ছাত্রদেরকে প্রশ্ন করলে সবাই প্রায় একই উত্তর দিলো, পদবি বা সম্মান লাভের কথা জানায়। এসব শুনে ব্যথিত হলেন। আক্ষেপ করলেন, এরা সবাই তো দুনিয়ার উদ্দেশ্যে ইলম হাসিল করছে। এদের জন্য এতগুলো অর্থ খরচ করে কি লাভ? মাদ্রাসা বন্ধ করে অন্য কোনো কল্যাণকাজে অর্থগুলো খরচ করার কথা ভাবতে ভাবতে ফেরার পথে একাকী একজন তালেবে ইলমকে পড়তে দেখে সালাম দিলেন। সে সালামের উত্তর দিল, কিন্তু চোখ তুলে তাকায়নি। তিনি অবাক হয়ে বললেন, তুমি তাকাচ্ছো না কেন? সে বিরক্তির সুরে বললো, ‘জনাব! আমি আপনার সাথে কথা বলতে এখানে আসিনি। তিনি কারণ জিজ্ঞেস করলে ছাত্রটি বললো, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য এসেছি। অথচ আমি জানি না কিভাবে তাকে সন্তুষ্ট করব। তবে এতটুকু জানি এই কিতাবগুলোতে তাঁকে সন্তুষ্ট করার পথ বলে দেওয়া আছে। আর আমি সেই ইলমই হাসিল করতে চাই। আপনি অনুগ্রহপূর্বক আমার সময় নষ্ট করবেন না।’ এই জবাব শুনে এই একজনের জন্যই পুরো মাদ্রাসা চালু রাখার সিদ্ধান্ত নেন, এই ছাত্রটিই হলেন ইমাম গাযালী রহ.।”[১৫]

বিশুদ্ধ নিয়ত একজন তালেবে ইলমের জীবনকে কতটা কামিয়াব বানাতে পারে এবং তার দ্বারা দ্বীনের কতবড় খিদমত আঞ্জাম দিতে পারে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই ঘটনা। আর পদবি বা সম্মানের জন্য কিংবা অভিভাবকদের চাপে পড়ে ইলম

তলব করে এমন অনেকেরই নেই সহিহ নিয়ত। ফলে ইলম তার ও ইসলামের উপকারে আসে না। ইমাম আযযারনুজী তার তালিমুল মুতাআল্লিম কিতাবে সহিহ নিয়তের কথা উল্লেখ করার পর বলেন, 'ইলমের উপরই নির্ভর করে ইসলামের টিকে থাকা।' তাহলে আহলে ইলমদের নিয়ত সহিহ হওয়া কতটা গুরুত্বপূর্ণ !

সময়ের পরিক্রমায় যখন সবাই দুনিয়াবি ইলম অর্জন করায় ব্যস্ত অধিকাংশ মানুষ, তখন যে অল্পসংখ্যক মানুষ দ্বীনি ইলম অর্জন করছে তাদেরও নিয়তে ভুল, সহিহ নিয়তের বড়ই অভাব। ফলে সমাজে ইসলামের বিধিবিধানের ইলম সেভাবে ছড়াচ্ছে না, সাধারণ মানুষ ইলমওয়ালা ও ইলমের সরাসরি সোহবত পাচ্ছে না, ফলশ্রুতিতে ইলমবিহীন উম্মাহর জীবনে আল্লাহর হুকুম-আহকামের গুরুত্ব কমে গেছে, এটার কারণে হারামে ছেয়ে গেছে উম্মাহর জীবনে। আল্লাহর সীমা লঙ্ঘন করেছে এমন জাতিকে আল্লাহ পাকড়াও করেন, এটাও বড় কারণ উম্মাহর অধঃপতনের।

<u>কালিমার শর্ত না জানা</u>

পবিত্র কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ গ্রহণ করা হবে না যতক্ষণ না বান্দা তার শর্তসমূহ পূরণ করবে, যার বর্ণনা কুরআন ও হাদিসে এসেছে। এজন্য শর্তগুলো জানা জরুরি, কিন্তু এর শর্ত সম্পর্কে মুসলিমরা জ্ঞাত নয় এবং জানার জন্য আগ্রহও নেই বললেই চলে। শর্ত না জানার কারণে নিফাক কিংবা কুফর করে ইসলাম থেকে খারিজ হচ্ছে অনেক মুসলিম।

ওহাব ইবনে মুনাব্বেহ জনৈক ব্যক্তিকে বলেন,যে তাকে প্রশ্ন করেছিল: "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ কি জান্নাতের চাবি নয়?" তিনি বললেন: "অবশ্যই, তবে প্রত্যেক চাবির একটা দাঁত রয়েছে, তুমি যদি দাঁতবিশিষ্ট চাবি নিয়ে আসো তোমার জন্য খোলা হবে, অন্যথায় খোলা হবে না।" তিনি দাঁত বলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর শর্তের দিকে ইশারা করেছেন। [১৬]

'কুরআন ও সুন্নাহ অনুসন্ধান শেষে আহলে ইলমদের নিকট স্পষ্ট হয়েছে যে, সাতটি শর্ত ব্যতীত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ গ্রহণযোগ্য নয়। সেগুলো হচ্ছে :

১.কালেমার অর্থ জানা, অর্থ্যাৎ কালেমার ভেতর কী অস্বীকার ও কী সাব্যস্ত করা হয়েছে তা জানা জরুরি, যা তার অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞতার বিপরীত।

২.কালেমার ভেতর যা সাব্যস্ত করা হয়েছে তা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করা জরুরি, যা কালেমা সম্পর্কে সংশয় ও সন্দেহ পোষণ করার বিপরীত।

৩.কালেমার প্রতি পূর্ণ ইখলাস প্রদর্শন করা জরুরি, যা তার অর্থ ও দাবি বাস্তবায়ন করার সময় শিরক ও রিয়াকে প্রশ্রয় দেয়ার বিপরীত।

৪.কালেমাকে মনেপ্রাণে সত্য জানা জরুরি, যা তার প্রতি মিথ্যারোপ করার বিপরীত।

৫.কালেমায় সাব্যস্ত সত্তাকে (আল্লাহকে) মহব্বত করা জরুরি, যা তার প্রতি কোনো প্রকার বিদ্বেষ ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করার বিপরীত।

৬.কালেমার অর্থ ও দাবির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা জরুরি, যা তার অর্থ ও দাবিকে ত্যাগ করার বিপরীত।

৭.কালেমার অর্থ ও দাবি মনেপ্রাণে গ্রহণ করা জরুরি, যা তার অর্থ ও দাবির বাস্তবায়নকে প্রতিরোধ করার বিপরীত।'[১৭]

একজন মুসলিম হিসেবে কালিমা মুখে বলাই যথেষ্ট নয়, বরং তার হক ও ফরজসমূহ আদায় করাও তার শর্তসমূহ পূর্ণ করা জরুরি যেগুলো কুরআন সুন্নাহর আলোকে স্পষ্ট হয়েছে। কিন্তু মুখে কালিমা বলেই ক্ষান্ত এ উম্মাহর বেশিরভাগই। এজন্য কালিমার মর্ম তাদের কাছে স্পষ্ট না, কাফির-মুশরিকদের কথায় তাদের ইমান দুর্বল হয়ে পড়ে-হয়ে পড়ে সন্দেহ ও সংশয়যুক্ত, আল্লাহর মহব্বতে পূর্ণ নয় তাদের হৃদয়, আল্লাহর হুকুমকে অবহেলা করাই নিত্যকার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে তার।কালিমার শর্ত না জানার কারণে নিফাকের ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ইমান হারাচ্ছে ইমানওয়ালারা, নিজের অজান্তেই অহরহ হয়ে যাচ্ছে তা। যেমন: সেক্যুলার সমাজব্যবস্থায় বসবাস করতে করতে উম্মাহ আল্লাহকে হাকিম ও শাসক মানতে দ্বিধা-সংকোচ কিংবা অস্বীকার করে কিংবা কখনো এ ধারণা চলে আসে রাজনীতিতে আসমানি বিধান কেন নাক গলাবে তাহলে সে ইমান শূণ্য এবং ইসলাম থেকে খারিজ। কুফর নিফাক থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করে খাঁটি মনে তাওবা করলে এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে দ্বীন থাকবে তা মেনে নিলে ইমানওয়ালার কাতারে আসবে,নয়তো নয়। এরকম অসংখ্য পরিস্থিতিতে কেবল কালেমার শর্ত না জানা এবং শর্তগুলো কি দাবি করে তা না জানার কারণে নিফাক না হয় কুফর হয়েই যাচ্ছে।

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মালেক হাফিজাহুল্লাহ কুরআনের আলোকে বিশ্বাসগত নিফাকের উদাহরণ হিসেবে বলেন,

'*ইসলামি শরীয়ত বা শরীয়তের কোনো বিধানকে অপছন্দ করা,

*ইসলামের কিছু বিশ্বাস ও বিধানকে মানা, আর কিছু না মানা এবং

*শরীয়তের কোনো বিধানের উপর আপত্তি করা বা তাকে সংস্কারযোগ্য মনে করা.... ।'[১৮]

উপরে উল্লেখ করা নিফাকের সংক্রমণ উম্মতের মধ্যে অনেক, এর কারণ তারা কালিমার শর্ত সম্পর্কে অজ্ঞতা। এজন্য উম্মাহর মাঝে কালিমার শর্তগুলো স্পষ্ট করে বিস্তারিত তুলে ধরাই তাদের ইমানী অধ:পতন হতে বাঁচাতে পারবে।

কালিমার প্রথম শর্তটি না জানার কারণে একই সাথে হৃদয়ে ইমান-কুফরকে ধারণ করে মুসলিমরা। *উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, 'ইসলামের বন্ধন একটি একটি করে তখনই ছুটতে থাকবে, যখন ইসলামের মাঝে এমন লোকদের আবির্ভাব ঘটবে, যারা জাহিলিয়্যাতকে চিনবে না।... উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর এই উক্তির আলোচনা করতে গিয়ে ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ মানুষদের চার ভাগ করেন।*

১. যারা ঈমান ও কুফর উভয়ই ভালোভাবে চেনে এবং তাদের কার্যক্রম সম্পর্কেও অবগত। পৃথিবীতে এরাই সবচেয়ে জ্ঞানী।

২. যারা শুধু ঈমান চেনে; কিন্তু কুফুরের ব্যাপারে অবগত নয়; তবে তারা ঈমানের পথের বাইরে সবকিছু প্রত্যাখ্যান করে। এরাও কুফুর থেকে নিরাপদ থাকতে সক্ষম হয়।

৩. যারা বিস্তারিতভাবে কুফুরকে জানে; কিন্তু ঈমানকে জানে ভাসা-ভাসা অবস্থান থেকে। তারাও পরিপূর্ণ নিরাপদ নয়।

৪. যারা ঈমান ও কুফুর কোনো পথই ভালোভাবে চেনে না। এরাই সবচেয়ে ভয়ংকর অবস্থানে আছে।"

বর্তমান মুসলিমদের অবস্থা চতুর্থ শ্রেণির মতো। একদিকে তারা ইসলামের বিশুদ্ধ ও সঠিক অবস্থান সম্পর্কে অজ্ঞ হয়ে বসে আছে কিংবা সেই অবস্থানকে জেনেও প্রত্যাখ্যান করছে নানা অজুহাতে।[১৯] এভাবে হক-বাতিলের সহাবস্থান থাকে মুসলিমদের হৃদয়ে, ইমানের অধ:পতনের অতলতলায় নিমজ্জিত উম্মাহ ।

কালেমার চাহিদা কি- তা সম্পর্কে অজ্ঞতা

কালিমা তায়্যিবাকে এজন্য তায়্যিবা বলা হয় যে, এই কালেমা নিজে পবিত্র এবং যার মধ্যে এই কালেমা প্রবেশ করে তাকেও পবিত্র করে। মানুষের মধ্যে যত খারাবী, কুফর শিরক ও বিদআত রয়েছে এগুলো দূর করে আল্লাহ তায়ালার জাত ও সিফাতের ইয়াক্বীন অন্তরে স্থান দেওয়া এবং মানুষের জীবনযাপনের যত পদ্ধতি

আছে সবকিছু ছেড়ে একমাত্র হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকায় জীবন চালানোর ওয়াদায় আবদ্ধ হওয়া এই কালিমার চাহিদা। যেদিন হতে এই কালিমা পড়া হলো সেদিন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহর হুকুম এবং রাসুলের তরীকা ছাড়া অন্য কারও হুকুম ও তরীকা মত চলা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এই ওয়াদা পূরণ করার শর্তে মানুষ মুসলমান হয়।

এই হলো কালিমার চাহিদা আর এই কালিমা পড়ার পর মুসলমানের কিভাবে জীবন চালাবে তা-ও এই কালিমা জানিয়ে দেয়। কিন্তু মুসলিমরা কালিমার চাহিদা–হাকিকত সম্পর্কে অজ্ঞ। তারা জন্মসূত্রে মুসলিম এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ের কিছু আমলকেই কালিমাওয়ালার প্রকৃত স্বরূপ কল্পনা করে। দুনিয়াবি কাজেও যে ইসলামের বিধান অনুযায়ী করতে হবে তা-ও যে কালিমার চাহিদা তা নিতান্তই তাদের অজানা। যে কালিমার কারণে আমরা সম্মানিত, যে কালিমার দ্বারাই আমরা আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করি,যে কালিমার ভার সারা দুনিয়ার চাইতেও বেশি সেই কালিমাওয়ালারা কালিমার মর্ম না জানার কারণে কালিমার বিপরীত ও সাংঘর্ষিক কাজ করে কালিমা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। মুখে স্বীকার করার পরেও আমলে প্রকাশ পাচ্ছে না,ফলে দ্বীন ইসলাম তার জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে পালিত হচ্ছে না। এভাবে চলতে চলতে ইমানের কমতি দেখা দেয়, এমনকি ইমান ভঙ্গ হয় এমন কথা-ও বলে ফেলে। কালিমার চাহিদা না জানার কারণে আমাদের জীবন সাহাবীদের জীবনের মতো না, অথচ তাদের ইমানই আমাদের ইমানের মাপকাঠি, তা সুরা বাকারা ১৩ আয়াতে বলা হয়েছে। হাসান বসরী রহ. বলেন, “যদি তোমরা সাহাবিদের দেখতে তাহলে তাদের পাগল বলতে, যদি তারা তোমাদের দেখতো তাহলে অমুসলিম বলতো”[২০] এটা যদি একজন তাবেয়ী তাদের সমসাময়িকদের উদ্দেশ্য করে বলেন, তাহলে এখনকার মুসলিমদের ব্যাপারে তাদের কি কঠিন মন্তব্য হতো !

আদর্শ অনুসরণের ঘাটতি

কুরআনবিহীন জীবন-আল্লাহর রজ্জুকে ঢিল করে ধরা

কুরআন আল্লাহর কালাম, আল্লাহর বাণী। কুরআনে আছে আমাদের জীবন চলার নির্দেশ। *আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের রেওয়ায়েতে হুযুর ﷺ বলেনঃ*

كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء الى الارض

অর্থাৎ, কোরআন হল আল্লাহ তাআলার রজ্জু যা আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত প্রলম্বিত। (ইবনে কাসীর)[২১]

যে কুরআনকে আল্লাহর রজ্জু বলা হয়েছে হাদিসে যা আল্লাহর সাথে বান্দার ও বান্দার সাথে অন্য আরেক বান্দার সম্পর্ক কায়েম করে সেই কুরআনকে ছেড়ে দিলে মুসলিমরা অধ:পতনের সম্মুখীন হবেই হবে। ছুটে যাবে আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক আবার অন্য বান্দার সাথেও সম্পর্ক নষ্ট হবে, ফলে শয়তান আক্রমণ করবে ও বিপর্যয় নেমে আসবে।

কুরআনের হুকুম-আহকাম মেনে চলাটা ফরজ, কিন্তু আজ কুরআনের তিলাওয়াতই মুখ্য হয়ে উঠেছে, কুরআনে বর্ণিত বিধিবিধান কি তা জানাও উম্মাহর জন্য আবশ্যক, কিন্তু মুসলিম সমাজ আজ কুরআন বিমুখ।

اَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَنْتُمْ مُّدْهِنُوْنَ ۙ

তবুও কি তোমরা এই বাণীকে(কুরআনকে) তুচ্ছজ্ঞান করবে?(৫৬:৮১)

কুরআনের যতপ্রকার হক আছে তার একটির প্রতি অবহেলা করাও কুরআনবিমুখতার শামিল। তার জীবনে কুরআন কেবল এক কিতাব যার উপর ধুলো জমে যায়, বড়ই আফসোসের বিষয়। এমনও উদাহরণ আছে যে ঘরে তিলাওয়াত করার মানুষ নেই বলে কুরআন মসজিদে রেখে দায়মুক্ত হতে চায় উম্মাহ। আহ! যদি এই আবেগের কারণেও তারা কুরআনকে আঁকড়ে ধরতো তাহলে সে সঠিক পথের উপর থাকতো।

পূর্ববর্তী জাতিকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল। কিতাবের হুকুমকে মানার জন্য আদেশ করা হয়েছে, কিন্তু এর বিপরীতে তারা যখন তা অমান্য করেছে.......

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ؕ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ۚ فَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَكُنْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ

আর স্মরণ কর, যখন আমি তোমাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম এবং তূর পাহাড়কে তোমাদের উপর উঠালাম আমি (বললাম) 'তোমাদেরকে যা দিয়েছি, তা শক্তভাবে ধর এবং তাতে যা রয়েছে তা স্মরণ কর, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পার'।অতঃপর তোমরা এ সবের পর বিমুখ হয়ে ফিরে গেলে। আর যদি তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত না হত, তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হতে।(২:৬৩-৬৪)

এর পরের আয়াতেই এসেছে শনিবারের হুকুম অমান্য করার শাস্তির উল্লেখ এসেছে, কিতাবের হুকুম অমান্য করাই আল্লাহর আযাবের কারণ। ঠিক একইভাবে বনী ইসরায়েলের কাছে আনুগত্যের প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করানোর পর তাদের অবাধ্যতার বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ বলেন...

اَفَتُؤۡمِنُوۡنَ بِبَعۡضِ الۡكِتٰبِ وَتَكۡفُرُوۡنَ بِبَعۡضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنۡ يَّفۡعَلُ ذٰلِكَ مِنۡكُمۡ اِلَّا خِزۡىٌ فِى الۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا ۚ
وَيَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ يُرَدُّوۡنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الۡعَذَابِ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعۡمَلُوۡنَ

“তবে কি তোমরা ধর্মগ্রন্থের কিছু অংশে বিশ্বাস আর কিছু অংশকে অবিশ্বাস কর? অতএব তোমাদের যেসব লোক এমন কাজ করে, তাদের প্রতিফল পার্থিক জীবনে লাঞ্ছনাভোগ ছাড়া আর কি হতে পারে? আর কিয়ামতের (শেষ বিচারের) দিন কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে। তারা যা করে সে সম্বন্ধে আল্লাহ অনবহিত নন।”(২:৮৫)

উম্মাহ কুরআনবিমুখ জীবনের কারণে আংশিক দ্বীন পালন করে, আর আল্লাহ পার্থিব জীবনে লাঞ্ছিত করবেন তা বলেই দিয়েছেন। এ আয়াতের শানে নুযুল....‘ ইহুদিদের জন্য তিনটি বিষয় হারাম ছিল এবং তারা এটা জানার পরেও তা প্রতিনিয়ত অমান্য করে যাচ্ছিল’। এখনকার মুসলিমরা কেবল তিনটি হারাম নয়, কুরআনের অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত অনেক হারামে লিপ্ত আছে। ইহুদিরাও কিতাবের হুকুমকে জানার পরেও মানে নি আর মুসলিমরা জানেও না আবার জানলেও মানে খুবই কমসংখ্যক মুসলিমরা। ফলে দুনিয়াতেই লাঞ্ছিত হতেই হবে মুসলিমদেরকে, জিল্লতির জিন্দেগীই তার জুটবে। এ জীবন অপমানের, সফলতা থেকে যোজন যোজন দূরে।

কুরআনের উপরোক্ত দুটি আয়াতদৃষ্টে উপলব্ধিতে আসে, বনী ইসরায়েলকে আল্লাহ পৃথিবীতে অধিষ্ঠিত করার পর যখন তারা আল্লাহর হুকুমকে ছেড়ে দিল এবং কিতাবের হুকুম অমান্য কারার দ্বারা ধৃষ্টতা দেখাল তখন তাদের অন্যায়ের দরুন আযাবে পতিত হয়েছে। যেহেতু প্রিয়তম নবী ﷺ আমাদের জন্য উপর থেকে আযাব ও জমিনের নিচ থেকে আযাব না দেওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে দুআ করেছেন এবং মালিক তাঁর দুআ কবুল করেছেন তাই আমরা এই দুই ধরণের আযাব থেকে নিরাপদ। তবে তৃতীয় প্রকার আমাকে দ্বারা আক্রান্ত উম্মাহ যার ব্যাপারে প্রিয় নবীর ﷺ দুআ কবুল করা হয় নি, পারস্পরিক ঝগড়া। নিজের দ্বীনী ভাইয়ের সাথে দ্বীনী বিষয় নিয়েই ঝগড়া-তর্কে লিপ্ত অথচ তা কুরআনবিরোধী কাজ।

কিতাবের হক আদায় না করে অবহেলা করার কারণ তারা সেক্যুলার সিস্টেমে মানবরচিত সংবিধানকে নিজেদের বিধি-বিধান, কল্পনা করেই অভ্যস্ত। কুরআনী

শাসন তারা দেখেনি, তাই কুরআনের হাকিকত অস্পষ্ট তাদের কাছে। কুরআনে বিধান দিয়েছেন আহকামুল হাকিমীন আল্লাহ রব্বুল আ'লামীন। তিনি হক, তিনিই সবচেয়ে বড় ইনসাফকারী, তিনি হাকিম, প্রজ্ঞাবান। কিন্তু আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে শিথিলতা কিংবা অজ্ঞতা ব্যতীত এই উম্মাহ আর কিছুই অর্জন করেনি কেবল সেক্যুলার সিস্টেমে বেড়ে উঠার কারণে এবং কুরআনের সাথে সম্পর্ক না রাখার কারণে। নাস্তিক-মুরতাদদের অযৌক্তিক পর্যালোচনা শুনে দ্বিধা-সংশয়ে ভোগে মুসলিমরা, তারাও আবার কুরআনের বিধানের সংস্কার চায়। এর কারণে তাদের কুরআন বিমুখতা চরমে পৌঁছেছে। যে উম্মাহ মালিকের হিকমতের তুলনায় নিজের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কপ্রসূত জ্ঞানকে বড় কল্পনা করে অধ:পতন তো তাদের হবেই।

বিদায় হজের ভাষণে নবী ﷺ বলেন, আমার অবর্তমানে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর কিতাব কুরআন রেখে যাচ্ছি। তোমরা যদি কুরআনের যাবতীয় বিধান শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো, তাহলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না।[২২]

কুরআনকে ত্যাগ করলে পথভ্রষ্ট হবে উম্মাহ। মিছাল পেশ করা যাক।১৩ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে একটি ইসলাহী বয়ানে কেনিয়ার দাঈ রেন্ডাইল উপজাতির (যারা পূর্বে মুসলিম ছিল) ইমানহারা হওয়ার বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। তার সারাংশ এই যে," রেন্ডাইলরা মুসলিম ছিল, কুরআন ছিল তাদের কাছে অনেক ভালোবাসার। কুরআনকে মুহাব্বত করার দরুন সর্বদা সাথে রাখতো, এমনকি চামড়ার থলে কাঁধে রাখতো কুরআনের জন্য। ঘুমানোর প্রয়োজন হলে একাশিয়া গাছের সাথে কুরআনের থলেকে ঝুলিয়ে দিত।
তারা সোমালিয়া ছেড়ে কেনিয়ার মার্সাবিতে আসলে সেখানে সাম্বুরু উপজাতিকে পায় যাদের কাছে গরু ছিল। আর রেন্ডেলেরা ছিল উটের মালিক এবং তাদের মেয়েরা ছিল অত্যাধিক সৌন্দর্যের অধিকারিনী। সাম্বুরুরা অমুসলিম হয়ে-ও রেন্ডেলেদের মেয়ের সাথে তাদের ছেলেদের বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার শর্তে গরু দেওয়ার অফার করে। কুরআনের হুকুমের বিপরীত হওয়ায় প্রথমে ইতস্তত করলেও পরে কতিপয় লোভী বিয়ে দিয়ে দেওয়া শুরু করে।পরে অন্যরাও দিতে থাকে। সাম্বুবুরা কুরআনকে দেখে ভয় পেত এবং একসময় তা ফেলে দেওয়ার পরামর্শ দেয়। মেয়ের শ্বশুরবাড়ির লোকের কথায় প্রথমত কুরআনকে ফেলে দিতে না চাইলে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে কুরআনকে হালুগুন্ডে পাহাড়ের উপরে রেখে আসার সিদ্ধান্ত নেয়। এক রাতে সমস্ত কুরআন সংগ্রহ করে সেই পাহাড়ের চূড়ায় রেখে আসে। তারপর কয়েকদিন ধরে পাহাড়কে ঘিরে অলৌকিক ঘটনা ঘটতে থাকে, শয়তানের ধোঁকায় পড়ে পাহাড়কে পবিত্র মনে করে পাহাড় পূজা করা শুরু করে। তারপর মিশনারিরা এ অবস্থা দেখে পাহাড়ের চূড়ায় রেখে আসে ক্রুশ এবং তাই তাদের 'আসল স্রষ্টা' বলে অভিহিত করে। এরপর সকলেই খ্রিষ্টান হয়ে পরে।"[২৩] এই ঘটনা থেকে সহজেই অনুমেয় প্রথমে নেক সুরতে

কুরআনের হুকুম থেকে বিচ্যুতি, পরবর্তীতে কুরআনকে নিজেদের থেকে সরিয়ে ফেলে পুরো একটা জাতি গোমরাহ হয়ে পথভ্রষ্টদের মধ্যে শামিল হয়ে গিয়েছিল।

এ কারণে কুরআন তিলাওয়াত করার সাথে সাথে কুরআনের শিক্ষাকে নিজের মাঝে ধারণ করা ও তা মনে লালন করার দ্বারাই সাহাবীদের ন্যায় দ্বীন পালন করা সম্ভব, তা না হলে আদর্শিক বিভ্রান্তিতে পড়তে হবে। সাহাবারা কুরআনের ১০ আয়াত শুনে সেই আয়াতসমূহ নিজের জীবনে বাস্তবায়ন না করা পর্যন্ত পরবর্তী আয়াত শিখতেন না। কিন্তু বর্তমানে তিলাওয়াতে অভ্যস্ত হয়ে শিক্ষা নিয়ে নিজের জীবনে আমল করার ব্যাপারে গাফিলতি দেখানো একপ্রকার কুরআন বিমুখতা।

নবী ﷺ এর ছাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট থেকে দশটি আয়াত শিখে এর মধ্যে যে জ্ঞান ও শিক্ষা আছে তদানুযায়ী আমল না করে অন্য দশটি আয়াত শিখার জন্য অগ্রসর হতেন না। তাঁরা বলতেন: "আমরা জ্ঞান ও আমল উভয়টিই শিখেছি।" তাছাড়া শরীয়তে এ ব্যাপারে মানুষকে উদ্বুদ্ধও করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন: يَتْلُونَهُ، حَقَّ تِلَاوَتِهِ "ওরা কুরআনকে যথাযথভাবে তেলাওয়াত করে।" (সূরা বাকারাঃ ১২১) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, "ওরা প্রকৃতভাবে কুরআনের অনুসরণ করে।" ফুযায়ল বিন ইয়ায (রহঃ) বলেন, "কুরআন তো নাযিল হয়েছে সে অনুযায়ী আমল করার জন্যই। কিন্তু মানুষ উহা তেলাওয়াত করাকেই আমল হিসেবে ধরে নিয়েছে।" [২৪]

কুরআন হলো আসমানী দিকনির্দেশনা। কুরআন আল্লাহর কালাম বা বাণী। কুরআনের প্রতিটি শব্দসহ আল্লাহ উচ্চারণ করেছেন এবং তা শ্রবণ করেছেন জীবরাইল আ. এবং তিনি তা প্রিয় নবীজির ﷺ কাছে পৌছিয়ে দিয়েছেন। সেই আসমানী দিকনির্দেশনা থেকে দূরে সরানোর জন্য কুফফারদের চেষ্টা-প্রচেষ্টার অন্ত নেই। আল্লাহ বলেন,

وَيُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوٰتِ اَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا

আর যারা প্রবৃত্তির অনুসারী তারা চায় যে, তোমরা ভীষণভাবে পথচ্যুত হও। (৪:২৭)

আর ওদের চূড়ান্ত লক্ষ্য কী, সেটাও আল্লাহ আমাদের সাফ জানিয়ে দিয়েছেন...

وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا

তারা তোমাদের সাথে লড়াই করতে থাকবে, যতক্ষণ না তোমাদেরকে তোমাদের দীন থেকে ফিরিয়ে দেয়, তারা যদি পারে... (২:২১৭)

একারণে কুরআনকে আঁকড়ে ধরতে হবে; তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে দেওয়া যাবে না, তারা চায় না আমরা শরীয়াহর অনুসারী হই। তারা আমাদেরকে কুরআন থেকে দূরে রেখে দ্বীন থেকে দূরে সরাতে চায়। দ্বীন থেকে দূরে সরে গেলে উম্মাহর ধ্বংস অবধারিত। বর্তমানে উম্মাহর অবস্থাও এমনই করুণ।

সিরাহ বিমুখ

সিরাহ বললেই একবাক্যে উপলব্ধিতে চলে আসে প্রিয়তম রসুলের ﷺ জীবনীর কথা। সীরাহ আমাদের নবী ﷺ –এর সমগ্রজীবন। তাঁর ﷺ জীবনধারণের পদ্ধতি, কথা বলার ভঙ্গি, তাঁর ﷺ দেহের আকৃতি, তাঁর ﷺ আচরণ, তাঁর ﷺ মুআমালাত-মুআশারাত, তাঁর ﷺ অমুসলিমদের সাথে আচরণ – সমগ্রজীবনের ঘটনার সমারোহ এই সীরাহ। সীরাহ জানা থাকলে কুরআন বুঝা সহজ হয়ে উঠে, কেননা সমগ্র কুরআন তাঁর ﷺ ২৩ বছরের নবুয়তী জীবনে ধারাবাহিকভাবে কোনো কোনো ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে, এজন্য সীরাহ জানা আবশ্যক। তাছাড়া সীরাহ জানা থাকলে এটাও জানা যায় দ্বীনের জন্য তাঁর ﷺ কুরবানি কত অধিক, এই দ্বীন কত দামী। এ-ও জানা যায় আমাদের জন্য রসুল ﷺ এর অশ্রু বিসর্জনের কথা।

সীরাহর কল্যাণকর দিক প্রচুর। সাহাবীরা তাদের সন্তানদেরকে মাগাধী অর্থ্যাৎ সীরাহ জানার জন্য জোর দিয়েছেন। কেননা তাঁর ﷺ জীবনীই তাদেরকে দ্বীনকে আঁকড়ে ধরা শিখিয়েছে। দ্বীনকে কিভাবে মানতে হয় তা-ও শিখিয়েছে সীরাহ, যেই দ্বীনের জন্য মুসলিম উম্মাহ সম্মানিত এবং অধীনস্থ থেকে বিশ্বের শাসকের স্থলে অধিষ্ঠিত হয়েছিলো। ঠিক এক প্রজন্ম পার হতে -না-হতেই যদি মাগাযী জানা এত জরুরি বিষয় হয়, তাহলে এত শত বছর অতিবাহিত হওয়ার পর সীরাহ জানা কতখানি জরুরি তা সহজেই অনুমেয়। এ কারণেই তারা নবীজি ﷺ এর আদরশের উপর তারা মজবুতির সাথে টিকে থাকতে পেরেছিলেন। আদর্শকে ভুলে না গিয়ে নিজের মাঝে লালন করার ক্ষেত্রে জানার বিকল্প নেই, যারা আদর্শ কেমন হবে তার ইলমে ঘাটতি থাকবে তার সঠিক পথে চলাই কষ্টসাধ্য। কালিমার ধারক-বাহক সেই মুসলিম জাতির কেমন হবে পথচলা তা লিপিবদ্ধ আছে কুরআনে এবং নবী ﷺ এর জীবনে।

আল্লাহ বলেন,

لَقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِیۡ رَسُوۡلِ اللّٰهِ اُسۡوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنۡ كَانَ يَرۡجُوا اللّٰهَ وَالۡيَوۡمَ الۡاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيۡرًا ؕ

তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর (চরিত্রের) মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।(৩৩:২১)

এই আয়াতে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, রসূল ﷺ-এর আদর্শে ঐ ব্যক্তি আদর্শবান হবে, যে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে সাক্ষাতে বিশ্বাসী এবং যে বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ করে থাকে। বর্তমানে অধিকাংশ মুসলমান উক্ত দুই গুণ থেকে বঞ্চিত। যার ফলে তাদের অন্তরে রসূল ﷺ-এর আদর্শের কোন গুরুত্ব নেই। এদের মধ্যে যারা দ্বীনদার তাদের আদর্শ হল পীর ও বুযুর্গরা। আর যারা দুনিয়াদার বা রাজনৈতিক তাদের আদর্শ ও পথপ্রদর্শক হল পাশ্চাত্যের নেতারা। রসূল ﷺ-এর প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসার কথা এরা মুখে খুব দাবী করে, কিন্তু কার্যতঃ তাঁকে ﷺ নিজেদের আদর্শ, নেতা ও পথপ্রদর্শক মানার ব্যাপারে অধিকাংশই পিছনে। সুতরাং এ বিচার আল্লাহই করবেন।[২৫] প্রকৃত সত্য এটাই যে সীরাহ না জানার কারণে উম্মাহর মাঝে ওই দুইটি গুণও হারিয়ে যাচ্ছে, ইমানী দিক দিয়েও হয়ে পড়ছে দেউলিয়া।

সীরাহ জানা নিয়ে নেই কোনো আগ্রহ। এটার বড় একটা কারণ দুনিয়াবি শিক্ষা ও দ্বীনী শিক্ষার ক্ষেত্র দুটো আলাদা সিস্টেমে, ফলে যারা দ্বীনী শিক্ষা নেয় কেবল তারাই সিরাহ জানে। আর দুনিয়াবি শিক্ষা তথা জেনারেল লাইনে পড়া মুসলিমরা তাঁর সীরাহকে জানতে পারে না, এমনকি জানাকে আবশ্যকও মনে করে না। এটার আরো একটা কারণ পরিবারগুলো আজ মৃত, তাদের ঘরে সীরাহর আলোচনা কিংবা ইসলামিক আলোচনার স্থান নেই। এ কারণে-ও উম্মাহর অধিকাংশ সীরাহর ব্যাপারে অজ্ঞ থেকে যায়।

সাহাবীদের একটা অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো নবী ﷺ এর নি:শর্ত আনুগত্য যা তাদের দুনিয়া-আখিরাতে কল্যাণের উসিলা। হুদাবিয়ার সন্ধির পর উমরা করতে না পারার কারণে মন:ক্ষুণ্ন সাহাবিদের হাদির পশুকে কুরবানি করা ও মাথা মুণ্ডন করার আদেশ দেন। এমনকি তিনবার বলার পরও না করে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নবী ﷺ তখন রাগান্বিত অবস্থায় ঘরে এলে বিবি উম্মে সালামা (রা)-কে এসে বলেছিলেন,

'মুসলিমরা নিজেদেরকে ধ্বংস করে ফেলেছে। আমি তাদের আদেশ দিলাম অথচ তারা তার অবাধ্যতা করছে।' প্রকৃতপক্ষে সাহাবারা অপেক্ষায় ছিলেন আসমানী ওহির, হয়তো তারা ওমরা করে যেতে পারবেন কিংবা পরিস্থিতি তাদের অনুকূলে আসবে এই আশায়। উম্মে সালামা (রা) এর পরামর্শে নবী ﷺ কুরবানী ও মাথা মুণ্ডন করলে সাহাবীরা-ও (রা) তা করেন। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, নবী ﷺ এর আদেশ না মানলে তা মুসলিমদের ধ্বংস ডেকে আনবে। তাঁর ﷺ আদেশ মানা জরুরি।
কুরআনে এসেছে,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ؕ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ؕ

আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন বিশ্বাসী পুরুষ কিংবা বিশ্বাসী নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের অবাধ্য হলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।(৩৩:৩৬)

যখন কেউ সীরাহ পড়বে তখনই জানতে পারবে সাহাবীরা কিভাবে রসুল ﷺ এর আদেশ মান্য করতেন, কিভাবে করতেন আনুগত্যের প্রকাশ। তখন রাসুল ﷺ এর আদেশ মানার বাধ্যবাধকতা উম্মতের উপলব্ধিতে আসতো, প্রতিটি ঘটনাই তাকে স্মরণ করিয়ে দিত রাসুল ﷺ এর আনুগত্য করতে। কিন্তু সীরাহবিমুখ এই উম্মাত সীরাহ জানেই না, জানলেও তার শিক্ষা নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করতে আগ্রহী নয়, কিতাবের পাতায় রয়ে যায় তার শিক্ষা।
নবী ﷺ এর চরিত্রমাধুর্য স্পষ্ট প্রতিভাত হয় তাঁর ﷺ সমগ্রজীবনে। তিনি ﷺ এমন উত্তম আখলাকের অধিকারী ছিলেন যা অতুলনীয়, তাঁর ﷺ আচরণে মুগ্ধ হয়ে কাফের-মুশরিক-আহলে কিতাবীদের মধ্যে অনেকেই ইসলাম কবুল করেছেন। ইসলাম পূর্ব জীবনে মুসলিমদের বিরোধিতার পরে ইসলাম কবুল করার পরে তাদেরকে বুকে আগলে নিয়েছেন, আল্লাহর কাছে করেছেন দোআ। শত্রুকে আসন পেতে বসতে দিয়ে নিজে বসেছেন মেঝেতে কিংবা কখনো কোনো অসহায়ের কষ্টের কথা ধৈর্যসহকারে শুনেছেন দীর্ঘসময়- এত বিনয়ী বাদশাহ কে কবে দেখেছে। ইতিহাস সাক্ষী, এটা কেবলই নবী ﷺ এর পক্ষেই সম্ভব। বিনয় ছিল তাঁর ﷺ পোশাক, আখলাক ছিল সেরা। আর আজ উম্মাহর মাঝে বিনয়ের ঘাটতি আর মন্দ আখলাকের ছড়াছড়ি। সীরাহর শিক্ষার বড়ই অভাব।

তাঁর ﷺ সীরাহ জানলে কুরআনের সুরাসমূহ কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে তা জানা যায়। কোন পরিস্থিতিতে কি করা প্রয়োজন তার আসমানী ওহি কিভাবে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে তা জানা যায়, কিন্তু সীরাহ না জানা থাকায় তারা এসব বিষয় জানতে পারে না এবং তার সামর্থ্য অনুযায়ী নিজের এবং পরিচিতদের মধ্যে তা বাস্তবায়ন-ও করতে পারে না। এমনকি কুরআন পড়ে তারা আরও বিপদে পড়ে, কেউ একজন তো মোহরানা আর পতিতার টাকার মাঝে তফাত করতে পারে না।[২৬] কারণ সে জাহিলিয়াত সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি লালন করে, তাই কুরআন সরাসরি পড়ার পর জাহিলিয়াতের আলোকেই তার বিচার-বিশ্লেষণ করেছে। এক্ষেত্রে সীরাহ জানলে সেই সময়কার পরিস্থিতি এবং ইসলামের জাহিলিয়াত দূরীকরণে ভূমিকা কত গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা সুস্পষ্ট হবে এবং তারপর কুরআন পাঠ তাকে হিদায়াতের পথচলায় সহযোগী হবে, নয়তো বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এমনকি তখন নামেমাত্র মুসলিমরা–ও হয়তো ইসলামী বিধিনিষেধকে বেঠিক মনে করে ইমান হারিয়ে ফেলবে।

সীরাহ না জানার কারণে জিহাদকে উম্মাহ অপ্রয়োজনীয় মনে করে, হোক সেটা আক্রমণাত্মক কিংবা প্রতিরক্ষামূলক। তাদের ফরজ বিধান নিয়ে সংশয়ের অবসান সীরাহকে জানার দ্বারাই হবে। নবী ﷺ জিহাদকে ইসলামের পাঁচ ভিত্তির উপরের ছাদ সাব্যস্ত করেছেন, সেই জিহাদ কতই–না জরুরি তা–ও বুঝবে উম্মাহ সীরাহ পড়ার দ্বারা। সীরাহ জানে না বিধায় তারা বুঝতে পারে না যে জিহাদের দ্বারা কালিমাকে বুলন্দ করা যাবে আল্লাহর জমিনে এবং সম্মানের সেই জীবন ফিরে পাবে উম্মাহ। কিন্তু সীরাহ না জানায় তারাও পশ্চিমাদের সুরে সুর মিলিয়ে মুজাহিদদের জঙ্গি (Terrorist) তকমা দেয়, জিহাদের মতো ফরজ বিধানকে সন্ত্রাসবাদ বা Terrorism আর কাফেরদের War on Terror -কে তারা মনে করে শান্তিকামীদের শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হিসেবে। এভাবে বাতিলকে হক কল্পনা করে উম্মাহ, আর হককে সাব্যস্ত করে বাতিল। অথচ তারা যে ইসলামের অনুসারী সেই ইসলাম এসেছেই বাতিলকে বিলুপ্ত করতে আর আজ তারাই কি–না বাতিলের কাজে সমর্থন করে। এমনকি জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী কিংবা ন্যাটোর বাহিনী হয়ে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে মুসলিমরা দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, মুসলিমরা কাফেরদের সাথে থেকে অস্ত্র তুলে মুজাহিদিনের বিরুদ্ধে। এটা নিজের অজান্তেই করে যাচ্ছে এবং সীরাহ না জানায় তারা বুঝতেই পারে না মুসলিম হয়েও বাতিলের পক্ষে থাকলে সেও বাতিলের দলভুক্ত হবে। যে নবীর ﷺ জীবনের ১০ বছরে প্রত্যেক্ষভাবে ২৭ টি জিহাদে আর তার সমগ্রজীবনে সবমিলিয়ে ৬৩ টি জিহাদ সংঘটিত হয়েছে, তাঁর ﷺ জীবনী পাঠের দ্বারা জিহাদের

গুরুত্ব স্পষ্ট হবে এবং জিহাদ নিয়ে তাদের ভুল ধারণার অবসান হবে। সীরাহ না জানার দরুন বাতিলের পক্ষ নিলে আল্লাহ-ও বাতিলের মতো তাদেরকে পরাজিত করবেন দুনিয়াতে।

নবীজির ﷺ আনুগত্য করাটা অনেক কল্যাণকর, ঠিক বিপরীতটাও সত্য। তাঁর অবাধ্যতা বিপর্যয় ডেকে আনে এবং অধ:পতনের জন্য দায়ী। উহুদে স্পষ্ট বিজয় ক্ষণিকেই রূপ নেয় পরাজয়ে। কারণ দুনিয়ার মালের মহব্বতে রাসুল ﷺ এর হুকুমকে ছেড়ে দেওয়া। আসলে তারা হুকুমটির গভীরতা বা ব্যাপকতা বুঝতে ভুল করেছিলেন। মুসলিমরা রসুল ﷺ এর আদেশ অমান্য করে গুনাহ করলেও আল্লাহ তাদের ক্ষমা করেছেন, এতেও রয়েছে উম্মতের জন্য বিরাট শিক্ষা। নবীজির ﷺ আনুগত্য কত উত্তমরূপে বিপর্যয় ও অধ:পতন ঠেকাতে পারে। উম্মাহর অধঃপতনের পিছনে বড় একটি কারণ সীরাহবিমুখতা, ফলে না জানার দরুন আনুগত্যের ব্যাপকতা উপলব্ধি করতে না পেরে তারাও পদে পদে রসুলের ﷺ অবাধ্যতা করেই যাচ্ছে। কিন্তু এর মাশুল গোটা উম্মাহকেই দিতে হচ্ছে যেমনটা উহুদে হয়েছিল।

সুন্নাহকে ছেড়ে দেওয়া

সুন্নাহ প্রিয়তম রসুল ﷺ এর কথা,কাজ কিংবা মৌনসম্মতি। সুন্নাহ পালন করার মাঝেই প্রতিটি পদক্ষেপে রসুলকে ﷺ স্মরণ করা হয়, ইমান যেন জাগরুক হয়ে থাকে সর্বদা। যখন জীবনের প্রতিটি কাজ হয় সুন্নাহবিবর্জিত, তখন তার ফলাফল দাঁড়ায় মানুষের মধ্যে যাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতে হবে তাঁর ﷺ প্রতি ভালোবাসায় কমতি চলে আসে।

রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده و والده

তোমাদের কেউ পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার নিকট তার পিতামাতা, ছেলেমেয়ে এবং জগতের সকল মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় না হব।[২৭]

রসুলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন,

لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لّما جئت به

তোমাদের কেউ ইমানদার হতে পারবে না যে পর্যন্ত তার মনের ইচ্ছা আমি (রসুল ﷺ) যা কিছু নিয়ে এসেছি তার অনুগামী না হয়।

এই হাদিসদ্বয় থেকে স্পষ্ট হয় যে নবী ﷺ এর অনুসরণ কতটুকু জরুরি এবং ইমানের সাথে তার সম্পৃক্ততা কতটুকু তা অনুমেয়। তাই মুমিন মাত্রই রসুল ﷺ এর অনুসরণ করবে, সুন্নাহ দিয়ে সাজাবে নিজের জীবনকে। পূর্ণ ইমানদার হওয়ার শর্তই হলো রাসুলকে ﷺ সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা, এমনকি নিজের জানের চেয়েও। আল্লাহ বলেন,

اَلنَّبِیُّ اَوۡلٰی بِالۡمُؤۡمِنِیۡنَ مِنۡ اَنۡفُسِہِمۡ ,
নবী, বিশ্বাসীদের নিকট তাদের প্রাণ অপেক্ষাও অধিক প্রিয়(৩৩:০৬)

একজন মুমিন যখন প্রাণের চাইতেও অধিক ভালবাসবে তার রাসুলকে ﷺ, তখন সে সুন্নতের প্রতি যত্নবান হবে এটাই স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত বিষয়। তার ﷺ অনুসরণ করার ব্যাপারে কুরআনেও নির্দেশনা এসেছে।
আল্লাহ বলেন,

لَقَدۡ کَانَ لَکُمۡ فِیۡ رَسُوۡلِ اللّٰہِ اُسۡوَۃٌ حَسَنَۃٌ لِّمَنۡ کَانَ یَرۡجُوا اللّٰہَ وَالۡیَوۡمَ الۡاٰخِرَ وَذَکَرَ اللّٰہَ کَثِیۡرًا ؕ

তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর (চরিত্রের) মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। (৩৩:২১)

এটি একটি ব্যাপক আদেশ। অর্থাৎ নবী ﷺ-এর সকল কথা, কাজ ও অবস্থাতে মুসলিমের জন্য তাঁর অনুসরণ আবশ্যিক; তা ইবাদত সম্পর্কিত হোক বা সমাজ সম্পর্কিত, জীবিকা সম্পর্কিত হোক বা রাজনীতি সম্পর্কিত, জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাঁরই নির্দেশ পালন করা একান্ত কর্তব্য।[২৮] আর আজকাল সকল ক্ষেত্রেই তাঁর ﷺ অনুসরণকে পরিত্যাগ করেছে উম্মাহ, কুরআনী আদেশ থেকেও দূরে সরে গিয়ে সুন্নাহকে করছে অবহেলা- অবজ্ঞা।

সুন্নাহকে যত্নসহকারে পালন করা মানে দ্বীনের ব্যাপারে বেশি যত্নশীল হওয়া, দ্বীনকে অগ্রাধিকার দেওয়া। যে সুন্নাহ পালনে যত্নশীল সে অবশ্যই ফরজ পালনে অধিক যত্নবান ও সচেতন হবে। কেননা সুন্নাহর ব্যাপারে শরীয়তের অবস্থান ফরজের তুলনায় শিথিল। সুন্নাহ ছাড়া মানে দ্বীনের ব্যাপারে আগ্রহে কমতি, কমতি রসুলের ﷺ প্রতি মুহাব্বাতে। প্রত্যেকেই দুনিয়াবি কাজ প্রতিনিয়ত করেই থাকে, কিন্তু ঐ কাজগুলোর ব্যাপারে যখন দ্বীনের প্রচারক প্রিয়তম রসুলের ﷺ অনুসরণ করা হয় তখন তার দ্বীনকে সুরক্ষিত রাখে। কেননা যে ব্যাপারে শরীয়তে ছাড় আছে তা-ই যখন দৃঢ়তার সাথে পালন করা হবে তখন তার দ্বীনের ব্যাপারে যত্নশীলতা ও সচেতনতা আরো অধিক হবে। ঠিক বিপরীতটাও সত্য। অর্থ্যাৎ যে সুন্নাহর ব্যাপারে শিথিল সে ফরজের ব্যাপারেও শিথিলতা প্রদর্শন করবে।

ফকিহ আবুল লাইস সমরকন্দী রহ. বলেন, ইসলামের পাঁচটি কিল্লা আছে। প্রথম কিল্লা হলো একীন ও বিশ্বাস। দ্বিতীয় কিল্লা হলো ইখলাস ও নিষ্ঠা। তৃতীয় কিল্লা হলো শরিয়তের ফরজসমূহ। চতুর্থ কিল্লা হলো রসুলুল্লাহর ﷺ সুন্নতসমূহ। আর পঞ্চম কিল্লা হলো আদব। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত জীবনের সকল ক্ষেত্রে আদব মেনে চলে ততক্ষণ পর্যন্ত শয়তান তার সম্পর্কে নিরাশ থাকে। আর যখন সে আদব ছেড়ে দেয় শয়তান তাকে সুন্নত ছাড়তে উৎসাহিত করে। অনন্তর সে ধীরে ধীরে ফরজ, ইখলাস ও একীনশূণ্য হয়ে পড়ে।[২৯]

সুন্নাহ পালনে হৃদয়ে প্রাচুর্যতা আসে, না পালনে দৈন্যতা দেখা দেয়। কেননা সুন্নাহ দ্বারাই উপলব্ধিতে আসে দ্বীন ইসলাম কতটা সুসংহত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। প্রতিটা কাজ, হোক সেটা দুনিয়াবি, তার ব্যাপারেও ইসলামি দিকনির্দেশনা আছে। কিন্তু সুন্নত ছেড়ে দেওয়ার কারণে দুনিয়াবি কাজে ব্যস্ত উম্মাহ অধিকাংশ সময় কাটিয়ে দেয় আল্লাহর যিকির ছাড়াই, হৃদয় হয়ে পড়ে কঠিন। ধীরে ধীরে ফরজ আমলসমূহ হয়ে পড়ে ইখলাসবিহীন, অনেকটা রুটিনমাফিক কাজের মতো।

সুন্নাত ছাড়ার অনিবার্য ফলাফল দুনিয়াবি কাজগুলোতে রাসুলের ﷺ তরীকা ছেড়ে দেওয়া। সেসকল কাজে সুন্নত ছাড়ার পর মুসলিমরা পশ্চিমে কিছু সময় অতিবাহিত করতেই কিংবা মিডিয়ার সংস্পর্শে এসে তথাকথিত সভ্যদের কাছ থেকে আদব-আখলাক, কৃষ্টি-কালচার আমদানি করে মুসলিম সমাজে। অতপর মুসলিমরা তাদের তরিকার অনুসরণ শুরু করে, পুরো উম্মাহ এই মহাব্যাধিতে আক্রান্ত। এভাবেই আদর্শিক অধ:পতনের সাগরে ডুবন্ত উম্মাহ।

সাহাবিদের আদর্শ ত্যাগ

সাহাবায়ে আজমাইন(রা) এমন এক সম্মানিত জামা'ত যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করেছেন, যার সাক্ষ্য দিয়েছেন মহান রব্বুল আ'লামীন। আল্লাহ বলেন,

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা তাদেরকে অনুসরণ করেছে সুন্দরভাবে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাতসমূহ, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে। এটাই মহাসাফল্য(৯:১০০)

কত সুন্দর সাক্ষ্য! رضي الله عنهم و رضوا عنه অর্থ্যাৎ আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট আর তারা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। এরপরেই দুনিয়াতে থাকাকালীন সময়েই তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুবহানাল্লহ!
তারা দুনিয়াতে আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করতে পেরেছেন। তাদের আদর্শ অনুসরণের মাঝে আল্লাহর সন্তুষ্টি নিহিত। তারা দুনিয়া ও আখিরাতে উভয় জাহানেই কামিয়াব। তারাই আরোহণ করেছিলেন উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে। তাদের অনুসরণ করলেই উন্নতি ও সাফল্যের চূড়ায় উত্তরণ করা সম্ভব।

বর্তমান সময়ে উম্মত ব্যস্ত সেলিব্রিটি, নায়ক-নায়িকা, গায়ক-গায়িকা, খেলোয়াড় নিয়ে। তাদের জীবনের পরতে পরতে থাকা সকল ঘটনা তাদের জানা। আফসোস! তারা সাহাবীদের সোনালী অতীতকে ভুলে গিয়েছে এবং তাঁদের জীবনী সম্পর্কে তারা গাফেল হয়ে আছে। আর তাঁদের সম্পর্কে জানা না থাকার কারণে কাফের-ফাসেকদের নষ্ট-ভ্রষ্ট আদর্শকেই তারা অনুসরণীয় অনুকরণীয় মনে করছে। মনেপ্রাণে তাদের প্রতিই তাদের ভালোবাসা। উম্মাহ আজ তার ইতিহাসের স্বর্ণযুগের মানুষদের আদর্শ ছেড়ে দিয়ে ফাসেক-কাফের-মুশরিকদের অনুকরণ-অনুসরণ করায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তাদের হৃদয়ে নেই সাহাবিদের অনুসরণ-অনুকরণের সামান্যতম বাসনা, যারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছিলেন তাদেরকে অনুসরণ করা ছেড়ে দিয়েছে উম্মাহ। উম্মাহর জীবনে নেই সাহাবীদের আদর্শ। চলাফেরা, কথাবার্তা,

যুদ্ধ-চুক্তি, বন্দী বিনিময় - কোন ক্ষেত্রে আদর্শের ঘাটতি আছে এই উম্মাহর সাহাবীদের মাঝে? এমন কোন ক্ষেত্রই নেই যেখানে তাঁদের আদর্শ নেই। অথচ উম্মাহ তাদের অনুসরণ ছেড়ে দিয়ে আদর্শগতভাবে দেউলিয়া হয়ে কাফেরদের আদর্শের কাছে ধরণা দিয়েছে এবং দিয়ে যাচ্ছে। অথচ ইমানী পরীক্ষায় কখন কি করতে হবে তা তাঁদের জীবনী পড়লেই জানা যায়, কিন্তু কাফেরদের অনুসরণে একজন মুসলিম তার যথাযথ করণীয় কি তা বুঝতে না পারার কারণে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতে পারে যা তার ইমানকে বিপদে ফেলে দিবে। এভাবে সাহাবীদের আদর্শকে ত্যাগ করে আদর্শগতভাবে পিছিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে উম্মাহ ইমানী দিক দিয়েও বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ছে।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহমাতুল্লাহি 'আলাইহি বলেছেন, " আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুল ﷺ কর্তৃক সকল আদিষ্ট বিষয়াবলীর উপর আমল ও সকল নিষিদ্ধ বিষয়াবলী পরিহার করাকে ইমান বলে।[৩০] পরিপূর্ণ ইসলাম মানার নামই ইমান, ইমানের এমন সংজ্ঞাই ছিলো সাহাবীদের কাছে। সুরা বাকারার শুরুতেই বলা হয়েছে সাহাবীদের মতো ইমান আনাই হলো প্রকৃতপক্ষে ইমান আনা, তাদের ইমানই ইমানের মাপকাঠি। যাদের ইমান তাদের ইমানের সাথে মিলবে তাদের ইমানই গ্রহণযোগ্য। কুরআন এসেছে,

وَاِذَا قِيۡلَ لَهُمۡ اٰمِنُوۡا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوۡٓا اَنُؤۡمِنُ كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ‌ؕ اَلَآ اِنَّهُمۡ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰـكِنۡ لَّا يَعۡلَمُوۡنَ

যখন তাদের বলা হয়, 'অপরাপর লোকদের মত তোমারাও বিশ্বাস কর', তারা বলে, 'নির্বোধেরা যেরূপ বিশ্বাস করেছে আমরাও কি সেরূপ বিশ্বাস করব?'সাবধান! এরাই নির্বোধ, কিন্তু এরা জানে না।(২:১৩)

মহান আল্লাহ অতীত ও বর্তমান উভয় কালের মুনাফিক্বদের কথা খন্ডন ক'রে বলেন, উচ্চতর অভীষ্ট লাভের জন্য পার্থিব স্বার্থসমূহ কুরবানী দেওয়া অজ্ঞতা নয়, বরং তা-ই প্রকৃত বুদ্ধিমত্তা ও সৌভাগ্যের কাজ। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)গণ তো এই সৌভাগ্যেরই প্রমাণ প্রস্তুত করেছেন। আর এই জন্যেই তাঁরা কেবল পাক্কা মু'মিনই নন, বরং তাঁরা হলেন (অপরের) ঈমান নির্ণায়ক মাপকাঠি ও কষ্টিপাথর। এখন তো ঈমান তারই গণ্য হবে, যে তাঁদের মত ঈমান আনবে। "তোমরা যেরূপ বিশ্বাস করেছ তারা যদি সেরূপ বিশ্বাস করে, তাহলে নিশ্চয় তারা সুপথ পাবে।"[৩১] সাহাবীরা ইসলামকে পালন করেছিলেন পরিপূর্ণ, রাসুল ﷺ এর আনুগত্য করেছিলেন পুংখানুপুংখভাবে। তারা এমন মজবুত ইমানের অধিকারী

ছিলেন যে ইসলাম ছিল তাঁদের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, কিন্তু পরবর্তীরা তাদের আদর্শ ছেড়ে দিয়েছে। হাসান বসরী রহ. বলেন, “যদি তোমরা সাহাবিদের দেখতে তাহলে তাদের পাগল বলতে, যদি তারা তোমাদের দেখতো তাহলে অমুসলিম বলতো”[৩২]

হাদিসে এসেছে, “সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ আমার যুগ, মর্যাদার বিচারে এর পরের স্থানে তাদের যুগ যারা আমার যুগের সাথে মিলিত। এরপর তাদের যুগ যারা তাদের(সাহাবীদের) সাথে মিলিত। এরপর তাদের যুগ যারা তাদের(তাবেঈদের) সাথে মিলিত। বর্ণনাকারী বলেন, এখন আমার মনে নেই তিনি যুগ দুইটি উল্লেখ করেছিলেন নাকি তিনটি। এরপর এমন এমন লোক আসবে যারা না চাইলেও সাক্ষ্য দিতে তৈরি হয়ে যাবে। খিয়ানত করনে, আমানত রক্ষা করবে না, ওয়াদা ভঙ্গ করবে, অঙ্গীকার রক্ষা করবে না। তাদের মাঝে (আদর্শিক চিন্তা-চেতনা না থাকার দরুন) স্থুলতা প্রকাশ পাবে।[৩৩] নবী ﷺ এর কথার বাস্তবতাই আজ উম্মাহর মাঝে বিরাজ করছে। সাহাবীদের মতো ইমান আনতে পারা লোকের সংখ্যা আজ খুবই কম, তাদের মতো ইমান আনতে পারেনি বলেই তারা আদর্শিক অধ:পতনের শিকার, ইমানের কমতিই এর কারণ। জীবনের পদে পদে তখন বাজতে থাকে অধ:পতনের করুণ ধ্বনি।

রাসুল ﷺ এর নি:শর্ত আনুগত্য ছিল সাহাবীদের অনন্য বৈশিষ্ট্য, সুন্নাহকে আকড়ে ধরেছেন তারাই। তারা নবীজকে ﷺ জিজ্ঞেস করেননি এটা কি সুন্নত নাকি ফরজ নাকি মুস্তাহাব, নবীজি ﷺ বলেছেন,করেছেন কিংবা করতে অনুমতি দিয়েছেন তো তারা তা-ই মেনে নিয়ে তাঁরই ﷺ অনুসরণ করেছেন। তাঁর ﷺ নির্দেশ না মানার মতো মনমানসিকতা তাদের ছিল না। তারা নিজেদের জীবনের চাইতেও রসুলকে ﷺ ভালোবাসতেন। কেননা আল্লাহ বলেন,

,

اَلنَّبِیُّ اَوۡلٰی بِالۡمُؤۡمِنِیۡنَ مِنۡ اَنۡفُسِہِمۡ

নবী, বিশ্বাসীদের নিকট তাদের প্রাণ অপেক্ষাও অধিক প্রিয়(৩৩:০৬)

নবীকে ﷺ ভালোবাসা কতটা জরুরি, স্বয়ং আল্লাহ তা বান্দাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। তাঁর ﷺ আনুগত্য করার মাঝেই নিহিত সত্যিকারের মুসলিম হওয়া যা সাহাবায়ে আজমাইন(রা) করে গিয়েছেন।

এমনকি রসূল ﷺ-এর আনুগত্যে আলস্য, অবজ্ঞা, অবহেলা বা ত্রুটি প্রদর্শন করলেও সঠিক অর্থে মুসলিম হওয়া যায় না।[৩৪] অথচ উম্মাহ আজকাল এগুলোতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তারা সাহাবীদের আদর্শ ছেড়ে দেওয়ায় নবী ﷺ এর আনুগত্যেও অবহেলা, ত্রুটি, আলস্য কিংবা অবজ্ঞা করেই যাচ্ছে, কালের বিবর্তনে হারাতে যাচ্ছে অনেক সুন্নাহ।

সাহাবীদের আদর্শ ত্যাগ করার বদৌলতে উম্মাতের অধিকাংশের আখলাক কারোর হিদায়াতের কারণ হতে পারে না। অথচ সাহাবাদের আচরণেও মুগ্ধ হয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে অনেকেই স্বেচ্ছায় চলে এসেছে- এমন বহু নজির আছে। আর এখন উম্মাহর বেশিরভাগের আখলাক দাওয়াতের উসিলা হয় না, বরং তাদের আখলাক দেখে কাফেররা এই দ্বীনকে তাদের দ্বীন-ধর্মের মতোই মনে করে কিংবা তার চাইতেও খারাপ ধর্ম মনে করে। আজ দু:খের সাথে বলতে হয়, যে পাপের এমন কোনো ক্ষেত্র বাদ নেই যার মাঝে বর্তমান মুসলিম উম্মাহ জড়িত নয়। পূর্ববর্তী যত পাপে জর্জরিত ছিল সকল জাতির সবধরণের পাপে কলংকিত আজকের উম্মাহ, কাফিরদের সাথে কোনো তফাত নেই। তাদের নিকটও ইসলামকে অন্যান্য ধর্মের মতো অকার্যকর মনে হয় । এভাবে কাফিরদের হৃদয়ে ইসলামের ভাবমূর্তিকে নষ্ট করে উম্মাহ অধ:পতনের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে। এর কারণও সাহাবীদের আদর্শকে ভুলে যাওয়া, নিজেদের মাঝে তা ধারণ না করা।

সাহাবিদের জীবনের দিকে তাকালে দানশীলতার ব্যাপারে অজস্র মিছাল দৃষ্টিগোচরে আসে। কুরআন কারীমে আল্লাহর রাহে দান করার অসংখ্য আয়াত এসেছে, আর কুরআনের অনুসরণ নবী ﷺ এর পরে সবচেয়ে বেশি করেছেন সাহাবীরা । তারা এত অধিক পরিমাণে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করতেন যে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব, এত দীর্ঘ সেই উদাহরণের তালিকা। তাদের জান-মাল-সময়কে কাজে লাগিয়ে সাহাবারা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। জিহাদে দু-একটা খেজুর দিয়েও তারা অংশ নিয়েছেন, বাহনের অভাবে জিহাদের কাফেলায় শরিক হতে না পারার ব্যাথায় ব্যথিত হয়ে অশ্রুসিক্ত নয়নে বাড়ি ফিরেছেন তারা। নিজের শেষটুকু দিয়ে, সবটুকু দিয়ে, কেউ সম্পূর্ণ কিংবা অর্ধেক সম্পদ দিয়ে দ্বীনের সাহায্য করেছেন। আর আজ উম্মাহর দিল পরিপূর্ণ দুনিয়ার মুহাব্বাতে। সামান্য কিছু দান-সদকা করেই দ্বীনের জন্য অনেক খিদমত আঞ্জাম দিয়েছন এমন মনমানসিকতাসম্পন্ন মুসলিমরা কি করে বুঝবে সাহাবাদের দানের মর্ম! আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার দিক দিয়ে তাদের

অনুসরণ ব্যতীত রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। কেননা সাহাবারা জান-মাল নিয়ে আল্লাহর রাহে জিহাদ করার দ্বারাই পৃথিবীতে কালিমাকে বুলন্দ করেছিলেন। রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত না হওয়া অবধি আমাদের অধ:পতনের অবস্থা থেকে উত্তরণ সম্বব নয়। সাহাবিদের সেই আদর্শকে ত্যাগ করে আদর্শগতভাবে পিছিয়ে আছি যার ফলে আমাদেরকে কাফেরদের শাসনে অনিশ্চয়তার সহিত চলতে হয়, কিন্তু কাফেররা ইসলামী শাসনের অধীনে জিযিয়া কর দিয়ে নিরাপত্তার সাথে জীবন কাটাতো।

এক মুবারক কাফেলা, যাদের সফলতার সার্টিফিকেটের ঘোষণা এসেছে আল্লাহর কালাম কুরআনে , তাদের আদর্শকে আঁকড়ে ধরাই এই অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ, তারাই ছিলেন কুরআন সুন্নাহর প্রকৃত অনুসারী, তাদের কদমে কদম মিলিয়ে না চললে উম্মাত তার অতীতকে কখনো ফিরে পাবে না।

আল ওয়ালা আল বারাকে ছেড়ে দেওয়া

মুমিন হবে মুমিনের অন্তরঙ্গ বন্ধু, এই বন্ধুত্ব-ভালোবাসার কারণ ইমান। ইমানের ভিত্তিতে গড়ে উঠা এই সম্পর্ক-ই মদীনার আনসারদের পরস্পরের মাঝে ভালোবাসার সৃষ্টি করে, অথচ ইসলামপূর্ব যুগে আউস খাজরাজ বিরোধিতা ছিল মারাত্মকরূপে। উমাইয়া-হাশেমি দ্বন্দ ছিল মুহাজির সাহাবিদের পরস্পরের মাঝে, ইসলাম শত্রুতার অবসান ঘটিয়ে তাদের মাঝে পারস্পারিক মিল-মুহাব্বত সৃষ্টি করে। আল ওয়ালার বরকতেই সাহাবিদের এমন মোবারক জামাত তৈরি হয়েছিল..

وَاذۡكُرُوۡا نِعۡمَتَ اللّٰهِ عَلَيۡكُمۡ اِذۡ كُنۡتُمۡ اَعۡدَآءً فَاَلَّفَ بَيۡنَ قُلُوۡبِكُمۡ فَاَصۡبَحۡتُمۡ بِنِعۡمَتِهٖۤ اِخۡوَانًا‌ ۚ وَكُنۡتُمۡ عَلٰى شَفَا حُفۡرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنۡقَذَكُمۡ مِّنۡهَا‌ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَـكُمۡ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُوۡنَ

তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ কর; তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করলেন। ফলে তোমরা তাঁর অনুগ্রহে পরস্পর ভাই-ভাই হয়ে গেলে। তোমরা অগ্নিকুন্ডের (দোযখের) প্রান্তে ছিলে, অতঃপর তিনি (আল্লাহ) তা হতে তোমাদেরকে উদ্ধার করেছেন। এরূপে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শন স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন, যাতে তোমরা সৎপথ পেতে পার। (৩:১০৩)

বর্তমানে আমাদের সম্পর্কের ভিত্তি হলো দল-জাতি-বর্ণ-ভাষা কিংবা পার্থিব স্বার্থ। এসকাল বিষয়ের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা সম্পর্ক যদি ইমানের সাথে সাংঘর্ষিক

হয়, তবে ইমানকে প্রাধান্য দিতে হবে। কিন্তু উম্মাহর আচরণ এর বিপরীত হলেই অধ:পতন হবে।

বর্তমানে মুসলিম উম্মাহ কাফির-মুশরিকদের সাথে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে, অথচ এমন অন্তরঙ্গ সম্পর্কের ফলে তা মুমিনের ইমানের উপর প্রভাব ফেলতে পারে বলে ইসলাম এইরকম গভীর অন্তরঙ্গতাকে নিষেধ করেছে। তাদের আল্লাহদ্রোহীতার কারণে তাদের প্রতি শত্রুতা লালন করতে হবে, এটা ইমানের দাবি। এই শত্রুতা কাফিরের প্রতি কেবল তার কুফরের জন্য, আল্লাহকে অস্বীকার করার কারণেই।

لَا تَجِدُ قَوۡمًا یُّؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ وَالۡیَوۡمِ الۡاٰخِرِ یُوَآدُّوۡنَ مَنۡ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُوۡلَهٗ وَلَوۡ کَانُوۡۤا اٰبَآءَهُمۡ اَوۡ اَبۡنَآءَهُمۡ اَوۡ اِخۡوَانَهُمۡ
اَوۡ عَشِیۡرَتَهُمۡ ؕ اُولٰٓئِکَ کَتَبَ فِیۡ قُلُوۡبِهِمُ الۡاِیۡمَانَ

তুমি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায় পাবে না, যারা ভালবাসে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচারীদেরকে; হোক না এই বিরুদ্ধাচারীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা তাদের জাতি-গোত্র। তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন (৫৮:২২)

لَا یَتَّخِذِ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ الۡکٰفِرِیۡنَ اَوۡلِیَآءَ مِنۡ دُوۡنِ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ ۚ وَمَنۡ یَّفۡعَلۡ ذٰلِکَ فَلَیۡسَ مِنَ اللّٰهِ فِیۡ شَیۡءٍ

মু'মিনগণ যেন মু'মিনদেরকে ছাড়া কাফেরদেরকে অভিভাবক বা অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যে কেউ এরূপ করবে, তার সাথে আল্লাহর কোন সম্পর্ক থাকবে না। (৩:২৮)

তবে বিধর্মীদেরকে তাদের প্রাপ্য হক দিতে হবে। এই শত্রুতা তাদের প্রতি জুলুমে প্ররোচিত করে না, দাওয়াত দিতে বাধা দেয় না, তার হককে আদায় করতে বাধা দিবে না।

'ইসলাম উদার ধর্ম'- এমন সবক শুনিয়ে কাফির-মুশরিকরা তাদের উৎসবে মুসলিমকরকে-ও অংশগ্রহণ করার আহ্বান করে 'সার্বজনীন উৎসবের' নাম দিয়ে। দুঃখের বিষয়, মূর্তিপূজা-ক্রিসমাস সমস্ত প্রকার উৎসবে উদারতার' বুলির ধোঁকায় নিজের ইমানকে হারিয়ে ফেলছে উম্মাহ। দীর্ঘকাল খিলাফাহবিহীন অবস্থায় মুমিন-কাফেরের সহাবস্থানের ফলে শিরকের প্রতি সংবেদনশীলতা হারিয়ে ফেলেছে যেভাবে বনী ইসরায়েল লম্বাসময় কিবতীদের সাথে জীবন কাটানোর ফলে সামেরীর কথায় স্বর্ণনির্মিত গরুর পূজা শুরু করে হারুন আ. -এর নিষেধ সত্ত্বেও। উপমহাদেশে 'ধর্ম যার যার উৎসব সবার' -এইরকম মুখরোচক বুলির স্লোগানের তালে তালে মুসলিমরা শিরকের প্রতি ঘৃণা লালন করা ছেড়ে দিয়েছে। অথচ শিরকের গুনাহ হওয়ার যোগ্য নয়।

اِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ

নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যার জন্য ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন। (৪:১১৬)

সমস্ত নবী-রাসূল যে শিরকের বিরোধিতা করেছেন, কখনো শিরকের সাথে আপোষ করেননি। সেই শিরকের উৎসব-শিরকের প্রতীককে মুসলিমরা উম্মাহ কিন্তু ভালোবাসতে পারে না। কিন্তু উম্মাহ 'উদারতা'-র নামে ইমানকে বিকিয়ে দিচ্ছে। উদারতার সীমা আছে-এটা উম্মাহ ভুলে গেছে। উদারতা তো এই যে- মুমিনরা তার ধর্মপালনে বাধা দিবে না, তার সাথে ইনসাফ হবে, তার হক আদায় করা হবে। এসব করতে গিয়ে ইসলাম তার স্বকীয়তা ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যকে অটুট রাখবে। উদারতার সীমা অতিক্রম করে মুসলিমরা নিজের ভিতর শিরকের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ইমানকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। জাতীয়তাবাদের বা দলীয় সাম্প্রদায়িকতার আদলে জাতির বা দলের লোকের সাথে অন্তরঙ্গতা এবং অন্য জাতি বা দলের মুমিনদের প্রতি বিদ্বেষ-শত্রুতাই এখন উম্মাহর মাঝে প্রকট। ইখতিলাফকে ইফতিরাকে পরিণত করার জন্য আল ওয়ালাকে ছেড়ে দেওয়া দায়ী। ফলে, এগুলোর দ্বারা জাতীর ঐক্য বিনষ্ট হয়। ঐক্যকে ফিরিয়ে আনতে ওয়ালা-বারার মাপকাঠিতে মুমিনদের সম্পর্ক গড়বে। আল ওয়ালা তথা আল্লাহর জন্যই ভালোবাসার ঘাটতির কারণে কুফরি শক্তির বা যারা মুসলিমদের সাথে যুদ্ধে নিপ্ত, তাদের সাথে অন্তরঙ্গতার ভিত্তিতে চুক্তি-কে করা স্বাভাবিক হয়েগেছে। মুনাফিক শাসকগণ এখন ইমানদারের জান-মালের তোয়াক্কা করে না, তার রাষ্ট্রই বা ভৌগোলিক সীমানার ভিত্তিতে গড়ে উঠা জাতিই তার ভালোবাসার মাপকাঠি।

আল-ওয়ানা ওয়াল বারা’ যে একটি ইবাদত এবং তা ইমানের দাবি তা ভুলে গেছে উম্মাহ। ফলে উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ হতে পারছে না, ভুলতে পারছে না বিরোধ, পারছে না বিভেদকে মাটিচাপা দিতে। ফলে সংঘর্ষ এখন মুমিনদের পরস্পরের মধ্যে, আর কুফফারদের সাথে কেবল উদারতা। এই সুযোগে কুফরি শক্তি মুসলিম ভূমিগুলোকে বুদ্ধিবৃত্তিক ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যাচ্ছে। আল-ওয়ালা ওয়াল-বারাকে ভুলে গেলে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ﷺ প্রাধান্য না দিয়ে দুনিয়াবি সম্পর্ককে প্রাধান্য দিয়ে ইমান হারাবে, ঐক্য বিনষ্ট করবে আর কুফরি শক্তির উদ্দেশ্য পূরণ করে উম্মাহর অধঃপতন আর বিপর্যয় ডেকে আনবে।

মাহালের ঘাটতি

সোহবত ত্যাগ,আলেম- সাধারণ দূরত্ব বৃদ্ধি

সোহবত মানে সঙ্গ। সাহাবায়ে আজমাইন(রাদিয়াল্লাহু আনহুম) রসুল ﷺ এর সোহবতে থাকতেন, তাঁর ﷺ সাথে থেকে তাঁর ﷺ কাছ থেকে ইলম নিতেন, মুআমালা-মুআশারাত ইত্যাদি দ্বীনের সমস্ত কিছু শিখতেন। আবার সাহাবায়ে কিরামগণও(রাঃ) পরস্পর দেখা হলে বলতেন, 'চলো একটু ইমানের কথা বলি'। আল্লাহকে ভয়, দানশীলতা, শরীয়তের ইলম ইত্যাদি শুধু পড়ে লিখে আর কল্পনা করে পুরোপুরি আয়ত্ত করা যায় না। এর জন্য সোহবত প্রয়োজন, এমন কারো সোহবত যার ভিতর আল্লাহর ভয় ও মুহাব্বত আছে, আখেরাতের ফিকির আছে, দ্বীনের ফিকহ ও গভীর বুঝ-সমঝ আছে। যার ভিতরে হিকমাহ আছে।[৩৫]
কিতাবের ইলম পড়ে আমল করা যতটা সহজ, তার চেয়েও সহজসাধ্য বিষয় হলো সোহবতের মাধ্যমে আমল দেখে শিখা এবং এর প্রভাবও দিলে বেশি হয়। কিতাব পাঠানোর সাথে সাথে একজন নবী পাঠানোর দ্বারাই বুঝে আসে কিতাব দরকার,তার সাথে শিক্ষকও দরকার যার সোহবতের মাধ্যমে কিতাব অনুসারে জীবন চালানো শিখা সহজ হবে।

কিন্তু আজকাল নেককারদের সোহবতে থাকার বিষয়টি অবহেলিত। এ অবহেলার চূড়ান্ত ফলাফল এই যে আলেম-সাধারণ দূরত্ব অনেক বেশি, সম্পর্কটা খুবই দুর্বল। নামাজ, কখনো যাকাত নিয়ে টুকটাক মাসআলা জানতে চাওয়া ব্যতীত আলেমদের সাথে দ্বীনী কোনো সম্পর্ক নেই, নেই কুরআনকে গভীরভাবে বুঝার ও সে অনুযায়ী জীবনকে সাজানোর কোনো তাকাযা। যারা আহলে ইলম, নবীগণের ওয়ারিশ তাদের সোহবত কিংবা কোনো নেককারের সোহবত না পাওয়ার কারণে তাদের জীবনটা কাটে দুনিয়াদারদের সোহবতে, যার অনিবার্য ফলাফল দ্বীনকে প্রাধান্য না দিয়ে দুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়া। 'ইলম ও সোহবত' শিরোনামে ইমানের দাবি কিতাবে উল্লেখ আছে, 'ইহকালের উপর পরকালকে প্রাধান্য দেওয়ার হিম্মত অর্জনে আল্লাহওয়ালাদের সোহবত অতীব ফলপ্রসূ। ' [৩৬] আমাদের সিরাত্বল মুস্তাক্বীমের উপর চলতে গেলে যে পাথেয় দরকার তার একটি হলো দুনিয়ার উপর আখিরাতকে প্রাধান্য দেওয়া। আবু বকর রাদিআল্লাহ আনহু বলেন, "আখেরাতকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দাও, উহাকে মহব্বত করো। কেননা এই দুয়ের যে কোন একটির সহিত মহব্বতের দ্বারা অপরটির প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি হয়। "[৩৭] নেককারদের সোহবত না

থাকলে আখিরাতের মহাব্বত কম হয়ে যায়, মুসলিমরা জীবনের উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরে যায়।ফলে একসময় দ্বীন থেকে দূরে সরে যায় কেননা দুনিয়ার মহব্বত দিলে অধিক হয়ে যায় আর আখিরাতের প্রতি আকর্ষণ কমে যায়। আর এজন্য দুনিয়ার উপর আখিরাতের প্রাধান্য দেওয়া শিখতে নেককারদের সোহবত দরকার।

আবার মাদ্রাসাগুলো যে দ্বীনের মারকায, পৃথিবীর অনেক দেশে সেই মারকাযই হিসবাহ-দাওয়াতকে ছেড়ে দিয়েছে। উম্মাহর ইসলাহের ব্যাপারে গাফিলতি আঁকড়ে ধরেছে অধিকাংশ মাদ্রাসাকে। ফলে তারা কেবল ত্বলিবুল ইলমদের ইলম শিখিয়ে যাচ্ছে, এমনকি ত্বলিবুল ইলমদেরকেও ইসলাহ করার ব্যাপারে তারা কোনো পদক্ষেপ নেয় না বললেই চলে। এরই ধারাবাহিকতায় আহলে ইলমরা তাদের স্বকীয়তা হারাচ্ছে। তারাও সাধারণ থেকে দূরে সরে গিয়েছে। দ্বীনের জন্য নবীরা যেসব কুরবানি পেশ করে উম্মতের মাঝে কাজ করেছেন, নবীর ওয়ারিশদের বেশিরভাগই তা ছেড়ে দিয়েছে। প্রত্যেক নবী আলাইহিমুস সালাম উম্মতের দ্বারে দ্বারে গিয়ে দ্বীনকে প্রচার করেছে, উম্মতের মাঝে দ্বীনের হাকিকতকে তুলে ধরেছেন। আমাদের রসুল উম্মতের কাছে গিয়ে তাদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন। উম্মতের প্রতি কোমল স্বভাবের আচরণের দ্বারা তাদের দিলে জায়গা করে নিয়েছিলেন বলেই সাহাবিরা তার জন্য এতটা নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فَبِمَا رَحۡمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنۡتَ لَهُمۡ ۚ وَلَوۡ کُنۡتَ فَظًّا غَلِیۡظَ الۡقَلۡبِ لَانۡفَضُّوۡا مِنۡ حَوۡلِکَ ۪ فَاعۡفُ عَنۡهُمۡ وَاسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ وَشَاوِرۡهُمۡ فِی الۡاَمۡرِ ۚ

আল্লাহর দয়ায় তুমি তাদের প্রতি হয়েছিলে কোমল-হৃদয়; যদি তুমি রূঢ় ও কঠোর চিত্ত হতে, তাহলে তারা তোমার আশপাশ হতে সরে পড়ত। সুতরাং তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর।(৩:১৫৯)

এজন্য দ্বীনের বুঝবিহীন এই উম্মাহকে ফিরাতে আলেমদেরকেও নবী ﷺ এর আদর্শ অনুযায়ী মুহাব্বাতের সাথে দ্বীনের মধ্যে আনার চেষ্টা করতে হবে, অবশ্যই উম্মতের সাথে কোমলতার সাথে, এমনকি প্রয়োজনে মাশওয়ারায় তাদেরকে রাখাও কুরআনী নির্দেশনা। কিন্তু এখন আলেম-সাধারণের দূরত্ব দু'পক্ষ থেকেই বৃদ্ধি পেয়েছে, এতে প্রত্যেকেই জবাবদিহিতার সম্মুখীন হবে। ফাজায়েলে আমল কিতাবের ভূমিকায় এসেছে....

বর্তমান জামানায় দ্বীনের যে দূরাবস্থা এবং দ্বীনের উপর কাফেরদের ন্যায় মুছলমানের তরফ হইতে এমনভাবে আক্রমন চলিতেছে যে, সাধারণ মুছলমান তো দূরের কথা খাছ লোকেরা পর্যন্ত ফরজ, ওয়াজিব তরক করিতেছে। বরং লক্ষ লক্ষ লোক প্রকাশ্যভাবে কুফুরী ও শেরেকে লিপ্ত রহিয়াছে, আরও আশ্চর্যের বিষয় যে, তাহারা উহাকে শেরেক ও কুফুরী বলিয়া ধারণাই করে না। উপরন্তু ধর্মহীনতা যে ভাবে প্রসারতা লাভ করিতেছে এবং যাবতীয় অন্যায় অত্যাচার যে ভাবে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, সে সব আজ কাহারও অজানা নাই। এইসব কারণেই সর্বস্তরের ওলামায়ে কেরাম জনসমাজ হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছে। যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এই দাঁড়াইয়াছে যে, সাধারণ মানুষ ধর্মীয় শিক্ষা দীক্ষা হইতে ক্রমাগত বঞ্চিত হইয়া যাইতেছে। সাধারণ লোক নিরুপায় হইয়া বলে, আমাদিগকে বলিবার মত কেহ নাই। আর ওলামারা বলেন যে, আমাদের কথা শুনিবার মত কেহ নাই। কিন্তু আল্লাহর দরবারে সাধারণ লোকের এই সব ওজর আপত্তির কোনই মূল্য নাই। কারণ ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করা সকলেরই নিজস্ব কর্তব্য। অপরাধী আইন না জানার আপত্তি দর্শাইলে দুনিয়ার কোন সরকারই তা গ্রাহ্য করে না, কাজেই আল্লাহর দরবারে তা কেমন করিয়া গ্রাহ্য হইবে? এই ভাবে ওলামাদের আপত্তিও নিরর্থক। কারণ তাঁহারা যেসব মহাপুরুষদের নায়েব হইবার দাবী করেন, তাঁহারা দ্বীনের তাবলীগের নিমিত্ত কতই না ক্লেশ যাতনা ভোগ করিয়াছেন। তাঁহারা কি পাথরের আঘাত সহ্য করেন নাই? শত গালি ও কটুবাক্য শুনেন নাই? বিভিন্ন মছিবত বরদাস্ত করেন নাই? শত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়াও তাঁহারা উদারচিত্তে ইছলামের আহকাম মানুষের দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। [৩৮]

আলেমদের সোহবতে না থাকার কারণে ফরজ ইলমের ঘাটতি থাকে উম্মতের মাঝে, ফলশ্রুতিতে ফরজ তরক করছে কিংবা হারামে লিপ্ত হচ্ছে। আহলে ইলমদের সোহবতে না থাকায় দ্বীন-ইমানের শিক্ষা থেকে উম্মাহ দূরে থাকে । আত্মার পরিশুদ্ধির জন্যও দরকার নেককারদের সোহবত। আহলে ইলম ও নেককাররা তাদের জীবনে দ্বীনকে প্রাধান্য দিয়ে চলে এবং তাদের সোহবতে থেকে সাধারণ মুসলিমরাও দ্বীন-ইমানকে কি করে জীবনে প্রাধান্য দিয়ে চলতে হবে তা শিখবে। তদ্রূপ এর বিপরীত করলে এসকল বিষয় থেকে মাহরুম হবে। যেই দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার জন্য আল্লাহ তায়ালা এত এত নবী-রাসুলকে পাঠিয়েছেন সেই দ্বীনকে অবহেলা করা কি শ্রেষ্ঠতম উম্মতের বেলায় সাজে?

পরিবারে দ্বীনের পরিবেশ খুব কম মুসলমানদের ঘরেই আছে, বেশিরভাগেরই ঘরে ইমানের পরিবেশ নেই। এহেন দ্বীনী পরিবেশের অভাবের মধ্যে আহলে ইলম ও নেককারদের সোহবত পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্রে দ্বীনের পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে

বহুলাংশে কার্যকর। ঠিক তেমনি সোহবত ব্যতীত থাকতে থাকতে দ্বীনের পরিবেশ আরো হারিয়ে যাবে, এভাবে দ্বীনের পরিবেশ হারিয়ে পেললে মানুষ দ্বীনের ব্যাপারে আরো গাফেল হয়ে পড়বে। এই দ্বীন আল্লাহর মনোনীত দ্বীন, আল্লাহর দ্বীনকে অবহেলা করলে কিংবা দ্বীনের অনুসরণ ছেড়ে দিলে অধ:পতন হওয়াটাই স্বাভাবিক।

ইখতিলাফকে বড় করে দেখা

বর্তমান সময়ে মুসলিমরা একতাবদ্ধ হতে না পারার পিছনে বড় একটা কারণ ইখতিলাফকে বড় করে দেখা,যার ফলশ্রুতিতে মুসলিমদের মধ্যে বিভিন্ন মাযহাবভিত্তিক দল তৈরি হচ্ছে, মোদ্দাকথা তা ইফতিরাকে পরিণত হচ্ছে । তাদের এক জাতিতে পরিণত হওয়ার পথে মস্ত বড় এক বাধা। তাই ইখতিলাফকে বড় করে দেখা উম্মতের অধ:পতনের পরোক্ষ একটি কারণ। কেননা জামাআতবদ্ধ থাকা এই উম্মাহর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যটা হারাচ্ছে এই কারণে।

ইখতিলাফ দুই ধরণের, ইখতিলাফে মাহমুদ(দলিলভিত্তিক ইখতিলাফ) ও ইখতিলাফে মাদ্বমুম(দলিলের বিরুদ্ধে ইখতিলাফ)।[৩৯] সমাজে ইখতিলাফে মাদ্বমুমের কারণেই দলাদলি কিংবা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ হচ্ছে। কেননা প্রতিটি মাযহাবের অনুসারীরাই তাদের মতকে সঠিক মনে করে, বাকি মতগুলোকে ভুল প্রমাণে ব্যস্ত থাকে। অমুসলিমদের সাথে বাহাসের মাধ্যমে হককে বাতিলের উপর প্রতিষ্ঠিত করায় ব্যস্ত না থেকে বাহাসে লিপ্ত হয় ভিন্নমতের অনুসারী মুসলিম ভাইয়ের সাথে। সবাই ভিন্নমতের অনুসারী মুসলিম ভাইয়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে নারাজ। ফলে উম্মাহর মূল লক্ষ্য থেকে দূরে সরে গিয়ে নিজেরাই নিজেদের ঐক্য বিনষ্ট করে।

ইখতিলাফের বেশিরভাগ বিষয়ই সুন্নাহ নিয়ে এবং তা এক দলিল দিয়ে আরেক দলিলের বিরোধিতায়, সেগুলোকে বড় করে দেখতে গিয়ে ঐক্য রক্ষা করার ফরজ তরক করছে মুসলিম উম্মাহ। সুতরাং, এভাবে ক্রমাগত ফরজ তরক করাটা উম্মাহর জন্য দুর্গতি ব্যতীত আর কি বয়ে আনতে পারে! এমনকি কিছু আলেমরাও এক্ষেত্রে সাবধান নন। ইখতিলাফ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ইমাম শফি রহ. বলেন, *আজকাল অনেক আলেমকেও এ ব্যাপারে গাফেল দেখা যায়। তাঁরা বিরুদ্ধ মতবাদ পোষণকারীদের গালি-গালাজ করতেও কুণ্ঠিত হন না। এর ফলে মুসলমানদের মধ্যে যত্রতত্র দ্বন্দ্ব-কলহ, বিচ্ছিন্নতা ও মতানৈক্য দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।*

[৪০] এমনকি যেসকল মুসলিম দ্বীনের ব্যাপারে কম জানেন তারা দ্বীনের ব্যাপারে আরো বেশি অনাগ্রহী হয়ে পড়েন। এতে হিতে বিপরীত হয় তা সহজে উপলব্ধিতে আসে।

“হযরত ﷺ অত্যন্ত জোর সহকারে উম্মতকে বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব কলহ ও যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হতে নিষেধ করেছেন। তিনি প্রতি ক্ষেত্রে হুঁশিয়ার করেছেন যে, দুনিয়াতে যদি তোমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি নেমে আসে, তবে তা পারস্পরিক যুদ্ধ -বিগ্রহের মাধ্যমেই আসবে। সুরা হুদের এক আয়াতে এ বিষয় বস্তুটি আরও স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ

‘ و لا يزالون مختلفين الا من رحم ربك অর্থ্যাৎ, তারা সর্বদা পরস্পরে মতবিরোধ করতেই থাকবে, তবে যাদের প্রতি আল্লাহর রহমত রয়েছে, তারা এর ব্যতিক্রম।’ এতে বুঝা গেল যারা পরস্পরে (শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়া) মতবিরোধ করে, তারা আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত কিংবা দূরবর্তী।” [৪১]

২০০৩ সালে প্রকাশিত RAND Corporation এর Civil Democratic Islam: Partners, Resources and Strategies নামক শীর্ষক গবেষণাপত্রে এসেছে তারা ইসলামের সাথে স্নায়ুযুদ্ধে তাদের সংজ্ঞায়িত ট্রেডিশনালিস্ট মুসলিমদের সাথে কি আচরণ করবে সেই প্রসঙ্গে মাযহাবের সাথে সংঘর্ষকে একটি উপায় হিসেবে উল্লেখ করা হয়....

xii Civil Democratic Islam: Partners, Resources, and Strategies

– Discriminate between different sectors of traditionalism. Encourage those with a greater affinity to modernism, such as the Hanafi law school, versus others. Encourage them to issue religious opinions and [illegible] inspired religious rulings. This relates to funding: Wahhabi money goes to the support of the conservative Hanbali school. It also relates to knowledge: More-backward parts of the Muslim world are not aware of advances in the application and interpretation of Islamic law.

ঐতিহ্যবাদ বা ট্রেডিশনালিজম এর বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্য করা। যারা মডার্নিজমের প্রতি আকৃষ্ট তাদেরকে উৎসাহিত করা, যেমন হানাফি ফিকহ বনাম অন্যান্য।[৪২]

অর্থ্যাৎ যারা ইসলামকে কেবল ব্যক্তিজীবনে আচরিত ধর্ম হিসেবে দেখে(Traditionalist Muslim) তাদের মধ্যে ইখতিলাফকে উৎসাহিত করা। উল্লেখ্য মডার্নিজম কুফফারদের সংজ্ঞায়িত মুসলিমদের শ্রেণিকরণের একটি ভাগ যারা শরীয়াহ আইনে সংস্কারের প্রতি আগ্রহী । চিন্তা করুন, কুফফারদের কত সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ! ইসলামকে ধ্বংস করতে কতটা মরিয়া হয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। আর মুসলিম উম্মাহ-ও সেই ফাঁদে পা দিয়ে কুফফারদের চক্রান্তের শিকার হয়ে নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ঐক্যকে বিনষ্ট করছে, অথচ কালিমার ভিত্তিতে সৃষ্ট ঐক্যই আমাদের বিজয় এনে দেবে। তাই সেই পথকে রুদ্ধ করতে ক্রুসেডারদের এত প্রচেষ্টা।

তাই ইখতিলাফে মাহমুম থেকে দূরে থাকা জরুরি, এই ইখতিলাফকে ভিত্তি করে নিজেরা আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং কুফরি শক্তির চক্রান্তকে সফল হতে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

খণ্ডিত দ্বীনচর্চা

দ্বীন ইসলাম পূর্ণাঙ্গ, অপূর্ণতার লেশমাত্র ইসলামে নেই। ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর থেকে ঘুমানোসহ জাগতিক সকল কাজের নির্দেশনা ইসলামে আছে। পরিবার থেকে শুরু করে যুদ্ধের ময়দান, ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে রাজনৈতিক পর্যায়, ইবাদত থেকে অর্থনীতি, সামাজিক রীতিনীতি থেকে একটি স্বতন্ত্র সংস্কৃতি- প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের বিধিবিধান সুস্পষ্ট এবং তা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। সাহাবিরা (রা) এবং তাদের প্রকৃত অনুসারীরাই দ্বীনকে এভাবে বুঝেছিলেন, প্রকৃত দ্বীনের অনুসরণ করে উম্মাহর জন্য আদর্শ রেখে গেছেন।
কিন্তু উম্মাহর মাঝে খন্ডিত দ্বীনচর্চাই এখন মুখ্য হয়ে উঠেছে। সম্পূর্ণ দ্বীন পালনে বাধা দেয় তার কুপ্রবৃত্তি, ভীরুতা এবং ইলমের স্বল্পতা।

সাহাবায়ে আজমাইনের দ্বীন পালন আর বর্তমান উম্মাহর দ্বীন পালনে রয়েছে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। দ্বীন ছিল তাদের প্রতিটি নিঃশ্বাসের সঙ্গী আর বর্তমান মুসলিমরা একে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে, এমনকি ব্যক্তিজীবনেও পরিপূর্ণ দ্বীনের অনুসরণে-ও আছে ঘাটতি। কুফফারদের ফাঁদে পা দিয়ে ব্যক্তিজীবনে পালনীয় দ্বীনি বিষয়কেও সংস্কার করে কিংবা মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে তার প্রকৃত অনুসরণ করা ছেড়ে দিচ্ছে।
কেননা অন্তরে ইমানের প্রভাব কমে গেলে দ্বীনের উপর চলা কঠিন হয়ে পড়ে, হৃদয় থেকে দূর হয় আমল করার স্পৃহা। বান্দা তখন তার মূল লক্ষ্য থেকে

বিচ্যুত হয়ে অপ্রয়োজনীয় বিষয় লিপ্ত হয়ে পড়ে। দুই অবস্থার বাইরে একজন বান্দাকে কল্পনা করা অসম্ভব, হয় তার ইমান তাকে আল্লাহর রাস্তায় সামনে চালিয়ে দৃঢ়তার সাথে দ্বীন পালন করাবে। নয়তো নফস ও শয়তানের ধোঁকা আল্লাহর থেকে দূরে সরাবে – এ দুয়ের মাঝামাঝি কিছুর অস্তিত্ব নেই। আর বর্তমান উম্মাহ দ্বিতীয় অবস্থাকেই বাছাই করেছে আর আমাদের সাহাবারা বাছাই করেছিলেন প্রথমটিকে। ফলে বর্তমান উম্মাহ ধীরে ধীরে দ্বীন থেকে নিজের জীবনকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলছে।

দ্বীন ইসলামে প্রবেশ করে একজন মানুষ কতিপয় বিষয়কে বিশ্বাস করার দ্বারা, সেসকল বিষয়কে একত্রে আকিদা বলা হয়। আকিদার প্রতিফলনই হবে মুসলিমের কথা ও কাজে। *‘আকীদাকে হৃদয়ে এমনভাবে প্রোথিত করে নিতে হয় যাতে কথা ও কাজে এর স্পষ্ট প্রতিফলন দেখা যায়। এই ব্যাপারে কুরআন এতই গুরুত্ব দিয়েছে যে, ঈমান ও নেক আমলের কথা বারবার একসাথে উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকেই বোঝা যায় যে, আমলকে আকীদার সঙ্গী বানিয়ে নিতে হবে। কারণ অন্তরের আকীদার প্রমাণ হলো বাহ্যিক কাজকর্ম।’* [৪৩]

কিন্তু বর্তমান মুসলিম সমাজে আকিদার প্রতিফলন অস্পষ্ট আর অপূর্ণ ফলাফল দ্বীনের সামগ্রিকতার ধারণা নিজেদের হৃদয় থেকে ঝেটিয়ে বিদায় করা আর এটাই কুফফারদের বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেডের সাফল্য আর উম্মাহর ব্যর্থতার সাক্ষ্য। বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধের অস্ত্র- সেক্যুলারিজম, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, পুঁজিবাদ ও নারীবাদ। এই অস্ত্রগুলোকে ব্যবহার করে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে নীরবে মুসলিমদেরকে ইসলামবিরোধী মতবাদকে মন-মগজে প্রবেশ করিয়ে দেয়। *মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের একটা সুপ্রসিদ্ধ কৌশল হলো আপনার শত্রু আপনাকে বোঝাবে যে, সে আপনার শত্রু নয় বরং বন্ধু। যেন আপনাকে ব্যবহার করে আপনার বন্ধু অর্থাৎ তার আসল শত্রুকে দমন করতে পারে। এই ফাঁদে পা দেওয়ার অর্থই হলো নিজেদেরকে রক্ষা করার শেষ সুযোগটুকুও হারানো।*[৪৪] এই কৌশলকে কাজে লাগিয়ে শব্দের ব্যবহার দ্বারা ধোকাবাজি করে আমাদের শত্রুরা সহজেই আমাদের পরাজিত করেছে। 'উদারপন্থা ও স্বাধীনতার বুলি'-এইরকম চটকদার শব্দের মারপ্যাঁচে ফেলে মুসলিম তরুণসমাজকে ইসলামি শালীনতা ও ভাবগাম্ভীর্য থেকে বের করার অপচেষ্টায় লিপ্ত কুফফার শক্তি। গণমাধ্যম ও শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে সহজেই তা মুসলিমদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। একদল মুসলিমকে বসিয়েই এইসকল বিষয়ের সমর্থনে লেখনীর দ্বারা তা মুসলিমদের মাঝে প্রতিষ্ঠা করার মাঠমে কুফফারদের এজেন্ডা বাস্তবায়নে সহায়তা করছে। তার উল্লেখ আছে RAND Corporation এর Building Moderate Muslim Network নামক শীর্ষক গবেষণাপত্রে।

২০০৭ সালে আমেরিকার RAND Corporation এর Building Moderate Muslim Network নামক শীর্ষক গবেষণাপত্রের শুরুতেই উল্লেখ করা.....
মুসলিম বিশ্বের বেশিরভাগ অংশ জুড়ে চলমান সংগ্রাম মূলত একটি ধারণার যুদ্ধ।........।স্নায়ুযুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রচেষ্টার সাথে সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতার সাথে, মুক্ত ও গণতান্ত্রিক ধারণার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ মানুষের নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে, মধ্যপন্থীদের জন্য খেলার ক্ষেত্র সমতল করার ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই পর্যায়ে যা প্রয়োজন তা হল স্নায়ুযুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেওয়া, আজকের মুসলিম বিশ্বের পরিস্থিতিতে তাদের প্রযোজ্যতা নির্ধারণ করা এবং মধ্যপন্থী ও উদারপন্থী মুসলিম নেটওয়ার্ক নির্মাণের জন্য একটি “রোড ম্যাপ” তৈরি করা –যা এই গবেষণাটি করার প্রস্তাব করে। [৪৫]

6/217

The struggle underway throughout much of the Muslim world is essentially a war of ideas. Its outcome will determine the future direction of the Muslim world and whether the threat of jihadist terrorism continues, with some Muslim societies falling back even further into patterns of intolerance and violence. It profoundly affects the security of the West. While radical Islamists are a minority almost everywhere, in many areas they hold the advantage. To a large extent, this is because they have developed extensive networks spanning the Muslim world and sometimes reaching beyond it, to Muslim communities in North America and Europe. Moderate and liberal Muslims, although a majority in most Muslim countries and communities, have not created similar networks. Moderate Muslim networks and institutions would provide a platform to amplify the message of moderate as well as some measure of protection from violence and intimidation.

Moderates, however, do not have the resources to create these networks themselves; they may require an external catalyst. With considerable experience dating back to the U.S. efforts during the Cold War to foster networks of people committed to free and democratic ideas, the United States has a critical role to play in leveling the playing field for moderates. What is needed at this stage is to derive lessons from the experience of the Cold War, determine their applicability to the conditions of the Muslim world today, and develop a “road map” for the construction of moderate and liberal Muslim networks—what this study proposes to do.

গবেষণাপত্রে তাদের লক্ষ্য অর্জনে কাদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত সে হিসেবে উল্লেখ করা হয়... উদার ও ধর্মনিরপেক্ষ মুসলিম শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবী,, তরুণ মধ্যপন্থী(মডারেট) ধর্মীয় পণ্ডিতদের, লিঙ্গ সমতা প্রচারণায় নিয়োজিত নারী গোষ্ঠী এবং মধ্যপন্থী(মডারেট) সাংবাদিক ও লেখকদের। উল্লেখ্য এই মডারেটদের

প্রোমোট করেই ইসলামের প্রকৃতরূপকে বিকৃতরূপে উপস্থাপন করে দ্বীনের সামগ্রিকরূপকে কাটছাঁট করে মুসলিমদের সামনে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

উপরের বক্তব্য থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, ইমানের উপর কুফফারদের এই আগ্রাসনের এর কারণেই নেতৃত্বের আসন থেকে মুসলিমদেরকে সরানো সম্ভব হয়েছে। স্নায়ুযুদ্ধের সফলতার পিছনে Secularism এর প্রচারে উঠেপড়ে লাগে কাফেররা। ইসলামকে সরিয়ে নতুন একটি সাংস্কৃতিক ও আদশিক ভিত্তি স্থাপন করে কাফেররা আর এটিই সেক্যুলারিজম। রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে এভাকে ইসলামকে সরিয়ে দিয়ে মুসলিমদের জীবনে সেক্যুলারিজমকে সকল পর্যায়ে ছড়িয়ে দিয়েছে মিডিয়ার সহায়তায়। লিবারেলিজম আর সোশ্যালিজমের ভয়ানক থাবায় মুসলিমরা আজ তাগুতি শাসনব্যবস্থার অধীনে জীবন কাটাচ্ছে এবং এই ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখে ইসলামের বিপরীত মতাদর্শগুলোকে অতি সন্তর্পণে খুবই সুক্ষ্মভাবে মুসলিমদের মগজে অনুপ্রবেশ করানো হচ্ছে। ফলাফল– অনেক মুসলিমের মাঝে এই ভ্রান্ত আকিদা গেড়ে বসেছে এবং মসজিদের মিম্বর পর্যন্তই ইসলামের সীমিত করে ফেলেছে।

কুফরি শক্তির...*বুদ্ধিবৃত্তিক বিভাগের কাজ হলো ইসলামের অনুসারীদের মনে সন্দেহ-সংশয় ও হীনমন্যতা তৈরি করা, ইসলামের অর্থ বিকৃত করে দেওয়া।* তারা তাদের কাজে অনেকাংশেই সফল।..... তারা দেখল যে, ইসলাম যতদিন তার পূর্ণাঙ্গ ও সর্বব্যাপী রূপ নিয়ে মুসলিমদের মনে প্রোথিত থাকবে, ততদিন পর্যন্ত এর অনুসারীরা হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাবে। ইতিহাসে এমনটা অনেকবার ঘটেছে এবং শত্রুরা এগুলো দেখে শিক্ষা নিয়েছে। ....তাই সামগ্রিকভাবে মুসলিমদের মন থেকে যদি ইসলামের সঠিক ধারণা দূর করা যায়, তা হলে এই খিলাফাতের আবার মাথা তুলে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা নিঃশেষ হয়ে যাবে। ঠিক এ কারণেই মুসলিম বিশ্বে সেক্যুলারিজমকে এত জোরেশোরে একটি নতুন ধর্মের মতো প্রচার করা হয়েছে। উদ্দেশ্য ছিল এটি যেন ইসলামকে সরিয়ে নতুন একটি সাংস্কৃতিক ও আদর্শিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।......এই নতুন ধর্মের মত হলো, <u>ইসলামকে শুধু মসজিদে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে, শুধুমাত্র আচার-অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে আর ধর্মীয় পালা-পার্বণগুলো পালন করা যাবে। ইসলামকে নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের আসনগুলোর কাছেও ভিড়তে দেওয়া হবে না।</u>[৪৬] এভাবেই তারা বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে এবং এটাকে স্থায়ী করতেও তারা মুসলিমদের মনে ইসলামের খন্ডিত ও সংস্কারকৃত রূপকে প্রোথিত করতে পূর্ণমাত্রায় সচেতন এবং সফলও বটে।

RAND কর্পোরেশান Civil democratic Islam নামক প্রতিবেদনে <u>মুসলিমদের দ্বীন পালন করার মাত্রা ও ইমানের অবস্থানের ভিত্তিতে</u> মুসলিমদের ৪ ভাগে ভাগ করা

হয় এবং তাদের প্রণীত ইসলামের খন্ডিত ও পরিমার্জিত রূপের নাম দেয় Civil democratic Islam বা Moderale Islam যা বিদ্যমান কুফরিব্যবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে চলতে পারবে। বলা যেতে পারে, মডারেট ইসলাম হলো ইসলামের কুফরি ভার্সন। তারা কুফরি বিশ্বব্যবস্থার গোলামিকে অনায়াসে মেনে নিবে এবং ইসলামের সার্বভৌম রাষ্ট্রব্যবস্থাকে অস্বীকার করবে, ভেঙ্গে দিবে আল ওয়ালা আলবারার মাপকাঠিকে। ফান্ডামেন্টালিস্ট, ট্রেডিশনালিস্ট, মডার্নিস্ট ও সেক্যুলার মুসলিম- এই চারভাগে ভাগ করে এই জন্য যে কার সাথে কেমন আচরণ করলে ইসলামের খণ্ডিত ও বিকৃত রূপটিকে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে।এদের মাঝে প্রকৃত দ্বীনের ধারণাকে সমুন্নত রেখে চলছে ফান্ডামেন্টালিস্টেরা এবং এদের বিরুদ্ধে কুফফাররা War on terror এর নামে সরাসরি ক্রুসেডে লিপ্ত। এরা দ্বীনকে সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠা করতে মরিয়া। ট্রেডিশনালিস্টরা ব্যক্তিগত জীবনে আচরিত ধর্ম হিসেবে ইসলামকে দেখে এবং এদেরকে ফান্ডামেন্টালিস্টদের সাথে মিলতে দিলে কাফেরদের জন্য হুমকি হবে বিধায় এদের সাথে fundamentalist দের কোন্দলকে জিইয়ে রাখতে সোচ্চার কুফফাররা।

Modernist-রা হলো ওই সকল মুসলিম যারা কুফফার-নিয়ন্ত্রিত আধুনিক বিশ্ব-ব্যবস্থাকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে নেয়। আল্লাহর নাজিলকৃত বিশুদ্ধ ইসলামকে তারা আধুনিক যুগের জন্য পুরোপুরি উপযোগী মনে করে না। তাই ইসলামকে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও ছাঁটাই করে করে তারা পাশ্চাত্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে চায়। ইসলামের যেসব আকিদা ও হুকুম গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে খাপ খায় না সেগুলোকে তারা ইসলাম থেকে ছেঁটে বাদ দিয়ে দেয় কিংবা এর নতুন কোনো ব্যাখ্যা প্রদান করে পাশ্চাত্য মূল্যবোধের উপযোগী করে নেয়। পাশ্চাত্য জগৎ যেহেতু জিহাদকে সন্ত্রাস বলে, তাই তারা জিহাদের নতুন ব্যাখ্যা বের করে বলে, জিহাদ মানে হলো চেষ্টা-প্রচেষ্টা, কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে এমনটি জরুরি নয়। খিলাফতকে তারা অপ্রয়োজনীয় মনে করে। জাতিসংঘ নামের কুফফারসংঘের অধীনেই তারা ইসলামি কল্যাণরাষ্ট্র গঠন করার কথা বলে। র‍্যান্ডের পলিসি সাজেশন হলো, মডারেটরা হলো মুসলিম-বিশ্বে আমেরিকার মিত্র।[৪৭] কেননা, তাদেরকে দিয়েই ইসলামের সামগ্রিকতাকে ঢেকে রাখা সম্ভব হবে। উদাহরণ স্বরূপ মডারেট মুসলিমদের হিজাব সর্ম্পকে ধারণাকে উল্লেখ করা যেতে পারে,

"Islam does not require women to wear any sort of veil or head cov-ering. There is no tex-tual substantiation for such rules. It is up to the individual to decide what to wear. Women should not be held re-sponsible for men's possible licentious thoughts, since the Quran clearly instructs men to "lower their gaze," i.e., not to stare salaciously at women, and vice versa.[৪৮]

অর্থ্যাৎ ইসলাম নারীদের কোন ধরণের বোরকা বা মাথা ঢাকা পোশাক পরতে বাধ্য করে না। এই ধরণের নিয়মের কোন পাঠ্যপ্রমাণ নেই। কী পরবেন তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার ব্যক্তির উপর নির্ভর করে। পুরুষদের সম্ভাব্য অশ্লীল চিন্তাভাবনার জন্য নারীদের দায়ী করা উচিত নয়, কারণ কুরআন স্পষ্টভাবে পুরুষদের "তাদের দৃষ্টি নত রাখার" নির্দেশ দেয়, অর্থাৎ, নারীদের দিকে লোভনীয় দৃষ্টিতে না তাকানোর জন্য, এবং বিপরীতভাবেও।"

এভাবে পর্দার হুকুমকে বিকৃত করা হচ্ছে। জিহাদকে কেবল নফসের জিহাদ হিসেবে অভিহিত করে তারা। তাদের ধারণা, "Jihad is a symbolic term referring to personal spiritual development." অর্থ্যাৎ জিহাদ একটি প্রতীকী শব্দ যা ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক বিকাশকে নির্দেশ করে।[৪৯] এ কারণে কাফেররা তাদেরকে সার্বিকভাবে সাহায্য করা এবং তাদের জন্য প্রয়োজনীয় ফান্ডের ব্যবস্থা করা এবং মিডিয়ায় তাদেরকে বিশেষভাবে প্রোমোট করার ব্যবস্থা নিয়েছে। এভাবে কুফফারনিয়ন্ত্রিত তাগুতি ব্যবস্থার গোলামিতে লেগে পড়ে বহু মুসলিম, এক আল্লাহর দাসত্ব ছেড়ে দেয় অজান্তেই, ইমানী অধ:পতনের অতলতলায় পতিত হয়।

Secularist মুসলিম, এরা মূলত মুসলিমই নয়। তারা ইসলামকে কেবল ব্যক্তিগত জীবনে পালনীয় মনে করে। রাজনীতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রব্যবস্থা ইত্যাদিকে এরা ইসলামের আওতার বাইরে মনে করে। এরা মনে করে সকল ধর্মই সঠিক। জন্মসূত্রে মুসলমান হলেও এরা পরিপূর্ণভাবে কুফুরি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকেই হৃদয়ে লালন করে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতাকেই মনেপ্রাণে গ্রহণ করে নেয়।[৫০]
সেক্যুলারিস্টদের কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় সেক্ষেত্রে গবেষণাপত্রে উল্লেখ করা হয়,

- **Selectively support secularists:**
  - — Encourage recognition of fundamentalism as a shared enemy, discourage secularist alliance with anti-U.S. forces on such grounds as nationalism and leftist ideology.
  - — Support the idea that religion and the state can be separate in Islam too and that this does not endanger the faith but, in fact, may strengthen it.

"ইসলামের দৃষ্টিতেও ধর্ম ও রাষ্ট্র আলাদা হতে পারে। এতে ইমানের কোনো ক্ষতি হয় না। বরং এটি ইমানকে শক্তিশালী করে–এইমতবাদকে জোরেশোরে সমর্থন করতে হবে।"[৫১] এই মুসলিমরা নামমাত্রই মুসলিম হিসেবে সমাজে থাকে যারা আসলেই বিশ্বাসগত ভাবে কাফেরের অনুরূপ। এরা দ্বীনের খন্ডিতচর্চা করতে করতে ইমানকে বিক্রি করে দেয়। অর্থ্যাৎ গবেষণাপত্রে সংজ্ঞায়িত Modernist আর

Secular Muslim–রা আসলে ইমানী অধ:পতনের শিকার। এদেরকে বুঝিয়ে ইসলামে ফেরানোর চেষ্টা করতে হবে।

আবার ট্রেডিশনালিস্টদের মধ্যে ইখতিলাফি দ্বন্দ্বকে প্রকট করা–ও তাদের কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছার উপায় হিসেবে উল্লেখ করা হয় সেই প্রতিবেদনটিতে। তাছাড়া জিহাদকে উগ্রবাদ বলে অভিহিত করে ট্রেডিশনালিস্টদেরকে ফান্ডামেন্টালিস্টদের মধ্যে বিরোধকে জীবন্ত রেখে trradiationalist–দের পুরোপুরি দ্বীন পালন থেকে দূরে রাখার পরামর্শ ব্যক্ত করা হয় গবেষণাপত্রটিতে এবং এ কারণেই মুসলিম সমাজে জিহাদের ধারণাকে বিকৃত হয়ে গেছে, যে জিহাদ ইসলামকে আল্লাহর জমিনে প্রতিষ্ঠিত করার হাতিয়ার। এর হাকিকতকে ভুলভাবে উপস্থাপন করার ফলে মুসলিমসমাজে জিহাদকে উগ্রবাদ সাব্যস্ত করা হয় যেমনটা কুফফাররা অভিহিত করে। আর যারা ইসলামের সংস্কার চায় তথাকথিত Modernist –রা জিহাদকে নফসের জিহাদের মধ্যে সীমিত করে ফেলে।

এভাবে ইসলামের প্রতিটি শব্দের ধারণাকে বদলে দিয়ে দ্বীনের কাটছাঁট রূপকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করছে স্বয়ং কুফফার শক্তি মধ্যপন্থী ইসলাম বা মডারেট ইসলাম নামে। কারণ বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেডের লক্ষ্য মুসলিমদের হৃদয় থেকে ইসলামকে বিদায় করা। এজন্য অন্তরে লালিত আদর্শ আর ইয়াক্বীনকে পরিবর্তন করে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। ফলে দ্বীন ইসলাম পূর্ণরূপে পালন করা হয়ে উঠে না, কিছু ক্ষেত্রে দ্বীন ইসলামের হুকুম, কিছু ক্ষেত্রে কুফফারদের চাপিয়ে দেওয়া ধর্মকে অনুসরণ করে।

তাছাড়া, নারীবাদের মাধ্যমে উম্মতের নারীদেরকে পথভ্রষ্ট করা হচ্ছে, সুতরাং তারা তাদের সন্তানকে সঠিক দ্বীনের বুঝ দিয়ে বড় করতে সক্ষম হয় না। এভাবে পরবর্তী প্রজন্মেও দ্বীনের খণ্ডিতরূপকে টিকিয়ে রাখতে তৎপর তারা। তার সাথে সাথে নারীবাদ পরিবারব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিতে যথেষ্ট শক্তিশালী অস্ত্র, এর মাধ্যমে উম্মতের শেষ দুর্গ পরিবারেও আঘাত হানতে সক্ষম হয় কুফফাররা।

ইসলাম একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত, যার পূর্ণাঙ্গতা সুস্পষ্ট। ইসলামকে আংশিক বানানোর ফলাফল তো এই যে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়জগতে বরবাদ হবে। পশ্চিমাদের এহেন হীন চক্রান্তের শিকার হয়ে পরিপূর্ণ দ্বীন পালন থেকে বিরত থাকা উম্মাহর পতনের জন্য দায়ী এবং তা বৃহত্তর কারণসমূহের একটি।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَاَنِ احۡكُمۡ بَيۡنَهُمۡ بِمَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعۡ اَهۡوَآءَهُمۡ وَاحۡذَرۡهُمۡ اَنۡ يَّفۡتِنُوۡكَ عَنۡۢ بَعۡضِ مَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ اِلَيۡكَ

এবং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তুমি তদনুযায়ী তাদের মধ্যে বিচার-নিষ্পত্তি কর এবং তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। আর এ সম্বন্ধে সতর্ক থাক, যাতে আল্লাহ যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন, ওরা তার কিছু থেকে তোমাকে বিচ্যুত করতে না পারে। (৫:৪৯)

অন্যত্র এসেছে

بِبَعۡضِ الۡكِتٰبِ وَتَكۡفُرُوۡنَ بِبَعۡضٍ‌ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنۡ يَّفۡعَلُ ذٰلِكَ مِنۡكُمۡ اِلَّا خِزۡىٌ فِى الۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا ‌ۚ وَيَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ يُرَدُّوۡنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الۡعَذَابِ‌ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعۡمَلُوۡنَ

তবে কি তোমরা ধর্মগ্রন্থের কিছু অংশে বিশ্বাস আর কিছু অংশকে অবিশ্বাস কর? অতএব তোমাদের যেসব লোক এমন কাজ করে, তাদের প্রতিফল পার্থিক জীবনে লাঞ্ছনাভোগ ছাড়া আর কি হতে পারে? আর কিয়ামতের (শেষ বিচারের) দিন কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে। তারা যা করে সে সম্বন্ধে আল্লাহ অনবহিত নন। (২:৮৫)

প্রকৃতপক্ষে যে দ্বীন আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য.....

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ تف

অর্থাৎ আল্লাহর কাছে দ্বীন একমাত্র ইসলামই। (৩:১৯)

আর আল্লাহ কবুল করবেন না ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দ্বীনের অনুসরণকারীর দ্বীনকে। ইসলামের কাটছাঁট রূপ প্রকৃত দ্বীন নয়, বরং কুফফারদের সন্তুষ্ট করে এমন দ্বীনের অনুসরণ করলে ক্ষতি দুনিয়াতেও, এবং আখিরাতে তো অবশ্যই।

وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দ্বীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো কবুল করা হবে না, এবং সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। (৩:৮৫)

তাওহীদের ভিতকে নড়বড়ে করে দিতেই কুফফাররা তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেড চলমান রেখেছে এবং তাতে সফলও হয়েছে। এই খণ্ডিত দ্বীনচর্চার অবসান ঘটিয়ে প্রকৃত ইসলামকে মুসলিমদের মনে প্রোথিত কারণেই পুরোপুরি সাফল্যের পথ উন্মুক্ত হবে। আধুনিক বিশ্বের মোকাবেলায় মুসলিম উম্মাহ অধঃপতন ঠেকাতে পূর্ণ ইসলামকে চর্চা ও অন্তরে লালন করা ব্যতিত অন্য কোনো উপায় নেই।

এসকল মন্দ ধারণায় মুসলিমসমাজ পর্যবসিত হওয়ার কারণ সঠিকরূপে হক আদায় করে ইখলাসের সাথে হিসবাহ ও দাওয়াহ যথাযথভাবে করা হচ্ছেনা, ফরজে কিফায়া পূরণে যত সংখ্যক মুসলিমকে তা আদায় করা দরকার সেই পরিমাণে মুসলিমরা দাওয়াহ হিসবাহ করছে না। এ কারণে-ও সকল ভ্রান্ত মতবাদ মুসলিমদের শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়েছে যা তার সমগ্র দেহে বিস্তৃত হয়ে যায়, দ্বীনের খণ্ডিতরূপকে পরিপূর্ণ দ্বীন মনে করতে থাকে। ফলে দূরে সরে যায় সাহাবিদের আদর্শের অনুসরণ করা থেকে। এমনকি নিজের ধ্যান-ধারণাকে আল্লাহর কিতাব, নবী ﷺ -এর সুন্নাহ ও সালাফগণের বুঝের চেয়ে শ্রেষ্ঠজ্ঞান করে, ইসলামকে মধ্যযুগীয় বলে আল্লাহর বিধানে আপত্তি তুলে এবং সংস্কারের দাবি জানায়। এই খন্ডিত দ্বীনচর্চাই উম্মাহকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এনে দাঁড় করিয়েছে।

হিসবাহ ছেড়ে দেওয়া

হিসবাহ হলো সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ। সুরা তাওবাতে মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে,

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ أُو۟لَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু, তারা ভাল কাজের আদেশ দেয় আর অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে, আর তারা সালাত কায়িম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এদেরকে আল্লাহ শীঘ্রই দয়া করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৯:৭১)

এ কাজে অবহেলাকারীদের প্রতি তিরস্কার ও শাস্তির হুমকি এসেছে..

لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُۥدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا۟ وَّكَانُوا۟ يَعْتَدُونَ

كَانُوا۟ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا۟ يَفْعَلُون

বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদেরকে দাঊদ ও মারইয়াম পুত্র ঈসার মুখে লা'নত করা হয়েছে। তা এ কারণে যে, তারা অবাধ্য হয়েছে এবং তারা সীমালঙ্ঘন করত।তারা পরস্পরকে মন্দ থেকে নিষেধ করত না, যা তারা করত। তারা যা করত, তা কতইনা মন্দ! (৫:৭৮-৭৯)

নবীজি ﷺ বলেছেন আর সামর্থ্য থাকা সত্বেও কেউ এ অবস্থার পরিবর্তন না করে, তাহলে আল্লাহ তাদের প্রতি ধ্বংসাত্মক আযাব পাঠাবেন"[৫২]

ইমাম নববী রহ. বলেন, "হিসবাহ হলো সকল কাজের মধ্যমণির মতোই গুরুত্বপূর্ণ। মন্দকাজ যদি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে, তা হলে দ্বীনদার-পাপী নির্বিশেষে সবার উপর আল্লাহর আযাব আপতিত হবে।যদি তারা সীমালঙ্ঘনকারীকে বিরত রাখতে ব্যর্থ হয়, তা হলে তাঁর আযাব সকলের উপর আপতিত হবে।"[৫৩]

আমাদের মুসলিম সমাজের মাঝেই যে হারে আল্লাহর নাফরমানি ছড়িয়ে পড়েছে, তা বন্ধ করতে সোচ্চার হওয়া মুসলিমের সংখ্যা খুবই নগণ্য। তাদের চেষ্টায় অল্প কিছু মানুষ নাফরমানী থেকে ফিরে আসলেও বেশিরভাগ মানুষ এখনও গোপনে-প্রকাশ্যে পাপ করেই বেড়াচ্ছে। কবিরা গুনাহ যেন মহামারির মতো পুরো উম্মাহকে গ্রাস করেছে, আর অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে এগুলোকে আর গুনাহই মনে করা হচ্ছে না, আর এগুলো বন্ধ করার জন্য কোনো চেষ্টা করা হচ্ছে না। অথচ এটা ওয়াজিব।

যার যে পর্যায়ে যে স্তরের ক্ষমতা আছে,সে সেই স্তরের ক্ষমতা অনুযায়ী সৎকাজের আদেশ করা ও অসৎকাজে নিষেধ করা ওয়াজিব। এবং এটা ইমানের দাবি। [৫৪] এজন্য হিসবাহ ছেড়ে দেওয়া ইমানের জন্য বড় ভয়ংকর বিষয়, হাদিসে এসেছে_

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ "

আমি রসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ গর্হিত কাজ হতে দেখলে সে যেন স্বহস্তে (শক্তি প্রয়োগে) পরিবর্তন করে দেয়, যদি তার সে ক্ষমতা না থাকে, তবে মুখ (বাক্য) দ্বারা এর পরিবর্তন করবে। আর যদি সে সাধ্যও না থাকে, তখন অন্তর দ্বারা করবে, তবে এটা ঈমানের দুর্বলতম পরিচায়ক।[৫৫]. এখন সমাজে ঘটে যাওয়া মুনকারকে ঘৃণা করার মতো মানুষের সংখ্যা কমে গিয়েছে, তারা তো এই মুনকারকে স্বাভাবিক মনে করা শুরু করেছে, এটা ইমানের

জন্য মারাত্মক হুমকি। এভাবে হিসবাহ ছেড়ে দিয়ে ইমানওয়ালারা ইমানের নুর ধীরে ধীরে হারাচ্ছে।

হিসবাহ করা ফরজে কিফায়া, কিছু মানুষ যদি এটা যথাযথভাবে আদায় করে তাহলে তা আদায় হয়ে যাবে, সমাজের বাকিদের গুনাহ হবে না। কিন্তু যদি যথাযথভাবে আদায় না করা হয়, তাহলে প্রত্যেকেই গুনাহগার হবে। তবে যারা আদায়ের কাজে অংশ নেয়, তারা কেবল বেঁচে যাবে। এখন এই হিসবাহর দায়িত্ব পালন যথাযথভাবে করা হচ্ছে না, যতটুকু হচ্ছে তাতেও ইখলাসের ঘাটতি প্রচুর, নাহলে সমাজের এত অন্যায়-অবিচার ঘটতো না। এই দায়িত্বে অবহেলার কারণে এত দামি কালিমার অনুসারী হয়েও আজ আমরা অধঃপতিত এক জাতি। এক হাদিসে এসেছে,

“হুজুরে পাক ﷺ বলেন, কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু যাহারা পাঠ করিবে যতক্ষণ তাহারা উহার অবমাননা না করিবে, ততক্ষণ তাহারা উপকার করিতে থাকিবে। সাহাবারা জিজ্ঞেস করিলেন, হুজুর! কালেমার হকের অবমাননার মতলব কি? হুজুর ﷺ উত্তর করিলেন, যখন আল্লাহর নাফরমানি প্রকাশ্যে করা হয় এবং উহা বন্ধ করার কোনো চেষ্টাই না করা হয়। (তারগীব)[৫৬]
হিসবাহর দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার কারণে জাহিলিয়াত আমাদের পরাজিত করেছে, বিজাতীয় সংস্কৃতি আমাদের মুসলমানদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ছে, আমরা আমাদের অস্তিত্ব হারাচ্ছি। এভাবে হিসবাহ ছেড়ে দেওয়ার কারণে কেবল সাংস্কৃতিক আগ্রাসনই কেবল না, বরং সব রকমের গুনাহ মুসলিম সমাজে মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু সেই অনুযায়ী সেই হারে হিসবাহ করা হচ্ছে না। অথচ পূর্ববর্তী জাতিকে নবীর মুখে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে এই হিসবাহকে অবহেলা করার কারণে। কুরআনে এসেছে,

لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُۥدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا۟ وَّكَانُوا۟ يَعْتَدُونَ

كَانُوا۟ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا۟ يَفْعَلُون

বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদেরকে দাঊদ ও মারইয়াম পুত্র ঈসার মুখে লা‘নত করা হয়েছে।তা এ কারণে যে, তারা অবাধ্য হয়েছে এবং তারা সীমালঙ্ঘন করত।তারা পরস্পরকে মন্দ থেকে নিষেধ করত না, যা তারা করত। তারা যা করত, তা কতইনা মন্দ! (৫:৭৮-৭৯)
বনী ইসরাইলদের অধ:পতন হয় যখন তাদের মধ্যে একদল আল্লাহর হুকুমকে অমান্য করে যাচ্ছিল আর তারা তখন বলতো, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো কিন্তু অমান্য করার পরও তাদের সাথে উঠাবসা চালু রাখার কারণে। তাদের

সাথে আগের মতোই চলাফেরা চালু রাখা এবং সাবধান করা বন্ধ করার কারণে নাফরমানদের দিলের সাথে তাদেরকে মিলিয়ে দিয়ে তাদেরকেও আযাবে গ্রেফতার করেন। কেবলমাত্র যারা মুনকারের বিরুদ্ধে সবসময়ই সতর্ক করতো এবং না মানার তাদের সাথে আগের মতো চলাফেরা চালু রাখেনি তারা বেঁচে যায়।

এই উম্মাহকে হিসবাহ অবহেলা করার কারণে আযাব দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু তারা আযাবকে আযাবই গণ্য করে না। পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদের মাধ্যমে এই আযাব আসছে। কুরআনে এসেছে,

قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم
بَأْسَ بَعْضٍ ٱنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْـَٔايَٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ

বল, 'তিনি তো সক্ষম তোমাদের উপর থেকে অথবা তোমাদের পায়ের নীচ থেকে তোমাদের উপর আযাব প্রেরণ করতে, অথবা তোমাদেরকে বিভিন্ন সন্দেহপূর্ণ দলে বিভক্ত করতে এবং তোমাদের একদলকে অন্য দলের ভীতি আস্বাদন করাতে'। দেখ, কীভাবে আমি আয়াতসমূহ নানাভাবে বর্ণনা করি, যাতে তারা ভালভাবে বুঝতে পারে। (৬:৬৫)

আল্লাহর আযাবে আক্রান্ত জাতি সর্বদা অধঃপতিত, অপমানিত অবস্থাতেই থাকবে, আর আজ হচ্ছেও তাই।

দাওয়াত ও জিহাদ ত্যাগ

ইসলাম শাশ্বত এক জীবন ব্যবস্থা এবং এটি পূর্ণাঙ্গ। এর সার্বজনীনতা সর্বজনবিদিত, তবে এই সার্বজনীনতাকে ধরে রাখার কয়েকটি মাধ্যম আছে – দাওয়াহ, হিসবাহ ও জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ। এগুলোই ইসলামকে জিন্দা করার আসমানী ওহিনির্দেশিত পন্থা। এ পথ ত্যাগ করলে ইসলামকে বিজয়ী করা সম্ভব হবে না, অধ:পতনের বড় কারণগুলোর দুটি কারণ দাওয়াত ও জিহাদ ত্যাগ করা।

দীর্ঘদিন যাবত দাওয়াত চলছে, ইসলামকে শত্রুরা মিটিয়ে দিতে চাইলেও দাওয়াতের কাজ এখনো বন্ধ হয়নি, চলছে, তবে তা পর্যাপ্ত নয়, যে হারে চলার কথা সে হারে চলছে না, আরো বাড়ানোর প্রয়োজন,। কিন্তু উম্মাহ তার দুনিয়াবি উন্নতি-

সাফল্য নিয়ে ব্যস্ত। দাওয়াতের কাজকে অবহেলা করা নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে গেছে। অমুসলিমদেরকে জাহিলিয়াতের অন্ধকার থেকে মুক্ত করার নেই কোনো তামান্না, প্রিয় নবী ﷺ এর অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা কেবল সীরাহর কিতাবে থেকে যায়, উম্মাহ তা যথাযথভাবে নিজের মাঝে ধারণ করতে পারেনি। মানুষের হৃদয়ে থাকা ভুল ধারণাকে দূর করার মাধ্যম হলো দাওয়াত, যখন এই দাওয়াতকে ছেড়ে দেওয়া হয় তখন সেই মানুষগুলোই তাদের হৃদয়ে লালিত ভুলগুলোকে সমাজে ছড়িয়ে দিতে থাকে, ধারাবাহিকভাবে মন্দ ধারণায় সমাজ ছেয়ে যায়, অনুপ্রবেশ করে মুসলিমদের মনমগজে-ও। ফলশ্রুতিতে মুসলিমরাও বের হয়ে ইসলামের গন্ডি থেকে মনের অজান্তেই।

তাই দাওয়াতের কাজ ছেড়ে দিলে কাফের-মুশরিককে ইসলামের বিরোধিতা করা থেকে থামানো সম্ভব হবে না। তাদের ইসলামের বিরোধিতা করার কারণে কুফফার রাষ্ট্রে থাকা মুসলিমদের দ্বীন পালনে সংকীর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হবে, যদিও তা কোনো অবস্থাতেই কাম্য নয়। ইসলামবিরোধীদেরকে দাওয়াত দেওয়ার মাধ্যমেই দ্বীনে দাখিল করার পথ উন্মুক্ত হবে, কিন্তু দাওয়াত না দিলে তারাই ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রতায় লেগে পড়বে।

সাহাবিরা দাওয়াতের কাজ নিরলসভাবে করে গেছেন, কেউ দাওয়াত কবুল করেছে; কেউ-বা প্রত্যাখ্যান করে ইসলামের বিরোধিতা করেছে, বাধা দিয়েছে দাওয়াতে। এদেরকে থামানোর জন্য দাওয়াহ যথেষ্ট নয়, বরং দরকার জিহাদ্, আর সাহাবিরা তাই করে গেছেন।

বর্তমান মুসলিমদের কাছে জিহাদ মানে উগ্রবাদ, আর কুরআনে বর্ণিত জিহাদকে তারা কেবল নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ বা জ্ঞানের সাহায্যে জিহাদকে বুঝে থকে। এটা নির্জলা অপব্যাখ্যা ব্যতিত আর কিছুই না। যে জিহাদের মাধ্যমে দ্বীনকে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সাহাবীরা, সেই জিহাদের ব্যাপারে মিডিয়ায় অপপ্রচার চালাতে কুফরি শক্তির রয়েছে ব্যাপক চেষ্টা-প্রচেষ্টা। জিহাদের মাধ্যমে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করে আবারও বিশ্বকে আল্লাহর হুকুমে শাসন করা যাবে, কুফরি শক্তি হবে পদদলিত। কিন্তু বর্তমানে মুসলিমরাই অত্যাচারিত, নির্যাতিত, নিষ্পেষিত। মুসলমানদের এই অবস্থার কারণ জিহাদকে ত্যাগ করা।
সুলতান নুরুদ্দিন মাহমুদ জিহাদকে আঁকড়ে ধরে ইসলামী শাসনকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। এমনকি উনি বলেছিলেন, আমরা কখনোই জিহাদকে ত্যাগ করবো না। তারপর তার ওফাতের পর তার ছেলে যখনই জিহাদকে ছেড়ে দিল, কুফরি শক্তি মুসলিমদের উপর আক্রমণ করে ভূমি ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয়। তাই

ইতিহাস-ও সাক্ষী দেয়, জিহাদ ত্যাগের ফলাফল কেবল উম্মাহর ব্যর্থতা আর পতন।
মাওলানা সাবের আব্দুল্লাহ 'ইসলামকে সর্বক্ষেত্রে বিজয়ী করা'-কে ইমানের দাবি সাব্যস্ত করেছেন।[৫৭]

মানুষের স্বভাবধর্ম এটাই যে সে সর্বদা বিজয়ীশক্তির অনুসরণ করে। বর্তমানে জাতি হিসেবে মুসলমানরা ক্ষমতাহারা, কর্তৃত্বহারা; রাজনৈতিকভাবে ইসলাম বিজয়ী না। এর ফলাফল তো এই যে বিজয়ী শক্তির অনুকরণ করতে গিয়ে তাদের কৃষ্টি-কালচারকেও অন্ধভাবে অনুকরণ করছে, ফলে দ্বীন ইমানকে-ও হুমকির মুখে ফেলে রেখেছে উম্মাহ। হকের দাওয়াতে তাদের পরিবর্তন হচ্ছে না, কেননা তাদের হৃদয়-মস্তিষ্ক কুফরি শক্তি দ্বারা আচ্ছন্ন আর প্রভাবিত। ইসলামের পরাজিত অবস্থার কারণ উম্মাহর অধিকাংশের জিহাদকে ছেড়ে দেওয়া।
কুফফাররা শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে জিহাদকে দমন করছে বিশ্বজুড়ে। কুরআনেও তাদের অবস্থা তুলে ধরেছে।
وَاِذَا قِیۡلَ لَہُمۡ لَا تُفۡسِدُوۡا فِی الۡاَرۡضِ ۙ قَالُوۡۤا اِنَّمَا نَحۡنُ مُصۡلِحُوۡنَاَلَاۤ اِنَّہُمۡ ہُمُ الۡمُفۡسِدُوۡنَ وَلٰکِنۡ لَّا یَشۡعُرُوۡنَ
তাদেরকে যখন বলা হয়, 'পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করো না', তারা বলে, 'আমরা তো শান্তি স্থাপনকারীই।' সাবধান! এরাই অশান্তি সৃষ্টিকারী, কিন্তু এরা তা অনুভব করতে পারে না।(২:১১-১২)

শান্তির নামে জিহাদের বিরোধিতা করে মুসলিমদেরকে-ও জিহাদের অপব্যাখ্যা থেকে দূরে রেখে আল্লাহর প্রতিশ্রুত উম্মাহকে দেওয়া নিশ্চিত বিজয়ের পথে বাধা দেয়। কেননা জিহাদের দ্বারা হককে বাতিলের উপর বিজয় দান করেন স্বয়ং আল্লাহ, এজন্য মুসলিমদের কেবল দূরে রাখাই নয়,বরং জিহাদের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে তাদেরকে এর ধারেকাছেও আসতে দিতে চায় না কুফফাররা। জিহাদকে ছেড়ে দেওয়ার কারণেই উম্মত আজ পরাজিত অবস্থায়।

খিলাফাহর পতন

রসুলুল্লাহ ﷺ এর ওফাতের পর আবু বকর রা. ও উমার রা. এর কঠোর নীতির কারণে ইহুদি-খ্রিস্টানরা মুসলিমদের খিলাফাহ ব্যবস্থার উপর আক্রমণ করার সুযোগ পায়নি। কিন্তু যখনই উসমান রা. এর নম্রতার আভাস পেল, তখনই ইহুদি আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা মুনাফিকরূপে মুসলিমদের মাঝে সাহাবিদের প্রতি বিদ্বেষ, খিলাফাতের হকদার কে, উমাইয়া ও হাশেমিদের পূর্বকার বিরোধ যা ইসলাম আসার পর চাপা পড়ে গিয়েছিল- এরকম কিছু বিষয়ের অবতারণা করে

মুসলিমদের খিলাফাহকে ঠুনকো করার প্রয়াস চালায় এবং সফল হয়। এর জন্য কুফা, বসরা ও মিশরে সাবায়ী মতবাদকে সমর্থন করে এমন একদলকে প্রস্তুত করা হয়। উসমান রা.-কে হত্যা করা ও আলি রা.-কে খলিফার পদে আসীন করানো তাদের দ্বিতীয় পদক্ষেপ যা উমাইয়া-হাশেমী বিরোধকে জিইয়ে তুলে। এরপর আলি রা. এর সময়ের পুরোটাই সাবায়ীদের চক্রান্তের ফলে মুসলমানদের মধ্যে লড়াই হয় যা মুশাজারাতে সাহাবা বলে ইতিহাসের এক অধ্যায় আছে। মুআবিয়া রা. সাবায়ীদের কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাদের চক্রান্ত থেকে লম্বা সময় উম্মাহ নিরাপদ ছিল। যদিও স্থান-বর্ণ ও জাতি-পরিচয়ের ভিন্নতা সত্ত্বেও কখনোই মুসলিমবিশ্বে একাধিক খলিফার প্রশ্ন উত্থাপিত হয়নি তবুও বনু উমাইয়ার শাসনামলে সীমিত কিছু সময় দুই খলিফার অস্তিত্ব ছিল; কিন্তু আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর মতাদর্শ অনুসারে আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন একমাত্র বৈধ খলিফা। উমাইয়া শাসনব্যবস্থার পতন ও আব্বাসি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পর ইসলামি বিশ্বের নানা অংশে বিভিন্ন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলেও আব্বাসি খলিফা ব্যতীত অন্য কেউ নিজেকে খলিফা বলে দাবি করেনি। ২৯৭ হিজরি সনে যখন উবায়দি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা উবায়দুল্লাহ আল মাহদি নিজেকে খলিফা দাবি করেন, মূলত তখনই মুসলিমবিশ্ব প্রথমবারের মতো খিলাফত প্রশ্নে বিভক্তির শিকার হয়। এর ১৯ বছর পর ৩১৬ হিজরি সনে যখন আন্দালুসে আবদুর রহমান আন-নাসিরও নিজেকে খলিফা ঘোষণা করেন, তখন মুসলিমবিশ্ব খিলাফতের ক্ষেত্রে তিনভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। ৮৭ বছর পর ৪০৩ হিজরি সনে কর্ডোভাকেন্দ্রিক খিলাফতব্যবস্থার পতন ঘটলে মুসলিমবিশ্ব আবারও দুই খলিফার যুগে প্রবেশ করে। এরও ১৬৪ বছর পর ৫৬৭ হিজরি সনে উবায়দি সাম্রাজ্যের পতন ঘটলে আবারও মুসলিমবিশ্ব এক-অভিন্ন খিলাফতব্যবস্থায় ফিরে আসে। যদিও এ সময় আব্বাসি খিলাফতের ভঙ্গুর অবস্থার কারণে বিভিন্ন রাষ্ট্র আব্বাসি খলিফার কর্তৃত্ব শিকার করত না; কিন্তু তারা আব্বাসি খলিফার মোকাবিলায় ভিন্ন খলিফা দাঁড় করানোর চিন্তাও করেনি। ৬৫৬ হিজরি সনে তাতার আগ্রাসন-পরবর্তী সময়ে অল্প কিছুদিন মুসলিমবিশ্ব খিলাফতশূন্য থাকলেও ৬৫৯ হিজরি সনে মিশরে আবারও আব্বাসি খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর সেলজুক সাম্রাজ্য, জিনকি রাজ্য এগুলো খিলাফাতের অধীনে শাসন চালায়। জিনকি রাজ্যের সুলতান নুরুদ্দীন মাহমুদ জিহাদের মাধ্যমে ইসলামি একক খিলাফতকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন তাই ছাত্র সালাহউদ্দিন আইউবী কর্তৃক উবায়দীদের পতনের মাধ্যমে। নুরুদ্দীন মাহমুদ ছিলেন ক্রুসেডারদের কাছে ত্রাস, তিনি মুসলিমভূমি পুনরুদ্ধারে মনোযোগী হোন যখন স্বয়ং খলিফা ছিলেন নির্বিকার। মিশর শাসন করতেন সালাহউদ্দিন আইউবী, নুরুদ্দীনের মৃত্যুর পর তার শাসিত অঞ্চলে মুসলিমরা হয় বেপরোয়া আর কুফফাররা তাতে

লোলুপ দৃষ্টি দিতে থাকে। সুলতান সালাহউদ্দিনের প্রচেষ্টায় সেসকল অঞ্চল আবারও নিয়ন্ত্রণে এনে আইউবী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন যার অধীনে তৃতীয় ক্রুসেডের পরেও আল-কুদস মুসলিমদের অধীনে থাকে। তার মৃত্যুর পর শাম অঞ্চলে আবারও ক্রুসেডাররা হানা দেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯১৮ সালেই উসমানীয় সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন শুরু হয়। ক্ষয়িষ্ণু উসমানীয় সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটান এবং তার স্থলে তুর্কি প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি ঘোষণা করেন। খিলাফাহর পতন ঘটানোর কারণে কুফফাররা তাকে মুসলমানদের সামনে সম্মানের পাত্র হিসেবে তুলে ধরতে চায়, লুকিয়ে রাখতে চায় তার সর্বগ্রাসী ভূমিকা যা খিলাফাহর পতন ঘটিয়েছিল....

১৯৮১ সালে আতাতুর্কের জন্মের শতবার্ষিকীতে তার স্মৃতিকে জাতিসংঘ ও ইউনেস্কো সম্মানিত করেছিল, সালটিকে বিশ্ব আতাতুর্ক বর্ষ হিসাবে ঘোষণা করে এবং আতাতুর্ক শতবর্ষে রেজোল্যুশন গ্রহণ করে, যেখানে তাঁকে "ঔপনিবেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রদত্ত প্রথম সংগ্রামের নেতা" হিসেবে বর্ণনা করা হয় এবং যিনি "জনগণের মাঝে বোঝাপড়া এবং বিশ্বের বিভিন্ন জাতির মধ্যে টেকসই শান্তির ধারণার অসাধারণ প্রবর্তক এবং তিনি সারাজীবন মানুষের মাঝে বিভেদ ছাড়াই সম্প্রীতি ও সহযোগিতার বিকাশের জন্য কাজ করেছেন"।[৫৮]

যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব রিচমন্ডের ইতিহাসের অধ্যাপক ও তুরস্ক বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ইউসেল ইয়ানিকদাগ বিবিসি মুন্ডোকে বলেন, "সেসময় সেনাবাহিনীর অনেক সদস্য মনে করতো, উসমানীয় সাম্রাজ্যকে পতনের হাত থেকে বাঁচানোর একমাত্র পথ হচ্ছে একে পশ্চিমা ধারায় আধুনিকীকরণ করা।" সেনাদের এই দলটি ধর্মনিরপেক্ষতাকে সমর্থন করতো। তিনি বলেন, "তার মানে এই নয় যে, তারা ধর্ম কিংবা ইসলামকে পছন্দ করতো না। বরং তারা মনে করতো, ধর্ম আসলে কোন না কোন ভাবে সামাজিক উন্নয়নের গতিকে ধীর করে দিচ্ছে।"[৫৯]

ইসলামি খিলাফাতের শুরু থেকেই তাদের নজর ছিল খিলাফাতের সুবিন্যস্ত ব্যবস্থাকে শেষ করা, কেননা তা তৎকালীন দুই পরাশক্তি রোম ও পারস্যকে পরাজিত করে নতুন পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভাব হয়। ইতিহাসের পাতায় তাদের অক্লান্ত চেষ্টা কেবল খিলাফাহর ভিতকে নড়বড়ে করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে নিবেদিত ছিল। এজন্য নতুন হাতিয়ার সেক্যুলারিজম ক্ষয়িষ্ণু উসমানী সাম্রাজ্যের পতনে খ্রিস্টানদের সফলভাবে কার্যকরী ভূমিকা রাখে। যেসকল ভূমির করায়ত্ত কুফফাররা নিয়েছিল তারা সেখানে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিল, চড়াও হয়েছিল মুসলিমদের উপর। খিলাফাহ ছাড়া উম্মাতের মুসলিমরা কুফরি শক্তির নির্মমতার শিকার হয়েছিল, হচ্ছেও। খিলাফাহর পতন

মুসলিম উম্মাহর অধঃপতনের বিরাট বড় একটি কারণ। বরং এটিই প্রধানতম কারণ।

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্রুসেডে খিলাফাহর পতন ঘটাতে না পারলেও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেডের ময়দানে সফলতার সাথে এমন একদল সেক্যুলার মুসলিম তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল যারা খিলাফতের পতন ঘটায়, অথচ নাম দেয় ঔপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের পতন হিসেবে। অথচ তা ছিল খিলাফাহর পতন। অর্থ্যাৎ খিলাফাত শব্দটিকে কৌশলে এড়িয়ে গিয়ে মুসলমানদের শাসন করার পথ সুগম করে এবং মুসলিমরাও তা অনায়াসে মেনে নেয়। এরপর থেকে মন-মগজে ইসলামের সামগ্রিকতার ধারণাকে নি:শেষ করার জন্য বিভিন্ন ইজম, মতবাদকে অন্তরে প্রোথিত করে দেয় যেন আবার খিলাফতকে প্রতির্ষ্ঠা করতে মুসলিমরা সচেষ্ট না হয়। কেননা খিলাফাত তাদের অস্তিত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ, তাদের নেতৃত্বকে কেড়ে নিয়ে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর কর্তৃত্বকে প্রতির্ষ্ঠিত করে।

মিসাকুল আমালিল ইসলামি কিতাবে এসেছে.....*কুফরি শক্তির সামরিক বিভাগের কাজ ছিল খিলাফাতকে ধ্বংস করা। কারণ এটি ছিল মুসলিমদের ঐক্যের প্রতীক হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকা একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা। তারা তাদের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করেছে।.....আমাদের শত্রুরা ভালো করেই বুঝতে পেরেছে যে, খিলাফাত ধ্বংস করলেই ইসলাম ধ্বংস হয়ে যাবে না। সেটার জন্য আরো কাজ করা লাগবে। তারা দেখল যে, ইসলাম যতদিন তার পূর্ণাঙ্গ ও সর্বব্যাপী রূপ নিয়ে মুসলিমদের মনে প্রোথিত থাকবে, ততদিন পর্যন্ত এর অনুসারীরা হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাবে। ইতিহাসে এমনটা অনেকবার ঘটেছে এবং শত্রুরা এগুলো দেখে শিক্ষা নিয়েছে। ঐতিহাসিক প্রমাণ এই যে, খিলাফাতের দায়িত্ব পালনে একেকবার একেক ভূমি নেতৃত্ব দিয়েছে।......তাই সামগ্রিকভাবে মুসলিমদের মন থেকে যদি ইসলামের সঠিক ধারণা দূর করা যায়, তা হলে এই খিলাফাতের আবার মাথা তুলে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা নিঃশেষ হয়ে যাবে।*[৬০]

নারী ফিতনা

নারী জাতি এমন এক জাতি যারা দ্বীনের বুঝ পেলে হয় সবচেয়ে সেরা আর আত্মত্যাগী। আবার দ্বীনের বুঝ ব্যতীত সবচেয়ে ছলনাময়ী আর ফিতনাময়। নারীরা ফিতনা কতটা ভয়ানক হতে পারে তার জন্য একটি হাদিস উল্লেখ করা যাক। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

"পুরুষের জন্য নারীর চেয়ে ক্ষতিকর ও কষ্টকর কোনো পরীক্ষা আমি রেখে যাচ্ছি না। "(বুখারি, মুসলিম)[৬১]

হাদিসে যে শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো فتنة বা ফিতনাহ অর্থ্যাৎ পরীক্ষা। স্বয়ং নবীজি ﷺ বলেছেন, কষ্টকর ও ক্ষতিকর ফিতনা, তার মানে এ ব্যাপারে উম্মতের পুরুষদের সচেতনতার জরুরত সর্বাধিক এবং শয়তান নারীকে আশ্রয় করে উম্মতের পুরুষদেরকে পথভ্রষ্ট করতে তৎপর হবে।

নারীর প্রতি স্বভাবতই পুরুষজাতি আকৃষ্ট হয়। এই আকর্ষণ প্রকৃতিগতভাবে এজন্যই যেন তারা বংশবৃদ্ধি করে নিজেদের ঔরসের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে পারে। তবে অবশ্যই এক্ষেত্রে সৃষ্টিকর্তার নিয়মবহির্ভূত পন্থা স্বীকৃত হবে না। এটাই পরীক্ষা। নারীরা এমনভাবে জীবনযাপন করবে যেন তা পুরুষের জন্য ফিতনা হবে না, আবার দায়িত্ববান পুরুষও তার দায়িত্বে থাকা নারীকে শালীনতার সহিত পূর্ণ হিজাবে চলার ব্যাপারে আদেশ করার সাথে সাথে নজরদারিতে রাখবে। সমাজে নারীরাই আজ অশালীন চলাফেরায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, এজন্য দায়ী নারীর দ্বীন দূরে সরা এবং বিশেষ করে পুরুষদের দায়িত্বশীলতার ঘাটতি।

সমাজের অন্যায় অনাচার, যা-কিনা মুসলিমদের মাঝে ছড়িয়ে গেছে মারাত্মকভাবে তার অধিকাংশই নারী-ঘটিত। নারীরা যদি পর্দার হুকুমে থাকতো, তবে অনেক অন্যায় কমে যেত। নারীর পিছু নেওয়া কতটা ফিতনাময় তা হাদিসে এসেছে এভাবে.....

মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'সুলাইমান ইবনু দাউদ (আলাইহিস সালাম) তাঁর ছেলেকে (উপদেশ দিতে গিয়ে) বলেছেন,

إِمْشِ وَرَاءَ الْأَسَدِ وَالْأَسْوَدِ وَلَا تَمْشِ وَرَاءَ إِمْرَأَةٍ "

সিংহ ও কালো সাপের পিছু নিও; কিন্তু নারীর পিছু নিও না। [৬২]

অর্থ্যাৎ নারীর পিছু নেওয়া সিংহের মতো হিংস্র প্রাণী বা কালো সাপের মতো ভয়ংকর মাখলুকের পিছনে ছোটার চেয়ে অনেক ও ফিতনাময়। কিন্তু নারীর পিছনে ছুটেই পরকীয়া, বিবাহ- পূর্ববর্তী সম্পর্ক, বিবাহ-বহির্ভূত সর্ম্পক, মুসলিমের দ্বারা মুসলিম নারী-শিশুকে ধর্ষণ, পতিতাবৃত্তি ইত্যাদি সামাজিক সমস্যার কারণ-ও নারীরাই, পরোক্ষভাবে গয়রতহীন পুরুষরাও। বেপর্দা চলাফেরায় অভ্যস্ত সমাজে পুরুষরা-ও নজরের হিফাজত করে না। ফলে গুনাহের ভয়াবহতা ছড়িয়ে পড়েছে। কারণ নজর শয়তানের বিষাক্ত তীর। এই তীর কেবল তীর নয়, বিষ মাখানো তীর। বিষের প্রভাব তার অন্তরে খারাপ প্রভাব ফেলে, বিষক্রিয়া সমগ্রদেহে ছড়িয়ে পড়ে এবং গুনাহে জড়িয়ে পড়ে। এভাবে আল্লাহর নাফরমানিতে মুসলিমরা নিজেদেরকে কলঙ্কিত করে ফেলেছে। নারীরা যদি পর্দায় আবৃত করতো এবং ফলে

পুরুষরাও সহজেই নজরের হিফাজত করতে সক্ষম হতো এবং গুনাহের ভয়াবহতা কমে যেত। নারীর ফিতনায় পড়ে ব্যভিচার মহামারির ন্যায় ছড়িয়ে পড়েছে এবং এই কারণেই অধ:পতন। কুরআন থেকে মিছাল পেশ করা যাক.......

সুরা আরাফের ১৭৬ আয়াতের ব্যাখ্যায় এসেছে,

মুসা (আ) কে 'জাব্বারীন' সম্প্রদায়ের যুদ্ধ করতে বললে, জাব্বারিন সম্প্রদায়ের লোকেরা ভয় পেয়ে বলাআ'ম ইবনে বাউরার কাছে যায় যেন তার ইসমে আযমের দ্বারা আল্লাহ তাদেরকে মুসা আ. এর মোকাবেলার জয়ী করে। সে নবীর বিরুদ্ধে বদ্ দুআয় অস্বীকৃতি জানায়। পরবর্তীতে দুনিয়াবি লোভে পড়ে কিংবা স্ত্রীর পরামর্শে বদদুআ করতে রাজি হয়। মুসা (আঃ) ও তাঁর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বদদোয়া করতে গিয়ে সে যেসব বাক্য বলতে চাইছিল সেসবই নিজ সম্প্রদায়ের প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে উচ্চারিত হয়ে যাচ্ছিল। তখন সবাই চীৎকার করে উঠল, তুমি যে আমাদের জন্যই বদদোয়া করছ। বালআ'ম বলল, এটা আমার ইচ্ছাকৃত নয়–আমার জিহ্বা এর বিরুদ্ধাচরণে সমর্থ নয়। ফল দাঁড়াল এই যে, সে সম্প্রদায়ের উপর ধ্বংস নাযিল হল। আর বালআ'মের শাস্তি হল এই যে, তার জিহবা বেরিয়ে এসে বুকের উপর লটকে গেল। তার দুনিয়া আখিরাত নিশ্চিত বুঝতে পেরে বালআম অপকৌশল বলে দেয় তার সম্প্রদায়কে যেন জয়ী হতে পারে।
তাহল এই যে, *তোমরা তোমাদের সুন্দরী নারীদিগকে সাজিয়ে বনী-ইসরাঈল সৈন্যদের মাঝে পাঠিয়ে দাও। তাদেরকে একথা ভাল করে বুঝিয়ে দাও যে, বনী ইসরাঈলের লোকেরা তাদের সাথে যা-ই কিছু করতে চায়, তারা যেন তা করতে দেয়, কোন রকম বাধ যেন না সাধে। এরা মুসাফির, দীর্ঘদিন ঘর ছাড়া, হয় তো বা এরা এ ব্যবস্থায় ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়বে। আর আল্লাহর নিকট ব্যভিচার অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। যে জাতির মাঝে তা অনুপ্রবেশ করে, তাদের উপর গযব ও অভিসম্পাত নাযিল হয়, সে জাতি কখনও বিজয় কিংবা কৃতকার্যতা অর্জন করতে পারে না।*

ফলস্বরূপ বনী ইসরাইলে প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে, এমনকি একদিনে ৭০০০০ মৃত্যুবরণ করে।[৬৩]
(সংক্ষেপিত) অর্থ্যাৎ নারীর ফিতনায় পড়ে ব্যভিচারে লিপ্ত হলে আল্লাহ সেই জাতিকে অধঃপতনের সম্মুখীন করবেনই। এটাই সত্য, হাকিকত।

রসুল ﷺ বলেছেন:

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلات مائلات رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

"দুশ্রেণীর জাহান্নামীকে আমি দেখিনি। (অর্থাৎ পরবর্তী সময়ে সমাজে এদের দেখা যাবে।) এক শ্রেণী ঐ সকল পুরুষ যারা সমাজে দাপট দেখিয়ে চলে, তাদের হাতে থাকে বাঁকানো লাঠি বা আঘাত করার মত হাতিয়ার, যা দিয়ে তারা মানুষদেরকে মারধর করে বা কষ্ট দেয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর দোজখবাসী ঐ সকল নারী যারা পোশাক পরিহিতা হয়েও উলঙ্গ, যারা পথচ্যুত এবং অন্যদেরকে পথচ্যুত করবে, এদের মাথা হবে উটের পিঠের মত ঢং করে বাঁকানো, এরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, এমনকি জান্নাতের সুগন্ধও তারা পাবে না, যদিও জান্নাতের সুগন্ধ অনেক অনেক দূর থেকেও পাওয়া যাবে।"[৬৪]

হাদিসের ব্যবহৃত শব্দদুটি مميلات مائلات নিজেও ঝুঁকে এবং অন্যকেও ঝুঁকায় কিংবা যারা পথচ্যুত এবং অন্যদেরকে পথচ্যুত করে। তাদের আরো একটি সিফাত হলো এই যে, পোশাক পরেও তাদের উলঙ্গ।

পশ্চিমারা বালআ'মের প্রেসকিপশনে পোশাক-পরিচ্ছদে এমন অশ্লীলতা-বেহায়াপনা ছড়িয়ে দিচ্ছে যাতে করে ব্যভিচারের আখড়ায় পরিণত হচ্ছে মুসলিমদের পরিবেশ-সমাজ। পশ্চিমাদের পোশাক-পরিচ্ছদ মুসলিম সমাজে বিশেষ প্রসার ও জনপ্রিয়তা লাভ করছে, এমনকি মুসলিমরা তা সানন্দে গ্রহণ করছে। এগুলোর অনুসরণ করতে গিয়ে পুরুষালি পোশাকে মুসলিম নারীরা বাইরে বেপর্দা ঘুরাফেরা করছে। অথচ এ ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি এসেছে। দুটো হাদিস উল্লেখ করা যেতে পারে।

হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে নারী পুরুষদের অনুকরণে সাজসজ্জা বা চালচলন করে এবং যে পুরুষ নারীদের অনুকরণে সাজসজ্জা বা চালচলন করে তারা আমাদের (মুসলিম সমাজের) মধ্যে গণ্য নয়।"................
...প্রসিদ্ধ তাবিয়ী ইবনু আবী মুলাইকা বলেন, আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়, মহিলারা কি সেন্ডেল জাতীয় (পুরুষালী) পাদুকা পরিধান করতে পারবে? তিনি বলেন, তিনি উত্তরে বলেন,

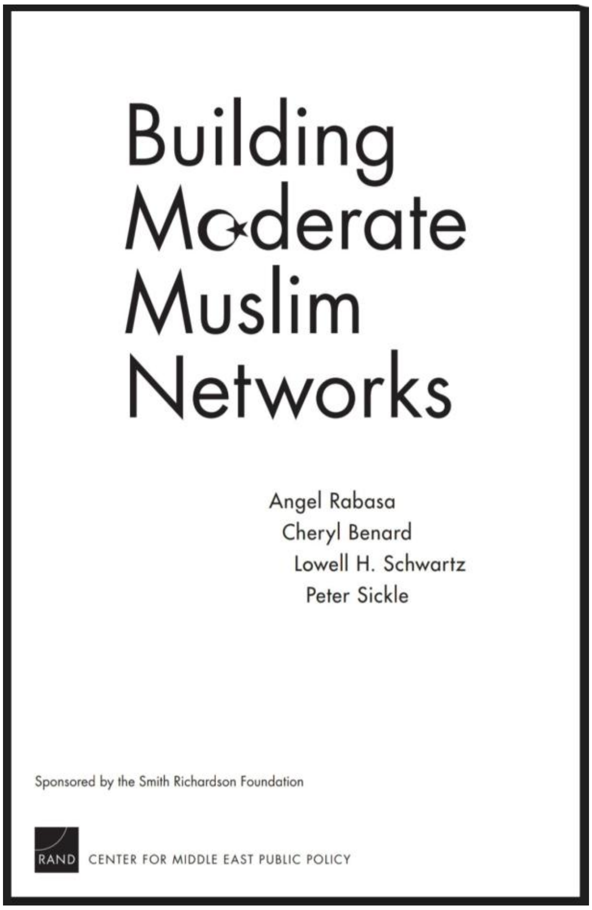
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ الرَّجُلَةَ مِنَ النِّسَاءِ

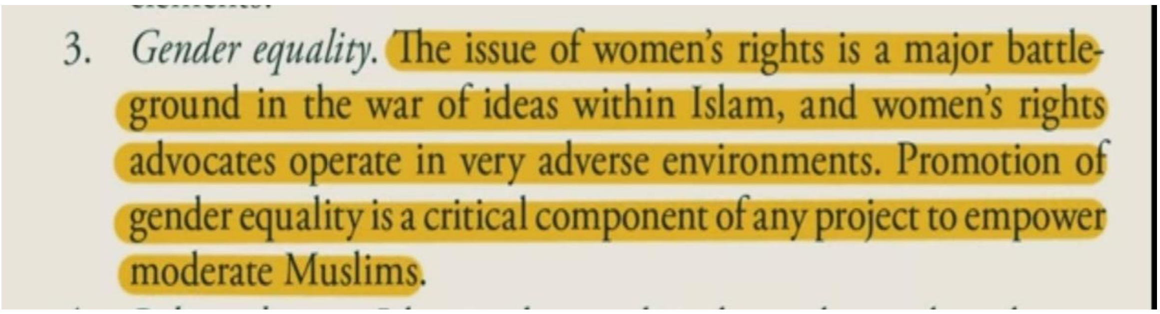
"রাসূলুল্লাহ পুরুষালি চলনের নারীদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন।" (আবু দাউদ)[৬৫]

অথ্যাৎ উম্মতদের নারীদের এটা সাজেনা যে তারা পুরুষের ন্যায় পোশাক পরিধান করবে। এমনকি তিনি অভিশাপ দিয়েছেন।

যে উম্মতের নারীরা নবী ﷺ -এর কর্তৃক অভিশপ্ত এবং তিনি যাদেরকে উম্মতের বাহিরে গণ্য করেছেন সেইরকম নারী কর্তৃক যখন সমাজ পরিপূর্ণ তখন তা তাদের আদর্শিক, আত্মিক ও সামগ্রিক অধঃপতনের জন্য যথেষ্ট। আর বালআ'মের প্রেসকিপশনে নারীর ফিতনায় পড়ে নবী মুসা আ. এর সাথে থেকেও বনী ইসরাইলীরা আল্লাহর আযাবে ধৃত হয়েছিল, ঠিক এখনও নারীর পোশাক আর চালচলন ব্যভিচারের পথকে উন্মুক্ত করে দিয়ে ধ্বংসকে অনিবার্য করে ফেলেছে। আর গায়রতবিহীন পুরুষরা-ও এ জন্য দায়ী।

আরেকটি বিষয় হলো নারীবাদ, সমান অধিকার কিংবা লিঙ্গ সমতার নামে ভয়ংকর এক ফাঁদ। ইসলামবিরোধী চলমান বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেডের অন্যতম মরণাস্ত্র নারীবাদ। নারীবাদকে মোক্ষম হাতিয়ার বানিয়েছে পশ্চিমারা। এর মাধ্যমে তারা ইসলামকে ধ্বংস করতে চায়। তাদের গবেষণা-পর্যালোচনার অন্ত নেই 'কিভাবে ইসলামকে ধ্বংস করবে'। তারই ধারাবাহিকতায় আমেরিকার RAND কর্পোরেশন কর্তৃক ২০০৭ সালে প্রকাশিত '***Building Moderale Muslim Networks'*** এ বলা হয়েছে...





3. *Gender equality.* The issue of women's rights is a major battleground in the war of ideas within Islam, and women's rights advocates operate in very adverse environments. Promotion of gender equality is a critical component of any project to empower moderate Muslims.

ইসলামের বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ে নারী অধিকারের ইস্যুটি অন্যতম বৃহত্তম রণাঙ্গন।এবং নারী অধিকারকর্মীরা অনেক প্রতিকূল পরিবেশে কাজ করছে মডারেট মুসলিমদের ক্ষমতায়নের জন্য লিঙ্গ সমতার প্রচার একটি মোক্ষম হাতিয়ার।[৬৬]

নারীবাদকে উস্কে দিয়ে তারা নারী-পুরুষ সমান অধিকার দাবি করে, শেষ পর্যন্ত ইসলামের বিধানকে পরিবর্তন করাই তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য। ফলে মুসলিমরাই সংস্কার

চায় এবং এরাই আমেরিকার সংজ্ঞায়িত মডারেট মুসলিম, আসলে সংস্কারের নামে মুসলিমদের ইমান হরণ করে ফেলছে কুফফাররা। মুসলিমদেরকেই দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে আসমানী ওহির মোকাবেলায়। আর RAND কর্পোরেশন কর্তৃক প্রকাশিত গবেষণা রিপোর্টেই বলা হয়েছে, নারী অধিকারের ইস্যু তাদের জন্য অন্যতম বৃহত্তম রণাঙ্গন অথ্যাৎ যুদ্ধের জায়গা, হোক সেটা বুদ্ধিবৃত্তিক। নারীদেরকে টার্গেট করে সহজেই তারা ইসলামকে হয় ধ্বংস করতে চায়। আর তাদের লক্ষ্য অর্জনে তারা মুসলিম সমাজে নারীবাদের বিষ ছড়িয়ে দিয়েছে। এর মাধ্যমে তারা নারীদেরকে ঘর থেকে বের করে উম্মাহর মুজাহিদ তৈরি করা থেকে বিচ্যুত করতে পেরেছে, সন্তানদেরকে ডিভাইসে আসক্ত করে তাদেরকেও মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করেছে কুফরি শক্তি।

আত্মশুদ্ধির ঘাটতি

নিজের আমলে সন্তুষ্ট থাকা

প্রকৃত মুমিন কখনো তার আমল নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে না। তার হালত এমন হবে, আমি যতটুকু করি তার চেয়ে বেশি করা উচিত ছিল। আমাদের প্রিয় রসুল ﷺ বলতেন, আমি আপনার ইবাদতের দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ করবেন না বললে উম্মাহ কি করে মনে করতে পারে যে তার আমল যথেষ্ট বা অনেক। এটা মুমিনের শানের খেলাফ। এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা প্রকৃত ইমানদারের সাথে খাপ খায় না

কারণ হাদিসে এসেছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের শারীরিক অবয়ব ও সম্পদের দিকে তাকাবেন না, বস্তুত তিনি তাকাবেন তোমাদের অন্ত:করণ ও কর্মের দিকে [৬৭] এ কারণে আল্লাহর নিকট মানুষের মর্যাদা ইমানের দৃঢ়তা, একনিষ্ঠতা প্রভৃতির ভিত্তিতে হয়ে থাকে।হাসান বসরী রহ. বলেন, আল্লাহর কসম আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু অধিক সালাত-সিয়ামের মাধ্যমে তাদের (সাহাবীদের) মধ্যে শ্রেষ্ঠ মর্যাদাবান হননি, কিন্তু তার অন্তরের ইমানের স্থিতির মাধ্যমেই তিনি তাদের মধ্যে অগ্রণী হয়েছেন।[৬৮] । তাই যারা আমল করার পর ওই আমলের মধ্যে সন্তুষ্ট হয়ে যায়,মনে করে আমল তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। সুরা আল-ইমরানের ১০৭ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস রা. বলেন, "এখানে আল্লাহর রহমত বলে জান্নাতকে বুঝানো হয়েছে। তবে জান্নাতকে রহমত বলার রহস্য এই যে, মানুষ যত এবাদতই করুক না কেন, আল্লাহর রহমত ব্যতীত জান্নাতে যেতে পারবে না। কারণ ইবাদত করা মানুষের নিজস্ব পরাকাষ্ঠা নয়, বরং আল্লাহ প্রদত্ত

সামর্থ্যের বলেই মানুষ এবাদত করতে পারে। সুতরাং ইবাদত করলেই জান্নাতে প্রবেশ অবধারিত হয়ে যায় না। বরং আল্লাহর রহমতের দ্বারাই জান্নাতে প্রবেশ করা সম্ভব। (তফসীরে কবীর)[৬৯]

আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺবলেন, "মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো, অন্তত এর কাছাকাছি থেকো এবং সুসংবাদ গ্রহণ করো। কারো আমলই তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে না।" লোকেরা বলল, "হে আল্লাহর রাসুল! আপনিও কি নন?" তিনি ﷺবললেন, "আমিও নই, যদি না আল্লাহ আমাকে তাঁর রহমতের চাদরে ঢেকে নেন।"[৭০]

স্বয়ং রাসুলুল্লাহ ﷺএর ব্যাপারটাই যদি এমন হয় তাহলে উম্মাহ কি করে তার আমল নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে? সন্তুষ্ট থাকাটা তাহলে কতটুকু অনুচিত হবে তা সহজে অনুমেয় । কারণ বিনয় মুমিনের অন্যতম একটা গুণ যা সন্তুষ্ট থাকলে অর্জন করা সম্ভব না।

যদি কেউ রবের শুকরিয়া আদায় করতে চায়, তবে সে শুকরিয়া আদায় করে শেষ করতে পারবে না। কেননা এত এত নাজ-নিয়ামতের মাঝে ডুবে থাকার পর প্রতিটি নিয়ামতের জন্য শুকরিয়া আদায় করা কখনো এই স্বল্প হায়াতে সম্ভব না। যেখানে শুকরিয়া আদায়ের মানেই হলো ইবাদাত, তাহলে নিজের করা ইবাদতে সন্তুষ্ট থাকাটাও অনুচিত, তার মধ্যে সদা এই ভয় থাকবে যে–আমল যা করেছি তা কবুল হলো কি না এবং তা কবুলের জন্য দোআ করা। যেমনটা পিতা ইবরাহীম ও তাঁর পুত্র ইসমাইল (আলাইহুমাস সালাম) করেছিলেন কাবা তৈরি করার সময়।

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَٰهِـۧمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَٰعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ

আর স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কাবার ভিত্গুলো উঠাচ্ছিল (এবং বলছিল,) 'হে আমাদের রব, আমাদের পক্ষ থেকে কবূল করুন। নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী'।(২:১২৭)

তাই বান্দা হিসেবে আদব এটাই যে সে তার আমল নিয়ে সন্তুষ্ট হবে না, গর্ব করবে না, কেননা তা রিয়া বা মুনাফেকীর দিকে নিয়ে যায়। সে এর বিপরীতে বিনয় প্রকাশ করবে। বিনয় হচ্ছে বান্দার আল্লাহকে সম্মান করা, তাঁর কাছে নিজেকে ছোট ও তুচ্ছ মনে করা এবং তাঁর সামনে কাতরভাব প্রকাশ করা। এই বিনয়ের ঘাটতির কারণে তারা দায়ী ইলাল্লাহ বা মুহতাসিবদের সাধারণ মুসলিমগণ দাওয়াহ বা হিসবাহকে জরুরি মনে করে না, কখনো তুচ্ছ জ্ঞান করে। এমনকি ফরজ হিসবাহ থেকেও নিজেকে গুটিয়ে রাখে, কারণ সে মনে করে তার আমল তার নাজাতের উসিলা হবে। ফলশ্রুতিতে সমাজে ফাসেকী প্রসার লাভ করে, যা মুসলিম সমাজের শান মোতাবেক না, এটাও অধ:পতনের একটি পরোক্ষ

কারণ। অধ:পতন যে হবে তা সুরা আসরেই স্পষ্ট। সুরা আসরের চারটি কাজের প্রথম দুটি আত্মসংশোধনমূলক আর বাকি দুটো অপর মুসলমানের হিদায়াত ও সংশোধন সম্পর্কিত। উম্মাহর অনেকেই প্রথম দুটির উপর থাকলেও, পরের দুইটি কাজের ব্যাপারে অতিমাত্রায় উদাসীন।
তাফসিরে এসেছে, "এ সুরায় মুসলমানদের প্রতি একটি বড় নির্দেশ এই যে, নিজেদের ধর্মকে কুরআন ও সুন্নাহর অনুসারী করে নেওয়া যতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি, ততটুকুই জরুরি অন্য মুসলমানদেরকেও ইমান ও সৎকর্মের দিকে আহ্বান করার সাধ্যমত চেষ্টা করা। নতুবা কেবল নিজেদের আমল মুক্তির জন্য যথেষ্ট হবে না, বিশেষত আপন পরিবার-পরিজন, বন্ধু -বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের কুকর্ম থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখা আপন মুক্তির পথ বন্ধ করার নামান্তর, যদিও নিজে পুরোপুরি সৎকর্মপরায়ণ ও হয়। এ কারণেই কোরআন ও হাদিসে প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি সাধ্যমত সংকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ ফরজ করা হয়েছে। এ ব্যপারে সাধারণ মুসলিম এমনকি অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি পর্যন্ত উদাসীনতায় লিপ্ত রয়েছে। তারা নিজেদের আমলকেই যথেষ্ট মনে করে নিয়েছে, সন্তান-সন্ততি কি করছে সেদিকে ভ্রুক্ষেপও নেই।"[৭১]
আম্মাজান হযরত আয়েশা (রা) হুজুর ﷺ কে জিজ্ঞেস করেন, দুনিয়াবাসীর উপর যদি আল্লাহর আজাব অবতীর্ণ হয় তবে দ্বীনদার লোকদের কোন ক্ষতির আশংকা রহিয়াছে কি? হুজুর ﷺ উত্তর করেন, দুনিয়াতে সকলেই সমানভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইবে। তবে আখেরাতে পূণ্যবান লোকেরা গোনাহগারদের নিকট হইতে পৃথক হইয়া যাইবে। এই কারণেই যাহারা নিজ দ্বীনদারীর উপর সন্তুষ্ট হইয়া লোক সমাজ হইতে গা ঢাকা দিয়া নির্জনে বসিয়া আছেন তাহারা যেন নিশ্চিন্তে না থাকেন।কারণ আল্লাহ না করুন! যদি পাপের দ্বারা আজাব আসিয়া পড়ে তবে উহার স্বাদ সকলকেই ভোগ করিতে হইবে।[৭২]

উম্মাহর সমস্ত মুসলিমকে নিজের আমলকে যথেষ্ট মনে করে সন্তুষ্ট থাকা হতে বিরত থাকতে হবে, নতুবা অধ:পতনের হাত থেকে বাঁচা দুষ্কর।

অনৈসলামিক কালচার

কোনো জাতিকে মানসিকভাবে পরাজিত করার জন্য এটাই যথেষ্ট যে তারা বিজাতীয় সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরবে। বর্তমানের মুসলিমরাও বিজাতীয় সংস্কৃতিকে নিজের মধ্যে ধারণ করে রাখছে, এটা তাদের পরাজিত মানসিকতার পরিচয় বহন করে। তাছাড়া ইসলাম এখন রাজনৈতিকভাবে বিজয়ী না, আর মানবসমাজ বিজয়ী শক্তির অনুসরণ করে– এটা মানুষের স্বভাবজাত আচরণ। এ কারণেও ইসলামবহির্ভূত কালচারে ছেয়ে গেছে আজকের মুসলিমদের পরিবেশ।

সাহাবায়ে আজমাইন ছিলেন এমন একটা জামাত যারা ইসলামকে পরিপূর্ণ ধারণ করেছিলেন, জাহেলিয়াতকে এমনভাবে বর্জন করেছিলেন যে তাতে আর কখনো ফিরেও তাকাননি। পূর্বের সকল রীতিনীতি-সংস্কৃতিকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে ইসলামের সংস্কৃতিকে ধারণ করেছিলেন। মুসলিমরা তাদের উত্তরসূরী, কিন্তু আফসোসের বিষয় সেই জাহেলিয়াতের সংস্কৃতিকে মুসলিমরা বরণ করে নিয়েছে, ইসলামিক কালচারকে অপমানজনক কিংবা আদিমকালের মনে করে তার অনুসরণ করা ছেড়ে দিয়েছে। এই ইসলামি সংস্কৃতিকে আমাদের কাছে নিয়ে এসেছেন প্রিয় রসুলﷺ। তাঁর ﷺ আনীত এই সংস্কৃতি দ্বীন ইসলামের অংশ, তা দ্বীনের বাইরে নয়। মুসলিমরা এটাকে দ্বীনের অংশই মনে করছে না, কেননা তার ইলম স্বল্প। তার ইলমে এটা নেই যে বিধর্মীদের সাদৃশ্য অবলম্বন না করা ইমানের দাবি। আসলে, বিজাতীয় সংস্কৃতিকে ধারণ করলে অন্য ধর্মের অনুসরণ করা হয়। আর এটা ইমানের দাবির বিপরীত। ইমানের একাদশ দাবি, 'বিধর্মীদের সাদৃশ্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকা......খৃস্টানের মতো হতে চাওয়া, ইহুদিদের মতো হতে চাওয়া, হিন্দুর মতো হতে চাওয়া, এটা এক প্রকার কুফর। ইমানের দাবি, অমুসলমানদের সাথে আমার কোনো সাদৃশ্য হবে না'[৭৩] ইমানের এই দাবিকে তোয়াক্কাই করে না মুসলিমরা, নিজের অজান্তেই কুফর করে ফেলছে তারা। তারা সেই বিজাতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, আর ইসলামের মধ্যে গণ্য হবে না। হাদিসে এসেছে,

من تشبه بقوم فهو منهم

যে জাতি কোনো বিজাতির সাদৃশ্য গ্রহণ করলো, বিজাতির বৈশিষ্ট্য ধারণ করলো, বিজাতির প্রতীক ব্যবহার করলো, বিজাতির পরিচয়-চিহ্ন গ্রহণ করলো, সে ব্যক্তি ঐ বিজাতির অন্তর্ভুক্ত। [৭৪]

বিষয়টি কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বুঝতে হলে রসুল ﷺ এর নির্দেশনা থেকে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। আশুরার দিন ইহুদিরা রোজা রাখলে রসুল ﷺ আরো একদিন বেশি রোজা রাখার কথা ব্যক্ত করেছিলেন, আবার ইহুদিরা পবিত্রতা নষ্ট হবে এমন চিন্তা থেকে ইবাদতখানায় জুতা পরে প্রবেশ করে না বলে নবিজি ﷺমুসলিমদেরকে মসজিদে পরিচ্ছন্ন জুতা পরে ঢুকতে বলেন। ইহুদিরা চুল সাদা রাখে বলে মুসলিমদেরকে চুল রঙিন করার নির্দেশ দেন। অর্থ্যাৎ ইবাদত থেকে সংস্কৃতির সমস্ত বিষয়ে তাদের সাথে বৈসাদৃশ্য করতে হবে, কোনো সাদৃশ্য অবলম্বন করা যাবে না। আর সাহাবিরা তার পরিপূর্ণ অনুসরণ করেছেন। তারা একে ইমানের সাথে যুক্ত করতেন। কেননা, নবীজি ﷺ পোশাকেও পার্থক্য করতে বলেছেন,

إن هذه من ثياب الكفار، فلا تلبسها

এই পোশাক কাফেরদের, তুমি এটা পরো না।[৭৫]

পোশাক হলো সংস্কৃতি ও সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এর মাধ্যমে মানুষের মনোভঙ্গি ও চিন্তাচেতনা ফুটে উঠে। নবীজির ﷺ শিক্ষা এই যে – যে পোশাক কাফেরের বৈশিষ্ট্য, তার অনুকরণ ত্যাগ করা। বিপরীতভাবে যে পোশাককে ধারণ করে সেই পোশাক তার মন-মগজে প্রভাব ফেলে, তার চিন্তা চেতনায় সেই জাতির আদর্শকে লালন করে। বর্তমানে মিডিয়ার সংস্পর্শে এসে বিজাতীয় কৃষ্টি-সংস্কৃতি মুসলিম সমাজে প্রচার হয়ে তা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, এমনকি এটাকে তারা সানন্দে গ্রহণ করেছে। এটাকে তারা ইমানের জন্য ক্ষতিকর-ও ভাবে না। এভাবে চিন্তাগতভাবেও কাফেরদেরকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে নীরবে মেনে নেয় মুসলিম সমাজ। মুসলিম উম্মাহকে মানসিকভাবে, চিন্তাগতভাবে পরাজিত মানসিকতার অধিকারী করতে পারার বিষয়টি সংস্কৃতির ময়দানে কুফফারদের সফলতা আর আমাদের অধ:পতনের চিহ্ন বহন করে। আবার কুফরি রাষ্ট্রে বসবাস করতে গিয়ে তাদের অনুসরণ -অনুকরণ করাও মুসলিমদের স্বভাবজাত আচরণ হয়ে গেছে। এটার ব্যাপারেও হাদিসে পৃথকভাবে বলা হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন:

مَنْ بَنَى بِبِلادِ الْمُشْرِكِينَ, وَصَنَعَ نَيْرُوزَهُمْ وَمِهْرَجَانَهُمْ, وَتَشَبَّهَ بِهِمْ حَتَّى يَمُوتَ (وَهُوَ كَذَلِكَ حُشِرَ مَعَهُمْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"যদি কোনো ব্যক্তি মুশরিকদের দেশে বাড়িঘর বানায় (স্থায়ী বসবাস করতে থাকে), তাদের নববর্ষ ও উৎসবাদি পালন করতে থাকে, তাদের অনুকরণ করতে থাকে এবং এভাবেই তাদের অনুকরণের মধ্যে তার মৃত্যু হয় তবে তাদের সাথেই কিয়ামদের দিন তাকে পুনরুত্থিত ও একত্রিত করা হবে।" [৭৬]

পুরুষরা-ও পশ্চিমা ধাঁচের পোশাককে অফিসিয়াল পোশাক হিসেবে পরিধান করে বেশিরভাগ মুসলিমরাই। নারীরাও বিজাতীয় সংস্কৃতি দেখে উদ্ধুদ্ধ হয়ে পুরুষালি পোশাকে অভ্যস্ত। আচার-আচরণ, বেশ-ভূষায় বিজাতীয় কালচারের প্রভাবে মুসলিমসমাজে বেপর্দার ছড়াছড়ি।

উল্লেখ্য, আসবাবপত্রের ক্ষেত্রেও বৈসাদৃশ্য রাখার ব্যাপারে হাদিসে এসেছে। তাহলে বিষয়টি কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা উপলব্ধি করা যায়। কোনোপ্রকারেই কাফের-মুশরিক-ফাসেকদের অনুকরণ ও অনুসরণ করা যাবে না। কেননা এর প্রভাব পড়ে মন-মগজে, পরবর্তীতে ইমানের জন্যও হয় ক্ষতিকর। জাতিগতভাবে নিজেদের স্বাতন্ত্র্যবোধ ও স্বকীয়তাকে হারাবে উম্মাহ, এটাও উম্মতের অধ:পতনের পিছনে দায়ী।

পাথেয় ছাড়া সফর

সফরের জন্য মুসাফির মাত্রই পাথেয় যোগাড় করে। সেই পাথেয় তার পুরো সফরে উপকারে আসে, তা আত্মরক্ষা কিংবা নির্ঝঞ্ঝাট সফরের জন্য। আখেরাতের এই লম্বা সফরের জন্য আমাদেরও পাথেয় দরকার যার নির্দেশনা কুরআন – হাদিসে এসেছে। হক-বাতিলের দ্বন্দে হককে বিজয়ী করতে পাড়ি দিতে হবে কন্টকাকীর্ণ পথ। কুফফারদের বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন; সামরিক আগ্রাসনের মুখে দরকার এমন কিছু পাথেয় যা তাকে শক্তি যোগাবে, হিম্মত দিবে কুফরি শক্তির মোকাবেলায়। তাকওয়া, ইলম, তাওয়াক্কুল, ইয়াক্বীন, দুনিয়ার উপর আখিরাতের প্রাধান্য, সবর, শোকর -এসকল পাথেয়।

তাকওয়াকে মুসলিম জাতির শক্তির প্রথম ভিত্তি বলা হয়েছে। এটিই মুসলিমদের এক মজবুত ভিত যার উপর পুরো উম্মাহর অস্তিত্বের সম্পর্ক।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوۡتُنَّ اِلَّا وَاَنۡتُمۡ مُّسۡلِمُوۡنَ

হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর। এবং তোমরা আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।(৩:১০২)

সবর করার মাধ্যমেই আসবে আল্লাহর সাহায্য, তাই এই পাথেয় ছাড়া সাহা আল্লাহকে পাওয়া যাবে না। নবীজি ﷺ বলেন, "যে ধৈর্য ধরার চেষ্টা করে, সে তার কাজে আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্ত হয়।"[৭৭]

ইলমের অভাবেই জাহেলিয়্যাতের মুখোশপড়া ভদ্ররূপকে বাতিল গণ্য করতে পারে না উম্মাহ। ফলে শত্রুর ফাঁদে পা দিয়ে নিজেই বিপদে পড়ে। তাকওয়া কিভাবে করা সম্ভব,কোনটি হালাল কোনটি হারাম,শরিয়তের সীমারেখা কতটুকু, তাওয়াক্কুল কখন কিভাবে করতে হবে -এসবের জন্য ইলম প্রয়োজন।

তাওয়াক্কুল করাই সত্যিকার মুমিনের বৈশিষ্ট্য। আসবাবের জোরে নয় বরং আল্লাহর উপর ভরসাই শত্রুদের শক্তির মোকাবেলায় যথেষ্ট। তাওয়াক্কুল না থাকলে শত্রুর সামর্থ্যের দিকে তাকালে বাতিলের ভয় হৃদয়ে চলে আসে।

ইয়াক্বীনের ফলেই পূর্ববর্তী উম্মত পরিশুদ্ধ হয়েছিলো। মুসলিম জামাত যদি কথা ও কাজে ইয়াকীনের অভাবে ভোগে তবে মুনাফিকদের একটি ফিরকায় পরিণত হবে যারা দৃঢ় বিশ্বাসের পরিবর্তে সন্দেহ পোষণ করে।

কৃতজ্ঞতা আদায় করাও পাথেয় । একই আয়াতাংশ বহুবার এসেছে...

اِنَّ فِیۡ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لِّکُلِّ صَبَّارٍ شَکُوۡرٍ
এতে তো নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক পরম ধৈর্যশীল ও পরম কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য। (১৪:০৫)

নিয়ামত স্মরণ করানোর পর বার বার لعلکم تشکرون 'যাতে করে তোমরা কৃতজ্ঞতা কৃতজ্ঞতা আদায় করো কিংবা افلا تشکرون তবুও কি তোমরা শুকরিয়া করবে না? -এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কুরআনে।

দুনিয়ার উপর আখিরাতকে প্রাধান্য না দিলে কখনোই সফল হতে পারবে না, থাকবে নিকৃষ্টদের দলে। 'রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِنَّ مِنْ شِرَارِ أُمَّتِي الَّذِينَ غُذُوا بِالنَّعِيمِ الَّذِينَ يَطْلُبُوْنَ أَلْوَانَ الطَّعَامِ وَأَلْوَانَ

الثِّيَابِ يَتَشَادَقُوْنَ بِالْكَلَامِ

"আমার উম্মতের মধ্যে নিকৃষ্ট লোক তারা যারা ভোগ-বিলাসে ডুবে থাকে, রঙ-বেরঙের পোশাক ও খাবার খুঁজে বেড়ায় ও দম্ভভরে কথা বলে।"[৭৮]

بَلۡ تُؤۡثِرُوۡنَ الۡحَیٰوۃَ الدُّنۡیَا ۫ۖوَ الۡاٰخِرَۃُ خَیۡرٌ وَّ اَبۡقٰی ؕ
বরং তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে থাক।অথচ পরকালের জীবনই উত্তম ও চিরস্থায়ী। (৮৭:১৬-১৭)
ইবনুল কাইয়্যিম আরো বলেন, "দুনিয়ার প্রতি বান্দার ভালোবাসা ও আগ্রহ হলো আল্লাহর আদেশ পালন ও আখিরাত কামনায় গড়িমসি করার সমানুপাতিক।" ইসলামের বিজয় আনতে যত কুরবানি প্রয়োজন, তা দুনিয়াবিমুখিতা ছাড়া অসম্ভব।

এই পাথেয়র অভাব থাকলে সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে।[৭৯] যেসব মুমিন দুনিয়া ভালোবাসে, তাদের তিরস্কার করে কুরআন বলে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّا قَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ .

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কী হলো যে, যখন তোমাদের আল্লাহর পথে বের হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়, তখন তোমরা আরো জোরে মাটি কামড়ে ধরো? তোমরা কি আখিরাতের স্থলে দুনিয়ার জীবনকেই বেশি পছন্দ করো? আখিরাতের তুলনায় পার্থিব জীবনের ভোগ-সামগ্রী তো অতি সামান্য।"(৯:৩৮)

আল ওয়াহহান

মুসলিম উম্মাহর অধঃপতনের এ কারণটি সরাসরি হাদিসে এসেছে। এই কারণটির মধ্যে উম্মত যে শামিল হবে তা সুস্পষ্ট এবং বর্তমানে এর বাস্তবতা দৃশ্যমান। হাদিসটি....

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ السَّلاَمِ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يُوشِكُ الأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا " . فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ " بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهَنَ " . فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهَنُ قَالَ " حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ " .

সাওবান (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ খাদ্য গ্রহণকারীরা যেভাবে খাবারের পাত্রের চতুর্দিকে একত্র হয়, অচিরেই বিজাতিরা তোমাদের বিরুদ্ধে সেভাবেই একত্রিত হবে। এক ব্যক্তি বললো, সেদিন আমাদের সংখ্যা কম হওয়ার কারণে কি এরূপ হবে? তিনি বললেনঃ তোমরা বরং সেদিন সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে; কিন্তু তোমরা হবে প্লাবনের স্রোতে ভেসে যাওয়া আবর্জনার মত। আর আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের অন্তর হতে তোমাদের পক্ষ হতে আতঙ্ক দূর করে দিবেন, তিনি তোমাদের অন্তরে আলওয়াহহান ভরে দিবেন। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! 'আল-ওয়াহ্হান' কি? তিনি বললেনঃ দুনিয়ার মোহ এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা। [৮০]

বর্তমানে উম্মতের সংখ্যা অনেক, তবুও সর্বত্র অত্যাচারিত, নিপীড়িত, শোষিত ও শাসিত হওয়ার পিছনে দায়ী এই আল ওয়াহহান। দুনিয়াপ্রীতি দিয়ে ভরপুর আজ উম্মাহর অধিকাংশের হৃদয়। দুনিয়াবি যশ-খ্যাতি, উন্নয়ন ও বিলাসিতাকে ধারণ করে হৃদয় থেকে আখিরাতের ফিকির কমে গেছে। এই সুযোগে কুফরি শক্তি একত্রিত হয়ে জাতিসংঘ ও ন্যাটোর মতো একত্রে উম্মাহর বিরুদ্ধে লড়াই করছে। কুফফারদের ভোগবাদী ও বস্তুবাদী মানসিকতাকে উম্মতের মাঝে কৌশলে ঢুকিয়ে দিয়ে তারা মুসলিমদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে, তাই উম্মাহ সর্বত্র মার খাচ্ছে। মুসলিম ভূমিগুলো কুফরি শক্তি নিয়ন্ত্রণ করছে।
কারুনের ধনসম্পদের প্রাচুর্য দিয়ে প্রদর্শনী দেখে দুর্বল ইমানওয়ালারা দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল, এবং এই জাঁকজমককেই সৌভাগ্যের উপকরণ মনে করেছিল।
فَخَرَجَ عَلٰى قَوۡمِهٖ فِىۡ زِيۡنَتِهٖ‌ؕ قَالَ الَّذِيۡنَ يُرِيۡدُوۡنَ الۡحَيٰوةَ الدُّنۡيَا يٰلَيۡتَ لَنَا مِثۡلَ مَاۤ اُوۡتِىَ قَارُوۡنُ ۙ اِنَّهٗ لَذُوۡ حَظٍّ عَظِيۡمٍ

কারূন তার সম্প্রদায়ের সম্মুখে জাঁকজমক সহকারে বের হল। যারা পার্থিব জীবন কামনা করত তারা বলল, 'আহা! কারূনকে যা দেওয়া হয়েছে সেরূপ যদি আমাদেরও থাকত; প্রকৃতই সে মহা ভাগ্যবান।'(২৮:৭৯) তারপর তাকে ধ্বসিয়ে দেওয়া হলে তারাই কৃতজ্ঞতাস্বরূপ বলে...

وَاَصۡبَحَ الَّذِیۡنَ تَمَنَّوۡا مَکَانَہٗ بِالۡاَمۡسِ یَقُوۡلُوۡنَ وَیۡکَاَنَّ اللّٰہَ یَبۡسُطُ الرِّزۡقَ لِمَنۡ یَّشَآءُ مِنۡ عِبَادِہٖ وَیَقۡدِرُ ۚ لَوۡلَاۤ اَنۡ مَّنَّ اللّٰہُ عَلَیۡنَا لَخَسَفَ بِنَا ؕ

পূর্বদিন যারা তার (মত) মর্যাদা কামনা করেছিল তারা বলতে লাগল, 'দেখ, আল্লাহ তাঁর দাসদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা তার রুযী বর্ধিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা তা হ্রাস করেন। <u>যদি আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করতেন, তবে আমাদেরকেও তিনি মাটিতে ধসিয়ে দিতেন।</u>'(২৮:৮২) কেবলমাত্র দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার ফলে তারা ভয় করেছিলেন কারুনের মতো পরিণতির। এই ঘটনা কুরআনে তুলে ধরার দ্বারা মুসলিম উম্মাহকে আল্লাহ সতর্ক করেছেন, কিন্তু তারা কেবল আকৃষ্ট হয়ে ক্ষান্ত হয়নি বরং তা অর্জনের পিছনে প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে। অথচ যারা মজবুত ইমানের অধিকারীরা কারুনের সম্পদ দেখে একদল আফসোস করলে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠে....

وَقَالَ الَّذِیۡنَ اُوۡتُوا الۡعِلۡمَ وَیۡلَکُمۡ ثَوَابُ اللّٰہِ خَیۡرٌ لِّمَنۡ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۚ وَلَا یُلَقّٰہَاۤ اِلَّا الصّٰبِرُوۡنَ

আর যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল তারা বলল, 'ধিক্ তোমাদের! যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, তাদের জন্য আল্লাহর পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ। আর ধৈর্যশীল ব্যতীত তা অন্য কেউ পায় না।'(২৮:৮০)

অর্থ্যাৎ, যারা জ্ঞানী তারা আখিরাতের কথা স্মরণ করে। কিন্তু দুনিয়ার মোহে আচ্ছন্নদের কাছে আখিরাতের ফিকির কম থাকে। দুনিয়ার মহব্বত তার দিলে প্রকট হওয়ায় আখিরাতের সাফল্য ও চিরস্থায়ী কল্যাণের প্রতি আকর্ষণ কমে যায়। *আবু বকর রাদিআল্লাহ আনহু বলেন, "আখেরাতকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দাও, উহাকে মহব্বত করো। কেননা এই দুয়ের যে কোন একটির সহিত মহব্বতের দ্বারা অপরটির প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি হয়।"*[৮১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দুটি ক্ষুধার্ত বাঘকে মেষ-বকরির পালের মধ্যে ছেড়ে দিলে ততটুকু ক্ষতিসাধন করে না, যতটুকু কোনো ব্যক্তির ধনসম্পদের মোহ ও মর্যাদার লালসা তার <u>দ্বীনের ক্ষতি</u> করে থাকে।[৮২]

'রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

سَيَكُوْنُ نَشْرٌ مِّنْ أُمَّتِي يُوْلَدُوْنَ فِي النَّعِيمِ وَيُغْذَوْنَ بِهِ هِمَّتُهُمْ أَلْوَانُ الطَّعَامِ وَأَلْوَانُ الثِّيَابِ يَتَشَدَّقُوْنَ بِالْقَوْلِ أُولَئِكَ شِرَارُ أُمَّتِي

"অচিরে আমার উম্মতের মধ্যে একটি শ্রেণির বিকাশ ঘটবে যারা প্রাচুর্যের মধ্যে জন্ম নেবে ও তাতেই পরিপুষ্টি লাভ করবে; তাদের সকল কর্মপ্রচেষ্টার লক্ষ্য হবে রকমারি খাবার ও রঙ-বেরঙের পোশাক লাভ করা, আর ওরা কথা বলবে দম্ভভরে-ওরা হলো আমার উম্মতের নিকৃষ্ট অংশ।" [৮৩]

দুনিয়ার মোহে আচ্ছন্ন হৃদয়ে শাহাদাতের তামান্না স্থান পায় না, মৃত্যুর ভয়ে পূর্ণ হয় মুসলিমদের অন্তর। তাই কুফফারদের উপর্যুপরি আক্রমণের পরেও মৃত্যুর ভয়ে জিহাদে অবতীর্ণ হয় না, নিজেদের মুমিন ভাইদের রক্ষা করতে এগিয়ে যায় না। এ কারণে লাঞ্ছনা চেপে বসেছে উম্মতের উপর। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: যখন তোমরা বাইয়ে ঈনাহ বা সূদভিত্তিক ক্রয়-বিক্রয় শুরু করবে, গরুর লেজ ধারণ করে থাকবে, অর্থাৎ কৃষি কাজ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে আর জিহাদ ছেড়ে দেবে তখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে লাঞ্ছনায় পতিত করবেন; আর এ লাঞ্ছনা দূর হবে না যতক্ষণ না তোমরা নিজেদের সঠিক দীনের দিকে ফিরে আসবে।[৮৪]

দ্বীনের জন্য কুরবানি না করা

'মিল্লাতে ইবরাহিম' এর উপর ভিত্তি করে আছে দ্বীন ইসলাম। পিতা ইবরাহিম (আ) এর দ্বীনের জন্য কুরবানি কত উত্তম। আল্লাহর জন্য নিজের পরিবার, দেশ ছেড়ে পাড়ি দিয়েছেন বহুদূর পথ। সন্তান লাভের পর কাছে-ও রাখতে পারেননি, কেবলমাত্র রবের হুকুম মানতে গিয়ে। তার নফসের চাওয়াকে বড় করে দেখেননি। শেষে পিতাপুত্রের দীর্ঘবিরহের পর মিলনের সময় 'সন্তানকে আল্লাহর হুকুমে জবাই করা ছিল তার নফসকে দমিয়ে রেখে আল্লাহর হুকুমের পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রদান করতঃ ছুরি চালানো। কত আশ্চর্যের বিষয়! আল্লাহর হুকুমকে এভাবেই মাথা পেতে মানতে হয়। উম্মতের জন্য এই দৃষ্টান্তকে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবেই দ্বীনের জন্য পেশ করতে হয় কুরবানি। প্রিয় বস্তুকে বাদ দিয়ে মনোনিবেশ করতে হবে মালিকের হুকুম মানার দিকে। মুসলিম উম্মাহর কামনা-বাসনার অনুযায়ী জীবন চালানোর ফলে ভুলতেই বসেছে দ্বীনের জন্য কুরবানি করার ইতিহাস। তাদের নিকট কুরবানির ঈদ কেবলই একটি আচার-অনুষ্ঠানের এর ন্যায়। বরং এটি একটি ইবাদত ও এর অন্তর্নিহিত শিক্ষাকে নিজেদের মাঝে ধারণ করতে হবে- এটা উম্মাতের মাঝ থেকে হারিয়ে গেছে। ঘটনা সবাই জানে, তবে সে অনুযায়ী দ্বীনের জন্য ত্যাগ করার মানসিকতা তৈরি করতে বরাবরই গাফিলতি করা উম্মাহকে বিপদে ফেলবেই, হোক ইমানের বিষয়ে কিংবা দ্বীনের শুরু কোনো বিষয়ে। যতবার উম্মাহ নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে

দ্বীনের জন্য ত্যাগ করা বন্ধ করে দিয়ে পার্থিব জীবনের সুখ নিয়ে মেতে উঠেছে, ইতিহাস সাক্ষী দেয় ততবারই তারা বিপর্যস্ত হয়েছে।

নফসের গোলামি

'নাফস' হলো আত্মা। আত্মা কলুষিত হলো পুরো সত্তাটাই কলুষিত হয়ে পড়ে। তখন সে হয় বেপরোয়া, নাফরমান, অন্যায়কারী, যালিম, ব্যাভিচারী ইত্যাদি। অর্থ্যাৎ সীমালঙ্ঘন করার জন্য না উচিত ছিল নফসের দাস হওয়াই যথেষ্ট। মুমিনের উচিত ছিল নফসে লাগাম পড়ানো, নফসকে শাসন করা। পাশ্চাত্য উন্নতির মূলকথা হলো, নফসকে খুশি করার যোগ্যতা বৃদ্ধি পাওয়া। সীমাহীন খায়েশ ও চাহিদা পূরণ করতে পারা। কিন্তু ইসলাম কামনা-বাসনা ও চাহিদা সীমাহীন হওয়ার স্বীকৃতি দেয় না, নফসকে তিরস্কার করা ও নিয়ন্ত্রণে রাখার নির্দেশ দেয়।

ইমাম গাজালি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, একজন মুসলমানের সবচেয়ে বড়ো ক্ষতিকর দিক হলো, মুহাসাবাহ ও আত্মবিচার না করা, নিজের জীবনকে অবাধ ও উন্মুক্ত অবস্থায় ছেড়ে দেয়া এবং কুপ্রবৃত্তির হাতে ইচ্ছার রশি তুলে দেয়া। এগুলো মানুষকে তার চূড়ান্ত ধ্বংস ও চরম অশুভ পরিণতির দিকে নিয়ে যায়[৮৫] কাউকে দ্বীনের দাওয়াত দিলে ইসলামকে সত্য দ্বীন বুঝে-ও একমাত্র নাফসের কথায় ইমান আনতে পারে না। কোনো মুসলিম নেককাজে অগ্রসর হলে তার নফস তাকে বাধা দেয়। অন্যায়কাজে প্ররোচনা-ও দেয় এই নাফস। নাফসই তাকে আখিরাতের কথা ভুলিয়ে রাখে, দুনিয়ার আরাম আয়েশে নিমজ্জিত করে রাখে।

اِنَّ النَّفۡسَ لَاَمَّارَۃٌۢ بِالسُّوۡٓءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّیۡ ؕ اِنَّ رَبِّیۡ غَفُوۡرٌ رَّحِیۡمٌ

মানুষের নফস অবশ্যই মন্দকর্ম প্রবণ, কিন্তু সে নয় যার প্রতি আমার প্রতিপালক দয়া করেন। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'(১২:৫৩)

নাফসের কয়েকটি অবস্থা – নাফসে আম্মারা, নাফসে লাওওয়ামা, নফসে মুতমাইন্নাহ। নফসে লাওওয়ামার শপথ করেছেন স্বয়ং আল্লাহ এবং এর দ্বারা বুঝে আসে নফসকে তিরস্কার না করলে পরকালে কঠোর জবাবদিহির মুখোমুখি হতে হবে। এই নাফসের গোলামি থেকে মুক্ত না হতে পারলে নফসই তার উপর সাওয়ার হবে। মিসইয়ার ইবনে কিদাম রাহিমাহুল্লাহ বলতেন, যে ব্যক্তির কাছে তার নিজের নফসই বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায়, তার ওপর তার নফস সওয়ার হয়ে বসে।[৮৬]

সামরিক আগ্রাসনের চেয়েও মুসলিম জাতিকে ধ্বংস করার জন্য কাফিররা যেসব উপকরণ ব্যবহার করেছে তার মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর হলো অবাধ যৌনতা, অশ্লীলতা। যৌনতা আর অশ্লীলতার এই নব্য জাহিলিয়াত ১৪০০ বছর আগের

জাহিলিয়াতকেও হার মানিয়েছে।[৮৭] এই জাহিলিয়াতের আগ্রাসনের শিকার হওয়ার প্রধান একটি কারণ নফসের গোলামি। এই কারণেই কুফরি শক্তি তাদের টার্গেট অনুসারে উম্মতকে ফিতনায় ফেলতে পারছে। মুসলিম তরুণ-তরুণীরা এতেই গা ভাসিয়ে দিচ্ছে, নফস যেন লাগামছাড়া পশুর ন্যায় কিংবা তাঁর চেয়েও নিকৃষ্ট অবস্থা। একসময় গো তারা ইসলামের হারামকৃত বিষয়কে হালাল ভাবতে শুরু করে, সংবেদনশীলতা কমে যায়।

নফস যখন বেপরোয়া হয় তখন মানুষ কামনা-বাসনা অনুযায়ী জীবন চালায়। আল্লাহ তখন বিপদ-আপদ দেন। হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যদি বিপদাপদ ও দুর্ভিক্ষের দিনগুলো না আসত, তবে কেউ কখনো নিজেদের নফসকে শাসন ও পরাস্ত করত না। বরং তাকে নিজের মতো করে ছেড়ে দিয়ে তার কামনা-বাসনা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করত।[৮৮] আত্মাকে শাসন না করলে সেই নফস আল্লাহর হুকুমের অবাধ্যতা করে ও তার নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হয়। অথ্যাৎ মুসলিমরা আত্মার শাসন না করার ফলে আত্মা বা নফসের গোলামিতে লিপ্ত। কাতাদা রাযি. বলতেন, আত্মাকে যখন তুমি প্রশিক্ষণ দেবে তখন তার চেয়ে অনুগত আর কিছু দেখবে না। আর যখন প্রশিক্ষণ ছাড়া তাকে নিজের মতো চলতে দেবে, তখন (আদেশ পালনে) তার মতো দুর্বল ও অবাধ্য আর কাউকে দেখবে না।[৮৯] মুসলিমরা নফসের কথামতো নিজের জীবনকে চালাতে থাকলে কখনোই আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্য করতে পারবে না। এর বিপরীতে আল্লাহর অবাধ্যতা করে নিজের দুনিয়া আখিরাত বরবাদ করে মুসলিমরা। এর কারণ মুসলিমরা নিজের নফসের ব্যাপারে সুধারণা রাখে, আংশিক দ্বীন পালন করেই মনে করে নফস তার নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু সত্য হলো-'নিজেদের নফসের ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। সুধারণার সুযোগে নফস আমাদেরকে নিয়ে এমন এমন কাজ করাবে, যা বাহ্যত ভালো মনে হলেও পরিণামে অনেক অশুভ ফল বয়ে আনবে।'[৯০]

জানমাল খরচ না করা

উম্মাতে ইসলামিয়্যাহর ফিতনা হলো মাল। হযরত কা'ব ইবনে ইয়ায (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, প্রত্যেক উম্মতের জন্য কোনো একটি ফিতনা বা পরীক্ষামূলক বিষয় রয়েছে আর আমার উম্মতের ফিতনা হলো মাল।[৯১]; তিরমিজি কুরআনে বহু জায়গায় জানমাল খরচ করতে বলা হয়েছে। যতবার আল্লাহ মাল খরচ করতে বলেছেন অধিকাংশ সময়েই আমি তোমাদের যে রিযিক দিয়েছি তা হতে আমারই পথে খরচ করো' -এই ভঙ্গিতে এসেছে। বান্দাকে

স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে-এই মাল তোমার রব দিয়েছেন, সুতরাং তুমি আল্লাহর পথে খরচ করো।

দুনিয়ার মোহে আচ্ছন্ন উম্মাহ সম্পদ খরচ করতে আগ্রহী দুনিয়াবি ভোগ-বিলাসিতায় কিংবা গুনাহের কাজে। অথচ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা লোকের সংখ্যা খুবই নগণ্য। মিশনারিরা যখন দাওয়াহ দিতে কোনো দেশে যায়, তাদের সাথে থাকে প্রচুর ফান্ড যা তারা তাদের বাতিল ধর্ম প্রচারে ব্যয় করে। অথচ উম্মাহর উচিত ছিল তার হক ধর্মকে, দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করতে কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী মাল খরচ করা। মিশনারিরা নিজেদের ভবিষ্যৎ কি হবে তার চিন্তা না করে দারিদ্যপীড়িত দেশে সারাজীবন কাটাতে রাজি হয়ে যায়। উম্মাহ তার বাতিল ও হক দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করতে সামান্যতম জানের কষ্ট করতে নারাজ, সর্বত্র বিলাসিতা-আরামে কাটাতে চায়। দাওয়াহর সফরে চায় এসিযুক্ত যানবাহন, তা নাহলে চলবে না-এমন মনোভাব। কিন্তু সাহাবীরা(রা) তাদের জান-মাল পুরোদমে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করেছেন, নিজের আয়েশের দিকে নজর দেননি। জিহাদের ময়দানে জান খরচ করেছেন; কেউ হত্যা করেছেন, কেউ-বা শাহদাতকে বরণ করেছেন। এভাবে জান-মানের বিনিময়ে জান্নাত ক্রয় করেছেন।

اِنَّ اللّٰهَ اشۡتَرٰی مِنَ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ اَنۡفُسَہُمۡ وَاَمۡوَالَہُمۡ بِاَنَّ لَہُمُ الۡجَنَّۃَ

নিঃসন্দেহে আল্লাহ বিশ্বাসীদের নিকট থেকে তাদের জান ও তাদের ধন-সম্পদসমূহকে জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন(৯:১১১)

অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে জান-মাল খরচ করা অজ্ঞতা নয় বরং তাই প্রকৃত জ্ঞানীর কাজ। সাহাবায়ে কেরাম(রা) তাদের সম্পদ অকাতরে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করেছেন। দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে জান-মাল উভয়কেই খরচ করেছেন। দ্বীনের সাহায্য করেছেন, ফলে আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করেছেন। দ্বীনকে বিজয়ী করতে জান-মাল খরচ করেছেন, ফলে আল্লাহ তাদেরকে জয়যুক্ত করেছেন।

یٰۤاَیُّہَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِنۡ تَنۡصُرُوا اللّٰہَ یَنۡصُرۡکُمۡ وَیُثَبِّتۡ اَقۡدَامَکُمۡ

হে মুমিনগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর তবে আল্লাহও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা সুদৃঢ় করে দেবেন।(৪৭:০৭)

মুসলিম উম্মাহ আজ মিছে দুনিয়ার চাকচিক্যে ডুবে দুনিয়াবি উদ্দেশ্যে সফলতা কিংবা উন্নতির জন্য মাল খরচ করে। কুরআনবিমুখতার কারণে এতবার খরচ করার আয়াত উল্লেখ করা-ও তার কাজে আসে না, কিংবা তাকে খরচ করার ব্যাপারে নসিহত করলেও 'সে জীবনে কখন কোনসময় হয়তো দ্বীনের জন্য খরচ করেছে' তার প্রসঙ্গ তুলে নিজের দান করার উদাহরণ পেশ করে, কিন্তু সাহাবিদের মতো যে আরো অধিক খরচের পানে অগ্রসর হতে পারে না।

কৃপণতা হলো দানের বিপরীত। কৃপণ ব্যক্তি নিজের জন্য খরচে কমতি করে না, তবে অপরের জন্য খরচ করতেই তার বাঁধে। সাহাবিদের জন্য বিষয়টি বিপরীত। নিজের জন্য কৃপণতাকে, আর দ্বীনের জন্য ও মুমিন ভাইয়ের জন্য খরচ করাকেই নির্ধারণ করতেন। মুসলিম উম্মাহ খরচ করার নজিরগুলোকে নিজেদের মাঝে ধারণ করতে পারেনি, বরং খরচ না করে কৃপণতার পরিচয় দিচ্ছে। কৃপণতার চরমে পৌঁছানোর ফলে মুসলিম উম্মাহ ধ্বংস হবে, কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

صَلَاحُ أَوَّلِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالزُّهْدِ وَالْيَقِيْنِ وَ يُهْلَكُ آخِرُهَا بِالْبُخْلِ وَالْأَمَلِ

"এই উম্মতের প্রথম অংশটি পরিশুদ্ধি লাভ করেছে দুনিয়া-বিরাগ ও দৃঢ় ঈমানের মাধ্যমে, আর শেষ অংশটি ধ্বংস হবে কৃপণতা ও দীর্ঘ আশার ফলে।"[৯২]

ভুল প্রায়োরিটি লিস্ট

ইমানের সার্বিক বিষয়টাই প্রাধান্যের সঙ্গে। প্রাধান্য দেওয়ার মাপকাঠি নির্ধার কারণ করা হয়েছে স্বয়ং আল্লাহর কালাম দ্বারা। কুরআনে এসেছে...

قُلۡ اِنۡ كَانَ اٰبَآؤُكُمۡ وَاَبۡنَآؤُكُمۡ وَاِخۡوَانُكُمۡ وَاَزۡوَاجُكُمۡ وَعَشِيۡرَتُكُمۡ وَاَمۡوَالُ ۨاقۡتَرَفۡتُمُوۡهَا وَتِجَارَةٌ تَخۡشَوۡنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرۡضَوۡنَهَاۤ اَحَبَّ اِلَيۡكُمۡ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوۡلِهٖ وَجِهَادٍ فِىۡ سَبِيۡلِهٖ فَتَرَبَّصُوۡا حَتّٰى يَاۡتِىَ اللّٰهُ بِاَمۡرِهٖ‌ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهۡدِى الۡقَوۡمَ الۡفٰسِقِيۡنَ

বল, ‘তোমাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, স্ত্রী ও আত্মীয়গণ, অর্জিত ধনরাশি এবং সেই ব্যবসা-বাণিজ্য তোমরা যার অচল হওয়ার ভয় কর এবং প্রিয় বাসস্থানসমূহ যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ, তাঁর রসূল ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় হয়, তাহলে আল্লাহর আদেশ(বা শাস্তি) আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। বস্তুতঃ আল্লাহ পাপী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।’(৯:২৪)

অস্যাৎ এই ৮টি বস্তুর মতো যত বিষয় আছে সমস্ত কিছুর চাইতে প্রিয় হতে হবে আল্লাহ, তাঁর রসুল ﷺ ও তাঁর রাস্তায় জিহাদ। তা না হলে আল্লাহর নির্ধারিত আযাবের হুশিয়ারি এসেছে। বর্তমান মুসলিমদের কাছে বরং আল্লাহ, তাঁর রসুল ﷺও তাঁর রাস্তায় জিহাদ করার চেয়ে এইসকল বস্তুই অধিক প্রিয়। তারা কুরআনের এই আয়াতের কথা ব্যক্ত করা আল্লাহর নির্দেশ’ তথা আযাবের যোগ্য। এটা উম্মাহর অধঃপতনের বড় অথচ উপেক্ষিত একটি কারণ।

বর্তমান উম্মাহর পছন্দ পাশ্চাত্যের সভ্যতা-সংস্কৃতি, তাদের মতো জাগতিক উন্নতি, নিজের দল, পার্থিব চাকচিক্য-এর বিনিময়ে ইমানকে বিক্রি করে উম্মাহ। বর্তমানে তাদের কাছে দুনিয়ার জীবনে পাওয়া-না-পাওয়া মুখ্য হয়ে উঠেছে, আখেরাতের ব্যাপারে উদাসীনতা চরমে পৌঁছেছে। অথচ ফিরআউনের যাদুকরগণ ইমান আনয়নের পরপরই আল্লাহকে প্রাধান্য দিতে পেরেছিল বলেই এবং দুনিয়াবি কষ্টের তুলনায় স্থায়ী আখিরাতকে প্রাধান্য দিতে পারার কারণেই তারা ইমানের উপর অটল থাকতে পেরেছিলে। আল্লাহ, তাদের কথাকে কুরআনে উল্লেখ করেন...

قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَتِ وَ الَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيُوةَ الدُّنْيَانَ إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغفِرَ لَنَا خَطِينَا وَ مَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللهُ خَيْرٌ وَ ابْقَى إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى وَ مَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصُّلِحَتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجْتُ الْعُلَى جَنْتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَ ذَلِكَ جَزَؤُا مَنْ تَزَلَّ

তারা বলল 'আমাদের কাছে যে স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে তার উপর এবং যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর উপর তোমাকে আমরা কিছুতেই প্রাধান্য দিব না। সুতরাং তুমি কর যা তুমি করতে চাও। তুমি তো কেবল এই পার্থিব জীবনের উপর কর্তৃত্ব করতে পার।" আমরা নিশ্চয়ই আমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছি যাতে তিনি আমাদের অপরাধ ক্ষমা করেন এবং তুমি আমাদেরকে যে জাদু করতে বাধ্য করেছ তাও ক্ষমা করেন। আর আল্লাহ শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী। যে তার প্রতিপালকের কাছে অপরাধী হয়ে উপস্থিত হবে তার জন্য তো আছে জাহান্নাম, সেখানে সে মরবেও না বাঁচবেও না এবং যারা তার নিকট উপস্থিত হবে মুমিন অবস্থায়, সৎকর্ম করে তাদের জন্য আছে সমুচ্চ মর্যাদা-স্থায়ী জান্নাত, যার পাদদেশে নহর প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং এই পুরস্কার তাদেরই, যারা পবিত্র। (২০: ৭২-৭৬)

সাহাবীরা(রা) ইমানের উপর দৃঢ় ও অটল থাকতে পেরেছিলেন এই প্রাধান্য ও পছন্দ-অপছন্দের মাপকাঠিকে ইসলামের আলোকে পরিবর্তন করার ফলেই এবং এ থেকে বিচ্যুতি ঘটলে কুরআনের আয়াত অনুযায়ী মুসলিমরা আল্লাহর শাস্তির যোগ্য হবে। আর মুসলিমরা এখন প্রায়োরিটি দিচ্ছে দ্বীনের পরিবর্তে দুনিয়াকে, সুন্নতের পরিবর্তে বিজাতীয় সংস্কৃতিকে, আল্লাহর পরিবর্তে নিজের নফসকে, ইমানী সম্পর্কের পরিবর্তে রক্তসম্পর্ককে, ইসলামি অর্থনীতির বদলে সুদি অর্থনীতিকে ইত্যাদি ইত্যাদি। এমন অসংখ্য তালিকা তুলে ধরা সম্ভব যা তাদের ভুল, প্রাধান্য দেওয়ার মাপকাঠি ইমান আনার পরই পরিবর্তন হয়ে যাবে কুরআনের আয়াতদৃষ্টে। এর বিপরীত করলে শাস্তি অনিবার্য। দুনিয়াতে লাঞ্চনা আর অধ:পতন তো আছেই।

যদি আল্লাহ, তাঁর রাসূল ﷺ এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয়' অর্থাৎ যদি আয়াতে উল্লিখিত আটটি জিনিসের কোন একটি তোমাদের কাছে আল্লাহ তা'আলা, রাসূল ﷺ ও তাঁর রাস্তায় জিহাদ করার চেয়ে অধিক প্রিয় হয় তাহলে আল্লাহ তা'আলার শাস্তির অপেক্ষা কর। অর্থাৎ তাদের ভালবাসা ও মোহে যদি আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলের ﷺ প্রতি ঈমান এবং জিহাদ করা বর্জন কর তাহলে তোমরা আল্লাহ তা'আলার শাস্তির সম্মুখীন হবে।[৯৩]
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: সেই সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ! তোমাদের কেউ পূর্ণ মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও সকল মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় হই। [৯৪]
অথচ সুন্নাহকে ছেড়ে দিয়ে নিজের মনমতো চলাফেরা কিংবা কুফফারদের অনুকরণকে এবং রসুলের ﷺ নির্দেশিত সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে জাতীয়বাদী চেতনা থেকে দেশীয় কালচার কিংবা বিধর্মী কালচারকে বাছাই করার ফলে ইমানের অপূর্ণতার সাথে সাথে প্রাধান্যের মাপকাঠিকে ইমানের আদলে ঠিক করতে সক্ষম হয় না।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: যখন তোমরা বাইয়ে ঈনাহ বা সূদভিত্তিক ক্রয়-বিক্রয় শুরু করবে, গরুর লেজ ধারণ করে থাকবে, অর্থাৎ কৃষি কাজ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে আর জিহাদ ছেড়ে দেবে তখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে লাঞ্ছনায় পতিত করবেন; আর এ লাঞ্ছনা দূর হবে না যতক্ষণ না তোমরা নিজেদের সঠিক দীনের দিকে ফিরে আসবে। [৯৫]

প্রাধান্য দেওয়ার এ মাপকাঠি মুসলিমদের মাঝে নেই বলেই তারা ইমানের পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়। দারিদ্র্যের কষ্টে থাকা মুসলিম জীবনমান উন্নত করার প্রলোভনে খ্রিস্টান হয়ে যাচ্ছে, আখিরাতকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দিতে না পারায় ইমানকে প্রাধান্য দিতে পারে না পথভ্রষ্টতার উপর। আবার জাগতিক উন্নতিকে আখিরাতের সাওয়াবের উপর প্রাধান্য দিতে না পারায় মুরতাদ ও কাফেরদেরকে দাওয়াত দেওয়ার সময় হয় না উম্মাহর। আল্লাহর হুকুমের উপর মাখলুকের হুকুমের কাছে মাথানত করে দিয়ে দ্বীনের স্পষ্ট হুকুম অমান্য করতে সামান্য দ্বিধা করে না উম্মাহর কিছু লোক। অসাম্প্রদায়িক চেতনার মোড়কে ইমান-কুফরের সহাবস্থানের দ্বারা কুফরি মতবাদকে পছন্দ করা হয় ইমানের উপর, তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে হয় অবাধ বিচরণ। এ সকল কারণে লাঞ্ছনা চেপে বসবে, উপরোক্ত হাদিস এর সমর্থন করে। এভাবে ভালোবাসা, প্রাধান্য দেওয়ার ভুল মাপকাঠি উম্মাহর অধঃপতনের বিরাট একটি কারণ।

প্রতিকার

রবকে চেনা

কুরআনে আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামীদের অবস্থা তুলে ধরে বলেছেন,

وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَٰلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِى كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ

অর্থ: আর সেখানে তারা আর্তনাদ করে বলবে, 'হে আমাদের রব, আমাদেরকে বের করে দিন, আমরা পূর্বে যে আমল করতাম, তার পরিবর্তে আমরা নেক আমল করব'। (আল্লাহ বলবেন) 'আমি কি তোমাদেরকে এতটা বয়স দেইনি যে, তখন কেউ শিক্ষা গ্রহণ করতে চাইলে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত? তোমাদের নিকট তো সতর্ককারীও এসেছিল। (৩৫:৩৭)

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, وجاءكم النذير এতে ইশারা হয়েছে যে, মানুষকে সাবালকত্বের বয়স থেকে কমপক্ষে তার স্রষ্টা ও মালিককে চেনা ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনকে জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করার মত জ্ঞান-বুদ্ধি প্রদান করা হয়। এ কাজের জন্য মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধিই যথেষ্ট ছিল; কিন্তু আল্লাহ তায়ালা শুধু তা দিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি, বরং তার বুদ্ধিকে সাহায্য করার জন্যে ভীতিপ্রদর্শনকারীও প্রেরণ করেছেন....।[৯৬]

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে বালেগ হওয়ার পরই মালিককে চেনার মতো জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে থাকেন, কিন্তু মালিককে চেনার জন্য তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধিকে সে কাজে লাগায় না। নবী পাঠিয়ে মালিকে চেনার বিষয়টি আরও সহজসাধ্য করেছেন, কিন্তু সে সমস্ত জ্ঞান কাজে লাগায় দুনিয়াবি কাজে ও জ্ঞানার্জনে। এই করতে করতে মৃত্যুর দোরগোড়ায় পৌঁছে যায় আর মালিককে চেনা হয় না। তাওহীদ সম্পর্কে থাকে বেখবর। আল্লাহর ব্যাপারে জ্ঞানের একটি অংশ হলো আল্লাহর নামসমূহ এবং গুণাবলির ব্যাপারে জ্ঞান। এই জ্ঞান থাকার ফলে মুসলিমের মনে আল্লাহর প্রতি ভয়, বিনয়, আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ তৈরি হয়। আল্লাহ তাআলা এই জ্ঞানের বিষয় হওয়ায় এটিই জ্ঞানের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ শাখা। বিনয়কে আল্লাহ পছন্দ করেন। আল্লাহর একটি গুণবাচক নাম হলো الكبيرবা কাবির, তাঁর মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের সামনে সবকিছুই ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ।

তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ মানে ইবাদতের উপযুক্ত একমাত্র তিনিই।

اَللّٰہُ لَاۤ اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ ؕ لَہُ الۡاَسۡمَآءُ الۡحسنی

আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই; সুন্দর নামসমূহ তাঁরই।(২০:০৮)
لَآ اِلٰهَ اِلَّا هوَ
তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই।(৩৫:০৩)

সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার হকদার আল্লাহ তায়ালা। এত নিয়ামতের মাঝে বান্দা আছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। এমনকি তাঁর শুকরিয়া করতে পারাটা-ও তাঁর দেওয়া নিয়ামত

'আল্লাহ'র নবি দাউদ (আলাইহিস সালাম) বলেন,

إِلٰهِي لَوْ أَنَّ لِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنِّي لِسَانَيْنِ يُسَبِّحَانِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالدَّهْرَ كُلَّهُ مَا

قَضَيْتُ حَقَّ نِعْمَةٍ

"হে আমার ইলাহ! আমার প্রত্যেকটি চুলের যদি দুটি জিহ্বা থাকতো, আর সেগুলো যদি দিন-রাত ও যুগ-যুগান্তর তোমার প্রশংসা করতে থাকতো, তাতে একটি নিয়ামাতেরও শুকরিয়া আদায় করে শেষ করা যেতো না!"'[৯৭]

'মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন,

إِلٰهِي كَيْفَ أَشْكُرُكَ وَأَصْغَرُ نِعْمَةٍ وَضَعْتَهَا عِنْدِي مِنْ نِعَمِكَ لَا يُجَازِي بِهَا عَمَلِي كُلُّهُ

"ইলাহ আমার! আমি কীভাবে তোমার শুকরিয়া আদায় করবো? তোমার অনুগ্রহরাজির মধ্য থেকে সবচেয়ে ছোট যে অনুগ্রহ তুমি আমাকে দিয়েছো, আমার সকল আমল জড়ো করলেও তো তার সমান হবে না!" এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা তাঁর নিকট ওহি পাঠিয়ে বললেন, " يا موسى الْآنَ شَكَرْتَنِي মূসা! এতোক্ষণে তুমি আমার (অনুগ্রহের) শুকরিয়া আদায় করেছো।"[৯৮]

দাউদ (আলাইহিস সালাম) বললেন,

يَا رَبِّ كَيْفَ أُطِيقُ شُكْرَكَ وَأَنْتَ الَّذِي تُنْعِمُ عَلَيَّ تَرْزُقْنِي عَلَى النِّعْمَةِ الشَّكْرَ ثُمَّ تَزِيدُنِي نِعْمَةً نِعْمَةً فَالنِّعَمُ مِنْكَ يَا رَبِّ وَالشَّكْرُ مِنْكَ فَكَيْفَ أُطِيقُ شُكْرَكَ يَا رَبِّ

"রব আমার! আমি কীভাবে তোমার শুকরিয়া আদায় করে শেষ করবো? তুমিই আমাকে অজস্র অনুগ্রহ দিয়ে যাচ্ছো, তুমিই অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সামর্থ্য দিচ্ছো, আবার তুমিই আমাকে একের পর এক নতুন অনুগ্রহ দিয়ে চলেছো। হে আমার রব! অনুগ্রহরাজি (আসে) তোমার নিকট থেকে, আবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সামর্থ্যও তোমার দেওয়া! তাহলে আমি কীভাবে তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে শেষ করবো?"

আল্লাহ বললেন, " الْآنَ عَرَفْتَنِي يَا دَاوُدُ حَقَّ مَعْرِفَتِي দাউদ! এতোক্ষণে তুমি আমাকে যথার্থভাবে চিনতে পেরেছো।"[৯৯]

বান্দা মাখলুকের কাছে আশা করবে না, মহাদাতা মালিকের নিকট আশা করবে আর আল্লাহর উপরই ভরসা করবে, মাখলুকের উপর ভরসা রাখবে না। তিনি এটাও চান বান্দা তাঁর কাছেই চাইবে, কোনো মাখলুকের মুখাপেক্ষী হবে না।

فَاِنِّیۡ قَرِیۡبٌ ؕ اُجِیۡبُ دَعۡوَۃَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ فَلۡیَسۡتَجِیۡبُوۡا لِیۡ وَلۡیُؤۡمِنُوۡا بِیۡ

আমি তো কাছেই আছি। যখন কোন প্রার্থনাকারী আমাকে ডাকে, তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিই। অতএব তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমাতে বিশ্বাস স্থাপন করুক।

হাদিসে কুদসিতে এসেছে...আমি বান্দাদের আশা আমার সঙ্গে যুক্ত করিয়া রাখিয়াছি।[১০০]

তিনি চান তাঁর সমস্ত বিধান, ফয়সালা কিংবা তাঁর নির্ধারিত তাক্বদির বান্দা সদা সর্বদা মেনে নিবে এবং সঠিক মনে করবে, হোক তা তার পছন্দের বিরুদ্ধে। তাঁর মনোনীত দ্বীনকেই মেনে নিবে। তাওহীদের হাকিকত ও প্রকৃত স্বরূপ এটাই। *তাওহীদ অর্থ, শুধু আল্লাহকে আহকামুল হাকিমীন মনে করা, আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে কারো হুকুম স্বীকার না করা, তাওহীদ অর্থ, শুধু শরীয়তে মুহাম্মাদিয়ার আনুগত্যকেই অপরিহার্য মনে করা, অন্য কোনো শরীয়তের আনুগত্য বৈধ মনে না করা। তাওহীদ অর্থ, শুধু ইসলামকেই হক্ক ও সত্য মনে করা, অন্য কোনো দ্বীনকে হক্ক ও সত্য মনে না করা।*[১০১]

তিনি সর্বজ্ঞানী, কিছুই তার ইলমের বাইরে না। তিনি যতটুকু চান ততটুকু ইলমই মাখলুকের করায়ত্তে আসে, এর বাইরে কোনো কিছু জানার সাধ্য কারো নেই। কেউ আল্লাহর ইলমের বাইরে গিয়ে লুকিয়ে কোনো গুনাহ করতে পারবে না। এই বিশ্বাসটুকু মুসলিমকে নাফরমানি থেকে হিফাজত করতে যথেষ্ট।

لَا یَضِلُّ رَبِّیۡ وَلَا یَنۡسَی ۫

আমার প্রতিপালক বিভ্রান্ত হন না এবং বিস্মৃতও হন না।(২০:৫২)।

یَعۡلَمُ مَا بَیۡنَ اَیۡدِیۡهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ ۚ وَلَا یُحِیۡطُوۡنَ بِشَیۡءٍ مِّنۡ عِلۡمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ

তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে, তা তিনি অবগত আছেন। যা তিনি ইচ্ছা করেন, তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না।(২:২৫৫)

وَمَا یَخۡفٰی عَلَی اللّٰهِ مِنۡ شَیۡءٍ فِی الۡاَرۡضِ وَلَا فِی السَّمَآءِ

আর পৃথিবী ও আকাশের কোন কিছুই আল্লাহর নিকট গোপন থাকে না।(১৪:৩৮)

اِنَّهٗ یَعۡلَمُ الۡجَهۡرَ مِنَ الۡقَوۡلِ وَیَعۡلَمُ مَا تَکۡتُمُوۡنَ

তিনি প্রকাশ্য কথা সম্পর্কেও জানেন এবং তোমরা যা গোপন কর তাও জানেন।(২১:১১০)

وَاِنۡ تَجۡهَرۡ بِالۡقَوۡلِ فَاِنَّهٗ یَعۡلَمُ السِّرَّ وَاَخۡفٰی

আর যদি তুমি উচ্চস্বরে কথা বল তবে তিনি গোপন ও অতি গোপন বিষয় জানেন।(২০:০৭)

তিনি সৃষ্টিকর্তা, কর্তৃত্ব একমাত্র তাঁর। রাত-দিনের আবর্তন তার নিয়ামত।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَآءٍ ؕ اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ ؕ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ

বল, 'তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ রাতকে তোমাদের উপর কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী করে দেন, তবে তাঁর পরিবর্তে কোন ইলাহ আছে কি যে তোমাদের আলো এনে দেবে? তবুও কি তোমরা শুনবে না'? বল, 'তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ দিনকে তোমাদের উপর কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী করে দেন, তবে তাঁর পরিবর্তে কোন ইলাহ আছে কি, যে তোমাদের রাত এনে দেবে যাতে তোমরা বিশ্রাম করবে? তবুও কি তোমরা ভেবে দেখবে না'?(২৮:৭১-৭২)

يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ ۙ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖؗ كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ؕ

তিনি রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান আর তিনিই সূর্য ও চাঁদকে বশীভূত করে দিয়েছেন; প্রত্যেকে পরিভ্রমণ করছে একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। তিনি আল্লাহ, তোমাদের রব; সমস্ত কর্তৃত্ব তাঁরই।(৩৫:১৩)

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا ؕ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ

আল্লাহ তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন; অতঃপর শুক্রবিন্দু হতে, অতঃপর তোমাদেরকে করেছেন জোড়া জোড়া। আল্লাহর অজ্ঞাতসারে কোন নারী গর্ভ ধারণ করে না অথবা সন্তানও প্রসব করে না। (৩৫:১১)

তিনি কেবল সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হননি, জীবন চলার পথও দেখিয়েছেন। মৌমাছিকে কোথায় বাসা বানাতে হবে, কিভাবে সংরক্ষণ করতে হবে সেই জ্ঞান দিয়েছেন। পিঁপড়াকে খাবার সঞ্চয় করে রাখার ইলম দিয়েছেন। হাঁসকে পানিতে চলার শক্তি দিয়েছেন এবং জন্মের পরপরই পানিতে অনায়াসে চলে যেন কেউ তাকে শিখিয়েছে -পানি তোমার জন্য নিরাপদ, আর তিনিই রব। কিন্তু এর বিপরীতে মুরগির বাচ্চা কখনোই পানিতে নামতে চাইবে না, আল্লাহ তাকে শিখিয়েছেন 'পানিতে নামলে ডুবে মরবে'। বাবুই পাখিকে এত শিল্পগুণ দিয়ে ঘর নির্মাণ করার জ্ঞান দিয়েছেন তাঁর রব।

قَالَ رَبُّنَا الَّذِىْٓ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هدى

মূসা বলল, ‘আমাদের রব তিনি, যিনি সকল বস্তুকে তার আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর সঠিক পথ নির্দেশ করেছেন’।(২০:৫০)

যত বড় বিপদ হোক আল্লাহ ব্যতীত কেউ তা থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম নন। কেননা বিপদ থেকে উত্তরণের পথ তাঁর কাছেই।

بَلِ اللهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ النّٰصِرِيْنَ

বরং আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক এবং তিনি উত্তম সাহায্যকারী।(৩:১৫০)

আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা’ কি বিপদ–আপদে আমাকে ব্যতীত অন্যের উপর ভরসা স্থাপন করে? অথচ বিপদসমূহ আমারই হাতে, আর আমি চিরঞ্জীব, করুণাময় ও দানশীল। সে কি আমাকে ছাড়া অন্যের নিকট আশা পোষণ করে? আর আমারই হাতে সকল দরজার চাবিসমূহ।‘[১০২]

তিনি দয়ালু, তবে তিনি কঠোর শাস্তিদাতা-ও বটে। দুনিয়াতে বিপদ -মুসিবত দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে সতর্ক করেন। এটাও তার রাহমাহ, কেননা চিরস্থায়ী আযাবের আগে ক্ষণস্থায়ী আযাব ভোগ করানোর দ্বারা চিরস্থায়ী আযাবের স্বাদের নমুনা দেখিয়ে হুশিয়ার করার ফলে আল্লাহমুখী হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়। কিন্তু আখিরাতে গিয়ে তো আবার ইমান আনা ও নেক আমল করা সম্ভব না, এজন্য আগে সতর্ক করা একটি বড় নিয়ামত।

وَ لَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ۙ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۙ وَّاَنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ

আর অন্যায়কারীরা যে সময় কোন শাস্তি প্রত্যক্ষ করে, তখন যদি বুঝত যে, সমুদয় ক্ষমতা আল্লাহর এবং আল্লাহ শাস্তিদানে অত্যন্ত কঠোর, (তাহলে কতই না উত্তম হত)।(২:১৬৫)

وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ

বড় শাস্তির পূর্বে ওদেরকে আমি অবশ্যই লঘু শাস্তি আস্বাদন করাব, যাতে ওরা (আমার পথে) ফিরে আসে।(৩২:২১)

مَا يَفْتَحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُمْسِكْ ۙ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الحكيم

আল্লাহ মানুষের জন্য যে রহমত উন্মুক্ত করে দেন তা আটকে রাখার কেউ নেই। আর তিনি যা আটকে রাখেন, তারপর তা ছাড়াবার কেউ নেই। আর তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।(৩৫:০২)

সত্যিকার অর্থে আল্লাহর পরিচয়, তাঁর অগণিত অনুগ্রহ, তাঁর দয়া - এসকল বিষয় জানার মাধ্যমে মুসলিমের হৃদয় আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্বকে উপলব্ধি করতে পারবে,

তাঁর কাছে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব সুস্পষ্ট হবে, তাওহীদের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারবে এবং এটাই মুসলিমের ইমানের মজবুত ভিত। এই বিশ্বাস তাকে সফলতা এনে দিবে এবং এই বিশ্বাসে বিন্দুমাত্র সন্দেহ তার বিফলতার কারণ হবে। তাওহীদের পরিপূর্ণ ধারণা সঠিক দ্বীনের অনুসারী করবে উম্মাহকে।

মালিকের দয়ামাখা আহ্বানগুলো জানা

যখন ভালোবাসা হয় দুপাক্ষিক, তখন সেই ভালোবাসা হয় স্থায়ী ও মধুর। একপাক্ষিক ভালোবাসার ফলে সম্পর্কের মধুরতা কখনোই গড়ে উঠে না। আল্লাহ যেমন বান্দাদেরকে ভালোবাসেন, বান্দাদেরও উচিত আল্লাহকে ভালোবাসা। এজন্য জানতে হবে তার ভালোবাসার কথাগুলো।

وَاللّٰهُ رَءُوۡفٌۢ بِالۡعِبَادِ

এবং আল্লাহ নিজ বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল।(২:২০৭)

আল্লাহ তার বান্দাদেরকে অনেক ভালোবাসেন। কেননা ১০০ ভাগ রহমতের একভাগ পুরো মাখলুকাতের মধ্যে দিয়েছেন আর ৯৯ ভাগ দিয়ে সমস্ত মাখলুককে ভালোবাসেন। এটাই সত্য, কিন্তু যখন একপাক্ষিক ভালোবাসা হয় তখন তা হয় অপূর্ণ। আর বান্দার প্রতি আল্লাহর ভালোবাসাকে বান্দার উপলব্ধি করার দ্বারা মুসলিমরা আকৃষ্ট হবে আল্লাহকে ভালোবাসার প্রতি, ভয়মিশ্রিত এক ভালোবাসা যা তাকে আল্লাহর অনুগত করবে। নবীজিকে ﷺ জানিয়ে দিতে বলেলেন...

نَبِّئۡ عِبَادِیۡۤ اَنِّیۡۤ اَنَا الۡغَفُوۡرُ الرَّحِیۡمُ ۙ وَاَنَّ عَذَابِیۡ ہُوَ الۡعَذَابُ الۡاَلِیۡمُ

আমার বান্দাদের জানিয়ে দাও যে, আমি নিশ্চয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর আমার আযাবই যন্ত্রণাদায়ক আযাব।(১৫:৪৯-৫০)

বান্দা যখন আল্লাহবিমুখ....

یٰۤاَیُّہَا الۡاِنۡسَانُ مَا غَرَّکَ بِرَبِّکَ الۡکَرِیۡمِ ۙ

হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহামহিম প্রতিপালক সম্পর্কে ধোঁকা দিয়েছে? (৮২:০৬)

اَوَلَا يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا

মানুষ কি স্মরণ করে না যে, আমি তাকে পূর্বে সৃষ্টি করেছি যখন সে কিছুই ছিল না? (১৯:৬৭)

يَقُولُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَا ابْنَ آدَمَ أَمَرْتُكَ فَتَوَلَّيْتَ وَنَهَيْتُكَ فَتَمَادَيْتَ وَ سَتَرْتُكَ عَلَيْكَ فَتَجَرَات وَ اَعْرَضْتُ عَنْكَ فَمَا بَالَيْتَ يَا مَنْ إِذَا مَرِضَ شَكَا وَ بَكَى وَ إِذَا عُرْفِي تَمَرَّدَ وَ عَصَا يَا مَنْ إِذَا دَعَاهُ الْعَبِيدُ عَدَا وَ لَبَّى وَ إِذَا دَعَاهُ الْجَلِيلُ أَعْرَضَ وَنَاى – إِنْ سَأَلْتَنِي أَعْطَيْتُكَ وَ إِنْ دَعَوْتَنِي أَجَبْتُكَ وَ إِنْ مَرِضْتُ شَفَيْتُكَ وَ إِنْ سَلِمْتَ رَزَقْتُكَ وَ إِنْ أَقْبَلْتَ قَبَلْتُكَ وَ إِنْ تُبْتَ غَفَرْتُكَ وَ أَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ – أَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ –

ইবাদত করতে ডেকেছেন...

يَاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۙ

হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবের ইবাদাত কর, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তাদেরকে, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর। (২:২১)

মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলেন, হে বনি আদম! আমি তোমাকে হুকুম করিলাম আর তুমি মুখ ফিরাইয়া রহিলে। আমি তোমাকে নিষেধ করিলাম আর তুমি দীর্ঘকাল অবাধ্য হইয়া থাকিলে। আমি তোমাকে ঢাকিয়া রাখিলাম, তারপর তুমি দুঃসাহসী হইয়া আগাইলে। আমি তোমার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া রহিলাম আর তুমি ভ্রুক্ষেপও করিলে না। যখন সেই ব্যক্তি রোগগ্রস্ত হইল তখন সে অভিযোগ করিল এবং কান্নাকাটি করিল, আর যখন তাহাকে স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেওয়া হইল তখন সে বিদ্রোহী এবং অবাধ্য হইয়া পড়িল। আর যখন তাহাকে পরাক্রমশালী আল্লাহ ডাকিলেন তখন সে' মুখ ফিরাইয়া লইল এবং দূরে চলিয়া গেল। যদি তুমি আমার নিকট চাও, আমি তোমাকে দেই। যদি তুমি আমাকে ডাক, আমি তোমার ডাক শুনি। যদি তুমি রোগাক্রান্ত হও আমিই তোমাকে রোগমুক্ত করি। যদি তুমি নিরাপদ থাক, আমি তোমাকে জীবিকা দান করি। আর যদি তুমি আমার দিকে অগ্রসর হও, আমিও তোমার দিকে অগ্রসর হই। যদি তুমি তওবা কর, আমি তোমাকে ক্ষমা করি। আমি দয়ালু, তওবা মঞ্জুরকারী।[১০৩]

قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَا ابْنَ آدَمَ مَهْمَا عَبَدْتَنِي وَ رَجَوْتَنِي وَلَمْ تُشْرِكْ بِي شَيْئًا غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَإِنِ اسْتَقْبَلْتَنِي بِمَلاءِ السَّمَوَاتِ خَطَايَا وَ ذُنُوبًا اِسْتَقْبَلْتُكَ بِمَلْئِهِنَّ لا أُبَالِي – اَخْرَجَهُ الشَّيْرَانِيُّ عَنْ اَ مِنَ الْمَغْفِرَةِ وَ اغْفِرُ لَكَ وَ لَا ابالي

মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলিয়াছেন, হে আদমের সন্তান! যে পর্যন্ত তুমি আমার ইবাদত কর এবং আমার কাছে আশা পোষণ কর, আর আমার সহিত কোন অংশীদার না কর, সে পর্যন্ত তোমার সকল গুনাহ্ আমি ক্ষমা করিয়া দেই। আর যদি তুমি সমুদয় আকাশ ভরা অপরাধ ও গুনাহ্ লইয়া আমার দিকে অগ্রসর

হও, আমি তদনুরূপ ক্ষমা লইয়া তোমার দিকে আগাইয়া আসি এবং তোমাকে মার্জনা করি। আর আমি সকলের পরিণামের ঊর্ধ্বে।[১০৪]

আনুগত্যের কি ফলাফল দিতেন দুনিয়া ও আখিরাতে....

قَالَ رَبُّكُمْ لَوْ أَنَّ عِبَادِى أَطَاعُونِي لَأَسْقَيْتُهُمُ الْمَطَرَ بِاللَّيْلِ وَ

لأَطْلَعْتُ عَلَيْهِمُ الشَّمْسَ بِالنَّهَارِ وَ لاَ اَسْمَعْتُهُمْ صَوْتَ الرَّعْدِ – –

তোমাদের প্রভু বলিয়াছেন, যদি আমার বান্দাগণ আমার আদেশ পূর্ণমাত্রায় পালন করিত তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই রাত্রিতে তাহাদিগকে বৃষ্টিদান করিতাম, দিনে তাহাদের জন্য রৌদ্র উঠাইতাম এবং তাহাদিগকে বজ্রের ধ্বনি শুনাইতাম না[১০৫]

بَلٰي مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗۤ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۪ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

অবশ্যই যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট বিশুদ্ধচিত্তে আত্মসমর্পণ করে, তার প্রতিদান তার প্রতিপালকের কাছে রয়েছে এবং তাদের কোন ভয় নেই ও তারা দুঃখিত হবে না। (২:১১২)

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ

নিশ্চয় যারা বলে, 'আল্লাহই আমাদের রব' অতঃপর অবিচল থাকে, ফেরেশতারা তাদের কাছে নাযিল হয় (এবং বলে,) 'তোমরা ভয় পেয়ো না, দুশ্চিন্তা করো না এবং সেই জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর তোমাদেরকে যার ওয়াদা দেয়া হয়েছিল'। (৪৩:৩০))

শত্রুর ব্যাপারে সাবধান করেছেন....

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً ۪ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

হে মুমিনগণ, তোমরা ইসলামে পূর্ণরূপে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না । নিশ্চয় সে তোমাদের জন্য স্পষ্ট শত্রু। (২:২০৮)

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ٝ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُاِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّاؕ اِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهٗ لِيَكُوْنُوْا مِنْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِؕ

হে মানুষ! নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য; সুতরাং পার্থিব জীবন যেন কিছুতেই তোমাদেরকে প্রতারিত না করে এবং কোন প্রবঞ্চক যেন কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদেরকে প্রবঞ্চিত না করে। নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু; অতএব তাকে শত্রু হিসেবে গণ্য কর। সে তার দলকে কেবল এজন্যই ডাকে যাতে তারা জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসী হয়। (৩৫:৫-৬)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تَتَّبِعُوۡا خُطُوٰتِ الشَّيۡطٰنِ‌ؕ وَمَنۡ يَّتَّبِعۡ خُطُوٰتِ الشَّيۡطٰنِ فَاِنَّهٗ يَاۡمُرُ بِالۡفَحۡشَآءِ وَالۡمُنۡكَرِ

হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে শয়তান তো অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়। (২৪:২১)

রবের স্মরণে আত্মনিয়োগ করতে বলেছেন...

فَاذۡكُرُوۡنِىۡۤ اَذۡكُرۡكُمۡ وَاشۡكُرُوۡا لِىۡ وَلَا تَكۡفُرُوۡنِ ٪

অতএব, তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব। আর আমার শোকর আদায় কর, আমার সাথে কুফরী করো না। (২:১৫২)

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اذۡكُرُوۡا نِعۡمَتَ اللّٰهِ عَلَيۡكُمۡ‌ؕ هَلۡ مِنۡ خَالِقٍ غَيۡرُ اللّٰهِ يَرۡزُقُكُمۡ مِّنَ السَّمَآءِ وَالۡاَرۡضِ‌ؕ

হে মানুষ! তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর। আল্লাহ ব্যতীত কি কোন স্রষ্টা আছে যে তোমাদেরকে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী হতে রুযী দান করে? (৩৫:০৩)

اَلَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَتَطۡمَئِنُّ قُلُوۡبُهُمۡ بِذِكۡرِ اللّٰهِ‌ؕ اَلَا بِذِكۡرِ اللّٰهِ تَطۡمَئِنُّ الۡقُلُوۡبُؕ

যারা বিশ্বাস করেছে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের হৃদয় প্রশান্ত হয়। জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণেই হৃদয় প্রশান্ত হয়। (১৩:২৮)

চরিত্র সংশোধনের জন্য ভালোবেসে বলেছেন.....

صِبۡغَةَ اللّٰهِ‌ۚ وَمَنۡ اَحۡسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبۡغَةً‌ ۖ وَّنَحۡنُ لَهٗ عٰبِدُوۡنَ

(বল,) আমরা আল্লাহর রং গ্রহণ করলাম। আর রং এর দিক দিয়ে আল্লাহর চেয়ে কে অধিক সুন্দর? আর আমরা তাঁরই ইবাদাতকারী। (২:১৩৮)

কষ্ট-বিপদে কি করবে, তা বলে দিয়েছেন.....

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ

হে মুমিনগণ, ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।(২:১৫৩)

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۙ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ؕ
নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে রয়েছে স্বস্তি। নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে রয়েছে স্বস্তি।(৯৪:০৬)

আশা ভরসার পরিপূর্ণ হকদার তিনি, তাই তিনি বান্দাদের ডেকে যান...

يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ `لأقْطِعَنَّ اَمَلَ كُلِّ مُؤْمِلٍ أَصْلَ دُونِي
بِالْيَاسِ وَالْبِسَنَّهُ ثَوْبَ الْمَذَلَّةِ بَيْنَ النَّاسِ وَ لَأُنَحِيَنَّهُ مِنْ قُرْبِي وَ لابْعِدَنَّهُ مِنْ وَصْلِى اَيَأَمِلُ عَبْدِي غَيْرِي فِي الشَّدَائِدِ وَ الشَّدَائِدُ بِيَدِي وَأَنَا الْحَيُّ الْكَرِيمُ وَيَرْجُو غَيْرِى وَبِيَدِي مَفَاتِيْحُ الْأَبْوَابِ وبَابِي مَفْتُوحٌ لِمَنْ دَعَانِي مَنْ ذَا الَّذِي أَمْلَنِي بِعَظِيْمِ نَوَائِبِهُ فَقَطَعْتُ بِهِ دُونَهَا أَمْ مِّنْ ذَا الَّذِي رَجَانِي لِعَظِيمِ جُرْمِهِ قَطَعْتُ رَجَاءَهُ مِنَى جَعَلْتُ أَمَالَ عِبَادِي مُتَّصِلَةَ بِى وَمَلَاتُ السَّمَوَاتِ مَنْ لَا يَعْلُ مَنْ تَسْبِيحِي فَيَا يُؤْسًا لِلْقَانِطِينَ مِنْ رَّحْمَتِي وَ يَا شَقْوَةً لِّمَنْ عَصَانِي وَ لَمْ يُرَاقِينِي – أَخْرَجَهُ الدِّيلَمِي عَنْ أَبِي ذَرٍ

মহান মর্যাদার অধিকারী আল্লাহ্ বলেন, যে ব্যক্তি আমাকে ব্যতীত অন্য কাহাকে তাহার আশারকেন্দ্র স্থির করে, আমি নিশ্চয়ই তাহার আশা কর্তন করিয়া নিরাশায় পরিবর্তিত করি, তাহাকে লোকদের মধ্যে অপমানের পোশাক পরিধান করাই, আমার সান্নিধ্য হইতে দূরে সরাইয়া দেই এবং আমার মিলন হইতে দূরে রাখি। আমার বান্দা' কি বিপদ-আপদে আমাকে ব্যতীত অন্যের উপর ভরসা স্থাপন করে? অথচ বিপদসমূহ আমারই হাতে, আর আমি চিরঞ্জীব, করুণাময় ও দানশীল। সে কি আমাকে ছাড়া অন্যের নিকট আশা পোষণ করে? আর আমারই হাতে সকল দরজার চাবিসমূহ। আর যে ব্যক্তি আমাকে ডাকে তাহার জন্য আমার দরজা খোলা রহিয়াছে। এমন ব্যক্তি কে আছে যে বৃহৎ হইতে বৃহত্তর বিপদে আমার নিকট আশা পোষণ করিয়াছে এবং আমাকে ডাকিয়াছে? তারপর আমি তাহার সম্মুখে তাহার আশা কর্তন করিয়া দিয়াছি? অথবা এমন কে আছে যে তাহার বৃহৎ পাপের (মার্জনা) সম্বন্ধে আমার ওপর আশা স্থাপন করিয়াছে, তারপর আমি তাহার আশা কর্তন করিয়া দিয়াছি? আমি বান্দাদের আশা আমার সঙ্গে যুক্ত করিয়া রাখিয়াছি। আর যে সম্প্রদায় আমার পবিত্রতা বর্ণনায় ক্লান্তি বোধ করে না তাহাদের দ্বারা আকাশসমূহ পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছি। অতএব আমার রহমত হইতে নিরাশ ব্যক্তিদের জন্য বড়ই আক্ষেপ। আর যাহারা আমার আদেশ অমান্য করে এবং আমাকে ভয় করে না, তাহাদের বড়ই দুর্ভাগ্য।[১০৬]

যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, অভিভাবক হয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন হুমকি....

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ۚ

হে মানুষ! তোমরা তো আল্লাহর মুখাপেক্ষী, কিন্তু আল্লাহ; তিনিই অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে ধ্বংস করে এক নূতন সৃষ্টি অস্তিত্বে আনতে পারেন।(৩৫:১৫)

فَاِنۡ زَلَلۡتُمۡ مِّنۡۢ بَعۡدِ مَا جَآءَتۡکُمُ الۡبَیِّنٰتُ فَاعۡلَمُوۡۤا اَنَّ اللّٰهَ عَزِیۡزٌ حَکِیۡمٌ

অতএব তোমরা যদি পদস্খলিত হও, তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ আসার পর, তবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (২:২০৯)

গুনাহ করে ফেললেও কাছে টেনে নেন তিনি আর সান্ত্বনা দেন...

قُلۡ یٰعِبَادِیَ الَّذِیۡنَ اَسۡرَفُوۡا عَلٰۤی اَنۡفُسِهِمۡ لَا تَقۡنَطُوۡا مِنۡ رَّحۡمَۃِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ یَغۡفِرُ الذُّنُوۡبَ جَمِیۡعًا ؕ اِنَّهٗ هُوَ الۡغَفُوۡرُ الرَّحِیۡمُ

বল, ‘হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজদের উপর বাড়াবাড়ি করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। অবশ্যই আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৩৯:৫৩)

وَالَّذِیۡنَ اِذَا فَعَلُوۡا فَاحِشَۃً اَوۡ ظَلَمُوۡۤا اَنۡفُسَهُمۡ ذَکَرُوا اللّٰهَ فَاسۡتَغۡفَرُوۡا لِذُنُوۡبِهِمۡ ۪ وَمَنۡ یَّغۡفِرُ الذُّنُوۡبَ اِلَّا اللّٰهُ ۪۟ وَلَمۡ یُصِرُّوۡا عَلٰی مَا فَعَلُوۡا وَهُمۡ یَعۡلَمُوۡنَ

আর যারা কোন অশ্লীল কাজ করলে অথবা নিজদের প্রতি যুলম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে, অতঃপর তাদের গুনাহের জন্য ক্ষমা চায়। আর আল্লাহ ছাড়া কে গুনাহ ক্ষমা করবে ? আর তারা যা করেছে, জেনে শুনে তা তারা বার বার করে না। (৩:১৩৫)

ফরজিয়্যাতের ব্যাপারে সজাগ করানো

ফরজ বিধানসমূহ হলো আল্লাহর হক এবং এগুলো অবশ্য পালনীয়। এসকল বিধানগুলো অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত এবং ফরজ তরক করা কবিরা গুনাহ। সমাজ যখন কবিরা গুনাহে সয়লাব, তখন ফরজ হুকুম-আহকামগুলোর ব্যাপারে সচেতনতা বাড়ানো উম্মাহর ইমানী অধঃপতন থেকে উত্তরণের যথাযথ একটি পথ।

وَاتَّبِعُوۡۤا اَحۡسَنَ مَاۤ اُنۡزِلَ اِلَیۡکُمۡ مِّنۡ رَّبِّکُمۡ مِّنۡ قَبۡلِ اَنۡ یَّاۡتِیَکُمُ الۡعَذَابُ بَغۡتَۃً وَّاَنۡتُمۡ لَا تَشۡعُرُوۡنَ ۙ اَنۡ تَقُوۡلَ نَفۡسٌ یّٰحَسۡرَتٰی عَلٰی مَا فَرَّطۡتُّ فِیۡ جَنۡۢبِ اللّٰهِ

আর অনুসরণ কর উত্তম যা নাযিল করা হয়েছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে, তোমাদের উপর অতর্কিতভাবে আযাব আসার পূর্বে। অথচ তোমরা উপলব্ধি করতে পারবে না।যাতে কাউকেও বলতে না হয়, 'হায়! আল্লাহর প্রতি আমার কর্তব্যে আমি তো শৈথিল্য করেছি।(৩৯:৫৫-৫৬)

আল্লাহ বলেন,

فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيًّا ۙ اِلَّا مَنۡ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يَدۡخُلُوۡنَ الۡجَنَّةَ وَلَا يُظۡلَمُوۡنَ شَيۡئًا ۙ

তাদের পর এল অপদার্থ পরবর্তিগণ, তারা নামায নষ্ট করল ও প্রবৃত্তিপরায়ণ হল; সুতরাং তারা অচিরেই অমঙ্গল প্রত্যক্ষ করবে। কিন্তু তারা নয় যারা তওবা করেছে, ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে; তারা তো জান্নাতে প্রবেশ করবে; আর তাদের প্রতি কোন যুলুম করা হবে না। (১৯:৫৯–৬০)

নামাজের ব্যাপারে যত্নবান হলে বাকিগুলো এমনি ঠিক হবে। পূর্ববর্তী উম্মতের পথভ্রষ্ট হওয়ার কারণ তুলে ধরে মালিক আমাদেরকে সতর্ক করেছেন। সুতরাং শেষের আয়াতেই উল্লেখ করা আছে, উম্মতের সংশোধনের জন্য কি করণীয়। নামাজকে নষ্ট করার পরেই কুপ্রবৃত্তির অনুবর্তী হয়ে তারা আরো অধঃপতিত হয়েছিল।

খলীফা হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) সকল সরকারী কর্মচারীদের কাছে এই নির্দেশনামা লিখে প্রেরণ করেছিলেন: 'আমার কাছে তোমাদের সব কাজের মধ্যে নামায সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। অতএব যে ব্যক্তি নামায নষ্ট করে, সে দ্বীনের অন্যান্য বিধি-বিধান আরও বেশী নষ্ট করবে। (মুয়াত্তা মালেক)[১০৭]

তাই প্রথমে নামাজের ব্যাপারে অধিক যত্নশীল হতে হবে, নামাজ তরককারীদের নামাজে পাবন্দী করাতে উম্মতের কাজ করতে হবে। এককথায়, নামাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য উঠেপড়ে লাগতে হবে। তাহলে দ্বীনের বাকি বিধিনিষেধ উম্মতের মাঝে সহজে বাস্তবায়ন সম্ভব।

যাকাত, হজ, পর্দা, দাওয়াহ, হিসবাহ, জিহাদ –এ সকল ফরজসমূহ পালন করার ব্যাপারে উম্মাহকে সজাগ করাতে হবে। কেননা এগুলো আল্লাহর হুকুম। আল্লাহর হক আদায় করার ব্যাপারে গাফেলদের মাঝে সচেতনতা তৈরি করতে হবে। কেননা পরিপূর্ণ দ্বীন পালনের মাঝেই সফলতা।

ইতিহাস সাক্ষী, নবীজির ﷺ ওফাতের পরপরই কুফফারদের চতুর্মুখী আগ্রাসনের সময় একদল মুসলিম যাকাত দিতে অস্বীকার করলে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন আবু বকর (রা), এজন্য যাকাতের ব্যাপারে অবহেলা কাম্য নয়, যাকাত

আদায় না করার শাস্তির বিষয়ে সচেতন করতে হবে। কুরআনের আয়াত ও হাদিসের দলিলকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে এমনভাবে যেন তার প্রতি আনুগত্যই হয় প্রতিটি মুসলিমের আমল। এবং যাকাত কখন ফরজ হয় তা-ও জানানোর ব্যাপারে উদ্যোগী হতে হবে।

হজ না করে মৃত্যুবরণ করার ব্যাপারে হাদিসে হুশিয়ার করা হয়েছে। তাই হজ ফরজ কখন হয় তা জেনে সত্বর আদায়ের ব্যাপারে সচেতনতা তৈরি করতে সচেষ্ট হতে হবে। বিনা ওজরে হজ পালনে বিলম্ব করা গুনাহ। সকলের কাছে স্পষ্ট করতে হবে যে – আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল ﷺ ফরয হজ্ব আদায়ের প্রতি এমন ভাবে গুরুত্বারোপ করেছেন যে, কেউ যদি এই হজ্বকে অস্বীকার করে বা এ বিষয়ে কোনো ধরনের অবহেলা প্রদর্শন করে তবে সে আল্লাহর জিম্মা থেকে মুক্ত ও হতভাগ্য রূপে বিবেচিত হবে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

والله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، ومن كفر فان الله غنى عن العلمين

অর্থ: মানুষের মধ্যে যারা সেখানে (বায়তুল্লাহ) পৌঁছার সামর্থ্য রাখে তাদের উপর আল্লাহর উদ্দেশ্যে এ গৃহের হজ্ব করা ফরয। আর কেউ যদি অস্বীকার করে তাহলে তোমাদের জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি জগতের প্রতি মুখাপেক্ষী নন। (৩:৯৭)

পর্দার ব্যাপারে নারী ও পুরুষ উভয়কে সচেতন করলে অনেক বড় বড় নাফরমানি ও গুনাহের কাজ সমাজ থেকে দূর হবে অনায়াসে। পরকীয়া, বিবাহপূর্ব হারাম রিলেশনশিপ, ফ্রিমিক্সিং, সহশিক্ষা ইত্যাদি অপরাধ কমে যাবে। সহশিক্ষা কিংবা কর্মক্ষেত্রে কম্বাইন্ড সিস্টেমে মাধ্যমে ফ্রিমিক্সিং স্বাভাবিক হয়ে গেছে মুসলিম সমাজে, পরবর্তীতে রূপ নেয় বিবাহবহির্ভূত হারাম রিলেশনশিপে। এ কারণে পর্দার হুকুমকে মুসলিমদের মাঝে বাস্তবায়নে উপযুক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে, পরিবারের দায়িত্বে থাকা মাহরাম পুরুষদের মাঝে গায়রতবোধ জাগিয়ে তোলা আর নারীদের মাঝে সাহাবিয়াতদের পর্দার হুকুমের প্রতি নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্যের ইতিহাস তুলে ধরতে হবে। মুখ ঢেকে পর্দা করার ব্যাপারেও জোর দিতে হবে, কেননা ফেতনার যামানায় মুখ ঢাকাকে জরুরি বলেছেন সকলমতের উলামারা। আজকের মিশরে পর্দার এত গাফিলতির শুরুটা হয়েছিল মুখ খুলে রাখার মাধ্যমেই। এজন্য মুখ ঢেকে রাখতে হবেই।

রোজা রাখার ব্যাপারে এভাবে সচেতন করতে হবে যেন রোজা পরিপূর্ণ হক আদায় করে আল্লাহ যে উদ্দেশ্যে রোজা ফরজ করেছেন সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ করে। (২:১৮৩)
রোজার প্রকৃত হক আদায় করলে প্রতিটি বছরই প্রকৃত দ্বীনের অনুসারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেত, কেননা টানা একমাস আল্লাহর নির্দেশে কেবলমাত্র হালালকৃত খাবার ও হালাল সম্পর্ক থেকে কিছু সময়ের জন্য বিরত থাকে কেবলই আল্লাহকে ভয় করে। এই ভয় লালন করার দ্বারা আল্লাহর হুকুম মানার ব্যাপারে তার একমাসের প্রশিক্ষণ হয়। যদি উপবাস না করে সত্যিকার অর্থে রোজা আদায় করতো তাহলে উম্মাহ এর বরকত থেকে বঞ্চিত হতো না। আল্লাহর হুকুমে চলার মতো ইমানী শক্তি অর্জনের মাস হতো রমাদান।
জিহাদের ব্যাপারে কুরআনের আয়াতের সুস্পষ্ট নির্দেশনা এবং তার সঠিক ব্যাখ্যা উম্মতের মাঝে প্রচার করতে হবে। কুফফারদের ফাঁদে পড়ে ফরজ বিধানকে সন্ত্রাস আখ্যায়িত না করার ব্যাপারে উম্মতকে সচেতন করতে হবে। এ ব্যাপারে অবহেলা করার কারণে উইঘুর-আরাকান–কাশ্মির–ফিলিস্তিনসহ পুরো বিশ্বে মুসলিমদের উপর কাফেররা অত্যাচারের স্টিমরোলার চালাচ্ছে, অথচ পুরো উম্মাহ নির্বিকার। ফেসবুক-ইনস্ট্রাগ্রামে পোস্ট করে দায়িত্বের শেষ নয়– এ জন্য ইসলামে সমাধান হিসেবে জিহাদের বিধান রেখেছে। এই সত্য পোঁছে দিতে হবে উম্মতের মাঝে, উম্মাহর সত্যনিষ্ঠ আলেমরাই পারেন এই সত্যকে তুলে ধরতে। এই বিধান পালন করার ব্যাপারে উদাসীনতা কিংবা গাফিলতি কাম্য নয়, জিহাদকে আঁকড়ে ধরার মাধ্যমেই হারানো গৌরবকে ফিরে পাওয়া যাবে, খিলাফত কায়েম সম্ভব হবে। বিশ্বনেতৃত্বের আসনে আবারও মুসলিমরাই বসতে সক্ষম হবে।
দাওয়াত-হিসবাহর মাধ্যমে ইসলামের প্রচার করাই উম্মতের দায়িত্ব। কাফের–মুশরিকদেরকে দিতে হবে দাওয়াহ, এর মাধ্যমে ইসলামের বিরোধীরাই চলে আসবে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে। আবার হিসবাহর মাধ্যমে মুসলিমরা তাদের স্বকীয়তা ধরে রাখতে পারবে পরিপূর্ণ দ্বীন মানার দ্বারা।
এসকল ফরজ বিধান পরিপূর্ণ হক আদায় করে করলেই মুসলিম উম্মাহর উত্থান হবে আবারও বিশ্বব্যাপী।

দ্বীনের প্রকৃতরূপ উপস্থাপন

কুফরি শক্তি কর্তৃক চলমান স্নায়ুযুদ্ধে যখন মুসলিমসমাজে ভ্রান্তমতবাদে ছেয়ে গেছে সেই মুহূর্তে হিসবাহর মাধ্যমে মুসলিমদেরকে ইসলামের দিকে ফিরিয়ে আনতে হবে। হিসবাহ ছেড়ে দেওয়ার কারণে কুফফারদের দাওয়াতে মুসলিমদের দ্বীনের প্রকৃত ও সঠিক ধারণা বিলুপ্ত করতে সক্ষম হয়েছে কুফফাররা।

কুফরি শক্তি প্রতিটা মুহূর্তেই মুসলিমদের মাঝে কুপরি মতবাদের অনুপ্রবেশ করতে সক্রিয়। তার সাপেক্ষে সত্যদ্বীনের অনুসারী মুসলিমরা কতটুকু সক্রিয় ভূমিকা পালন করা উচিত তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু বর্তমান মুসলিম উম্মাহকে অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে লিপ্ত করানোর দ্বারা মুসলিমদের মাঝে হিসবাহ করার হার-ও কমে গেছে, দুনিয়াবি ব্যস্ততায় পড়ে জরুরতের দোহাই দিয়ে বা দুর্বলতার অজুহাতে হিসবাহ ছেড়ে দিচ্ছে।

আল্লাহ তাআলা যখন দ্বীনকে পূর্ণ করেই দিয়েছেন, তখন এর বিধিবিধানগুলো আমাদের ওপর চিরতরে আবশ্যক হয়ে গেছে। কোনো একটা সময়ে এসে যদি আমরা নিজেদের দুর্বল অবস্থায় আবিষ্কার করি, তা হলে দুর্বলতা কাটিয়ে সবল অবস্থায় ফেরার জন্য চেষ্টা করতে হবে।[১০৮]

জরুরি ভিত্তিতে দাওয়াহ-হিসবাহ করার মাধ্যমে পরিপূর্ণ সুস্পষ্ট পূর্ণ দ্বীনকে উম্মাহর মাঝে সুস্পষ্ট করতে হবে। কাফেরদের সংজ্ঞায়িত Modernist আর Secularist মুসলিমদের মাঝে আল্লাহর আহকামুল হাকিমীন সিফাতের হাকিকত এবং তাওহীদের হাকিকত সুস্পষ্ট করতে হবে। তাদেরকে মাঝে প্রচার করতে হবে-

তাওহীদ অর্থ, শুধু আল্লাহকে আহকামুল হাকিমীন মনে করা, আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে কারো হুকুম স্বীকার না করা, তাওহীদ অর্থ, শুধু শরীয়তে মুহাম্মাদিয়ার আনুগত্যকেই অপরিহার্য মনে করা, অন্য কোনো শরীয়তের আনুগত্য বৈধ মনে না করা। তাওহীদ অর্থ, শুধু ইসলামকেই হক্ক ও সত্য মনে করা, অন্য কোনো দ্বীনকে হক্ক ও সত্য মনে না করা।[১০৯]

যদি তারা না বুঝে কিংবা ফিরে না আসে, তবে মুখোশ উন্মোচন করে দিতে হবে যে তারা খন্ডিত দ্বীনের অনুসারী। তারা যে ইসলামকে রক্ষা করার নামে কুফফারদের পরোক্ষ প্রেসকিপশনে ইসলামের ভিত্তিকে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে তা সুস্পষ্ট করতে হবে, প্রয়োজনে মিডিয়ার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে প্রচার করতে হবে; কেননা কুফরি শক্তি-ও মিডিয়ার মাধ্যমে একুশ শতকের সবচেয়ে বড় ফিতনা 'মডারেট ইসলাম'-কে বিশ্বে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

সমাধান এটাই হবে যে, তাদের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদেরকে-ও পরিপূর্ণ দ্বীনকে উপস্থাপন করতে হবে এবং পরিপূর্ণ অনুসরণ করতে হবে। বর্তমান উম্মাহর কাছে দুনিয়ার ব্যস্ততা কমিয়ে চিরস্থায়ী আখিরাতের চিন্তাকে প্রকট করতে হবে সর্বপ্রথম। পরবর্তীতে এদেরকে দ্বীনের বুঝ দিয়ে, দ্বীনের পূর্ণ অনুসারী হিসেবে তৈরি করার পরে এদেরকে দ্বীনের দাই ও মুহতাসিব হিসেবে তৈরি করতে হবে। এভাবে প্রচুর সংখ্যক দাঈ ও মুহতাসিবের ময়দানে বিচরণ করানোর দ্বারা উম্মাহর মাঝে সচেতনতা তৈরি করতে হবে।

দ্বীনের মাঝে অনুপ্রবেশ করানো ভ্রান্তমতবাদের বিপরীতে দ্বীনের স্পষ্ট হুকুম নিয়ে আলেমদের আলোচনা, হোক সেটা অফলাইন কিংবা অনলাইন।কুফফাররা কি চায়,আমেরিকার RAND কর্পোরেশন কর্তৃক ২০০৭ সালে প্রকাশিত 'Building Moderale Muslim Networks' এ বলা হয়েছে...

> Clearly, the United States, the modern industrialized world, and indeed the international community as a whole would prefer an Islamic world that is compatible with the rest of the system: democratic, economically viable, politically stable, socially progressive, and follows the rules and norms of international conduct. They also want to prevent a "clash of civilizations" in all of its possible variants—from increased domestic unrest caused by conflicts between Muslim minorities and "native" populations in the West to increased militancy across the Muslim world and its consequences, instability and terrorism.

স্পষ্টতই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আধুনিক শিল্পোন্নত বিশ্ব এবং প্রকৃতপক্ষে সমগ্র আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এমন একটি ইসলামী বিশ্বকে পছন্দ করবে যা অন্যান্য ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ: গণতান্ত্রিক, অর্থনৈতিকভাবে টেকসই, রাজনৈতিকভাবে স্থিতিশীল, সামাজিকভাবে প্রগতিশীল এবং আন্তর্জাতিক আচরণের নিয়ম ও রীতিনীতি অনুসরণ করে।[১১০]

অর্থ্যাৎ কুফফাররা চায় এমন মুসলিম বিশ্ব যারা শরীয়াহর উর্ধ্বে আন্তর্জাতিক নিয়ম আর রীতিনীতিকে মানবে এবং তাদের কথামত সুদি অর্থনীতিতে বিশ্বাসী হবে, খিলাফাহর পরিবর্তে গণতন্ত্রকে চাইবে, সব মতের সাথে তাল মিলিয়ে চলবে, সর্বোপরি ইসলামকে বিকৃত করাই তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য। এ কারণে উম্মাহর আলেমদের দলিলপ্রমাণ উপস্থাপন করে ভ্রান্তমতবাদগুলোর ইমানবিধ্বংসী স্বরূপকে উন্মোচন করতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে – গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, নারীবাদ, বিজ্ঞানবাদ, সেক্যুলারিজম, লিবারেলিজম, সোশ্যালিজম ইত্যাদি। এসকল মতবাদের ব্যর্থতার কারণ-ও সুস্পষ্ট করতে হবে, এর বিপরীতে ইসলামের পূর্ণ অনুসরণে সফলতার বিষয়টিও মনমগজে দৃঢ়তার সাথে প্রবেশ করাতে হবে। তার সাথে সাথে ইখতিলাফি বিষয়ে উম্মতের মাঝে দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতে আলেমদের সক্রিয় হতে

হবে, সমালোচনার আদব রেখে উম্মতকে এ বিষয়ে হঠকারিতা করানো থেকে ফিরাতে হবে।

তাছাড়া, উম্মাহর মাঝে সুস্পষ্ট করতে হবে, দ্বীনের কোনো অংশ ছেড়ে দেওয়ার অর্থ হলো উম্মাহর ব্যর্থতা ও পরাজয়কে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসা। কেননা আল্লাহ এ দ্বীনকে বিজয়ী করার ওয়াদা করেছেন, তবে দ্বীনের পরিপূর্ণ অনুসরণ করলেই বিজয় আসবে। আল্লাহ বলেন,

هوَ الَّذِیۡۤ اَرۡسَلَ رَسُوۡلَه بِالۡہُدٰی وَدِیۡنِ الۡحَقِّ لِیُظۡہِرَہٗ عَلَی الدِّیۡنِ کُلِّہٖ ۙ وَلَوۡ کَرِہَ الۡمُشۡرِکُوۡنَ

তিনিই পথনির্দেশ (কুরআন) এবং সত্য ধর্ম সহ নিজ রসূল প্রেরণ করেছেন, যাতে তাকে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন, যদিও মুশরিকরা অপ্রীতিকর মনে করে।(৯:৩৩)

দলীল ও প্রমাণের দিক দিয়ে এ বিজয় সর্বকালের জন্য। তথাপি যখনই মুসলিমরা দ্বীনের উপর আমল করেছে, তখনই তাদের পার্থিব বিজয় লাভ হয়েছে। আর এখনো যদি মুসলিমরা দ্বীনের উপর আমল করে, তাহলে তাদের বিজয়ও অবশ্যম্ভাবী হবে। এই ব্যাপারে আল্লাহর ওয়াদাও আছে যে, আল্লাহর দলই বিজয়ী হবে, তবে শর্ত হল যে, মুসলিমদেরকে আল্লাহর দলে পরিণত হতে হবে।[১১১]

আল্লাহর দল হলো....

وَمَنۡ یَّتَوَلَّ اللّٰہَ وَرَسُوۡلَه وَالَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا فَاِنَّ حِزۡبَ اللّٰہِ ہُمُ الۡغٰلِبُوۡنَ

আর যে কেউ আল্লাহ তাঁর রসূল এবং বিশ্বাসীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, (সে হবে আল্লাহর দলভুক্ত।) নিশ্চয় আল্লাহর দলই বিজয়ী হবে।(৫:৫৬)

তবে শর্ত একটাই, পরিপূর্ণরূপে ইসলামে দাখিল হওয়া। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: যখন তোমরা বাইয়ে ঈনাহ বা সূদভিত্তিক ক্রয়-বিক্রয় শুরু করবে, গরুর লেজ ধারণ করে থাকবে, অর্থাৎ কৃষি কাজ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে আর জিহাদ ছেড়ে দেবে তখন আল্লাহ তা‘আলা তোমাদেরকে লাঞ্ছনায় পতিত করবেন; <u>আর এ লাঞ্ছনা দূর হবে না যতক্ষণ না তোমরা নিজেদের সঠিক দীনের দিকে ফিরে আসবে।</u>[১১২]

وَلَیَنۡصُرَنَّ اللّٰہُ مَنۡ یَّنۡصُرُہٗ ؕ اِنَّ اللّٰہَ لَقَوِیٌّ عَزِیۡزٌ

আর আল্লাহ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেন যে তাঁকে (তাঁর ধর্মকে) সাহায্য করে। আল্লাহ নিশ্চয়ই মহাশক্তিমান, চরম পরাক্রমশালী।(২২:৪০)

পরিপূর্ণ দ্বীন মানার ব্যাপারে সচেতনতা বাড়াতে হবে। মাসিক আলকাউসার পত্রিকায় ‘ইসলামের পর্দা-বিধান ও আমাদের অসতর্কতা’ শিরোনামে শামীমা বিনতে

নূর একটি ঘটনা উল্লেখ করার পর লিখেন, "আমি নামায পড়ি, রোযা রাখি, *কিন্তু জাহেলিয়াতের মোহ ত্যাগ করতে পারি না, সন্তান-সন্ততিকে বানাতে চাই 'প্রগতিশীল মুসলিম' তাহলে আমি পরিপূর্ণভাবে ইসলামে ঢুকিনি। আমি পূর্ণাঙ্গ মুসলিম তখনই হতে পারব যখন বিশ্বাস করব ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন বলে এবং শিক্ষা-দীক্ষায়, রুচি ও জীবনাচারে ইসলাম যা দিয়েছে তাকেই গ্রহণ করতে পারব সর্বোত্তম বলে।*
আল্লাহর নবী ﷺ তো বলেছেন, 'ঈমানের লযযত ঐ ব্যক্তি পেয়েছে, যে আল্লাহকে রব হিসেবে পেয়ে ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পেয়ে এবং মুহাম্মাদ ﷺ কে রাসূল হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে গেছে।'"[১১৩]
পরিপূর্ণ দ্বীন মানার ব্যাপারে তাগিদ দেওয়া হয়েছে কুরআনেও,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا ادۡخُلُوۡا فِى السِّلۡمِ كَآفَّةً ۖ وَلَا تَتَّبِعُوۡا خُطُوٰتِ الشَّيۡطٰنِ‌ؕ اِنَّهٗ لَـکُمۡ عَدُوٌّ مُّبِيۡنٌ

হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।(২:২০৮)

ইসলামকে সঠিকভাবে বোঝার মানদণ্ড হলো যেভাবে এই উম্মাহর সত্যনিষ্ঠ পূর্বসূরিগণ- সাহাবি, তাঁদের পরবর্তী প্রজন্ম তাবিঈ, তাঁদের পরবর্তী প্রজন্ম তাবি-তাবিঈনগণ এবং তাঁদের সকলের পদাঙ্ক অনুসরণকারী অন্য সবাই যেভাবে বুঝেছেন। তাঁরা দ্বীনে ইসলামে নতুন কিছু যোগ করেননি, কিছু পরিবর্তন করেননি, কোনো অংশ বাদ দিয়ে দেননি। তাঁরা নবীজির ﷺ এই কথার বাস্তব প্রতিচ্ছবি, "অবশ্যই আমার সুন্নাহ ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ মেনে চলো এবং তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো।" (তিরমিযি)

প্রকৃত হক্কানী আলেমের অনুসরণ করার মাধ্যমে ভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা থেকে বাঁচা সম্ভব। তাদের অনুসরণ না করলে প্রকৃত দ্বীনের উপর চলা সম্ভব না চতুর্মুখী ফিতনার এতসকল আগ্রাসনে। নবীজি ﷺ বলেছেন, "আমার উম্মাহর একটি দল সত্যের ওপর থেকে যুদ্ধ করতে থাকবে এবং কিয়ামাত পর্যন্ত বিজয়ী থাকবে।" [১১৪]

এভাবে আল্লাহর নির্দেশমোতাবেক পরিপূর্ণ দ্বীনের অনুসরণের মাধ্যমে ওয়াদাকৃত বিজয় আসবে। এজন্য দ্বীনের পূর্ণ অনুসরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে পাত্তা দেওয়া যাবে না। মহান আল্লাহর আনুগত্য ও হুকুম পালনের ব্যাপারে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় ও পরোয়া করবে না।

وَلَا يَخَافُوۡنَ لَوۡمَةَ لَاۤٮِٕمٍ

এবং কোন নিন্দুকের নিন্দায় ভয় করবে না।(৫:৫৪)

ইলমের সাথে থাকা

দ্বীন ও ইমান সম্পর্কে বেপরোয়া লোকদের যেহেতু ইসলামের পূর্ণ পরিচয় এবং তার অপরিহার্য দাবি ও অনুসঙ্গগুলো জানা নেই বা জানা থাকলেও পরোয়া নেই, তাই তাদের মতে ইমান ও কুফরির সন্ধিও অসম্ভব নয়। ফেরেশতাদের উপর আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হলো ইলম, অর্থ্যাৎ এই ইলম আমাদেরকে আশরাফুল মাখলুকাত অভিহিত করার কারণ। তাহলে ইলমের সাথে থাকা কত জরুরি! আর আসমানি ইলম যা অবতীর্ণ করেছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা সেই ইলমের সোহবতে থাকার দ্বারাই মুসলিম উম্মাহ ফিরে পাবে তাদের হারানো গৌরব, বিশ্বনেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতাকে। তবে শর্ত হলো ইলমকে দুনিয়া পূজারীদের কাছে নয়, বরং যারা দুনিয়ার মুহাব্বতকে ছেড়ে দিয়েছে তাদের কাছে পেশ করা। তবেই নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে উম্মাহ। আবদুল্লাহ (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, ‘ইলম বা জ্ঞানের ধারক-বাহকগণ যদি নিজেদের জ্ঞানকে সুরক্ষিত রাখতেন এবং তা উপযুক্ত ব্যক্তিদের নিকট পেশ করতেন, তাহলে তারা এই জ্ঞানের মাধ্যমে সমকালীন লোকদের নেতৃত্ব দিতে পারতেন। তা না করে, তারা জ্ঞানকে নিয়ে গেছেন দুনিয়া-পূজারিদের সামনে; ফলে তারা তাচ্ছিল্যের শিকার হয়েছেন।[১১৫]

কিছু উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে এক্ষেত্রে, ধারাবাহিকভাবে এগুলো উল্লেখ করা হলো.....

<u>নিয়তের পরিশুদ্ধি</u>

ইলম এর এত মর্যাদা কেবল এ কারণে যে তা তাক্বওয়া অর্জনের উসিলা। আর তাক্বওয়া অর্জনের ফলে মানুষ আল্লাহর কাছে সম্মান এবং স্থায়ী সৌভাগ্যের অধিকারী হয়। এজন্য ইলম হাসিলে নিয়ত সহিহ হওয়া জরুরি। সহিহ নিয়ত প্রতিটি আমল কবুল হওয়ার শর্ত। নিয়তের ব্যাপারে হাদিসেও জোর দেওয়া হয়েছে। এমনকি ইমাম বুখারি এ রহ. এই হাদিস দিয়েই তার বুখারি’ কিতাবের সূচনা করেন। কেননা নিয়ত সহিহ না হলে তাতে ইখলাস কমে যায় এবং আল্লাহর কাছে কবুল হওয়ার যোগ্যতা হারায়। হাদিসে এসেছে

" إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى،

আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছিঃ কাজ (এর প্রাপ্য হবে) নিয়ত অনুযায়ী। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে।[১১৬]

রাসূলে আকরাম ﷺ থেকে একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, “অনেক কাজ দুনিয়াবী কাজের আকৃতি ধারণ করে। কিন্তু নিয়ত ঠিক থাকার কারণে তা আখেরাতের কাজে পরিণত হয়ে যায়। আবার এমনও অনেক কাজ রয়েছে, যা আখেরাতের কাজের আকৃতি ধারণ করে। কিন্তু নিয়ত ঠিক না থাকার কারণে তা দুনিয়ার কাজে পরিণত হয়।[১১৭]

ইলম হাসিলের পথে নিয়তের পরিশুদ্ধি অতীব প্রয়োজনীয়। আর নিয়ত ঠিক না থাকলে ইলমের দ্বারা উপকৃত হওয়া সম্ভব না, বিপরীতে সেই ইলম তার ক্ষতি করবে। ইমাম গাযালি রহ. ছোটবেলা থেকেই ইলম হাসিলের উদ্দেশ্য রেখেছিলেন ‘আল্লাহকে পাওয়া’।[১১৮] প্রতিটি ত্বলিবুল ইলমের ‘আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য’–ই ইলম হাসিল করায় মনোনিবেশ করা জরুরি। পিতামাতার কথায় কিংবা পরিস্থিতির শিকার হয়ে ইলম হাসিল করতে গেলে ইলম দ্বারা ইসলামের ঐ খেদমত করা সম্ভব না। আল্লামা বুরহানুদ্দিন আযযানুরজী রহ. বলেন, *শিক্ষার্থীদের জন্য করণীয় আল্লাহর সন্তুষ্টি, আখেরাতের কল্যাণ লাভ, নিজের ও অন্য সকল মূর্খদের অজ্ঞতা দূর করা, দ্বীন ইসলামের প্রতিষ্ঠা এবং একে টিকিয়ে রাখাকে ইলম (জ্ঞান) অর্জনের লক্ষ্য হিসেবে সাব্যস্ত করা। কারণ, ইলমের উপরই নির্ভর করে ইসলামের টিকে থাকা*৷[১১৯]

যারা ইলম হাসিলে আত্মনিয়োগ করে তারা হলো ইলমের ধারক ও বাহক৷ তাদের নিষ্ঠাবান হওয়া অনেক গুরুত্বপূর্ণ উম্মতের জন্য৷ কেননা তারা ই দলিলের ভিত্তিতে বাতিলের মোকাবেলা করে বাতিল ফিরকা ও মতবাদকে উম্মতের সামনে তুলে ধরবে যেন উম্মত হিদায়াতের পথ থেকে বিচ্যুত না হয়৷ তারাই আসমানী ইলমকে ক্বলবে ধারণ করবে৷ তারাই তা বহন করে পৌঁছে দেবে উম্মতের মাঝে৷ এভাবে ইসলাম টিকে থাকবে৷ আর যদি তাদের নিয়তে গড়মিল হয় তাহলে দুনিয়ার বুকে ইসলামকে কাফেররা নিশ্চিহ্ন করতে অধিক তৎপর ও সফল হবে৷ তাই যারা ইলমকে হাসিল করবে তাদের নিয়ত সহিহ হওয়া অতীব জরুরি ।

অনেকেই ইলম অর্জন করে সম্মান লাভের আশায়৷ যদি প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে না হয় বরং ভালো কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধ, সত্যের প্রতিষ্ঠা এবং দ্বীনকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে খ্যাতি অর্জন করতে যায় তাহলে কোন অসুবিধা নেই। এক্ষেত্রেও একটি নির্ধারিত সীমা আছে– তা কেবল এতটুকু অর্জন করা বৈধ, যতটুকু দ্বারা ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ করতে সক্ষম হওয়া যায়৷ কোনো ত্বলিবুল ইলম ইলম হাসিল করাকে নশ্বর ও অতি তুচ্ছ দুনিয়া অর্জনের উছিলা বানাবে না।

ইলম অর্জনের নিয়ত থাকবে (১) অর্জিত ইলম অনুযায়ী আমল করা এবং সে অনুযায়ী নিজেকে গঠন করা।(২)অর্জিত ইলম অন্যকে শিক্ষা দেওয়া এবং প্রচার–

প্রসার করার মাধ্যমে দ্বীন ও শরীয়তকে জিন্দা রাখা।(৩) সর্বোপরি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জন করার মাধ্যমে উভয় জগতের কামিয়াবী হাসিল করা। এই তিনটি উদ্দেশ্যের বাইরে ইলম হাসিল করার উদ্দেশ্য যদি হয় দুনিয়ার সম্পদ উপার্জন করা, মানুষের কাছে সম্মান লাভ করা, পদ বা নেতৃত্ব লাভ করা,মূর্খদের সঙ্গে তর্কে জয়ী হওয়া ইত্যাদি, তাহলে তা হবে গলদ নিয়ত।[১২০]

এই গলদ নিয়তকে পরিত্যাগ করে নিয়তের পরিশুদ্ধি প্রয়োজন। কাঙ্ক্ষিত সমস্যার এটাই হতে পারে একটা সমাধান। কেননা ইলমের উপরই ইসলামের টিকে থাকা, তাই ইলম অর্জনকারীদের সহিহ নিয়তই পারে ইসলামকে আবারও প্রতিষ্ঠা করতে।

কিতাব অধ্যয়ন ও চশমা বদল

কালো চশমা দিয়ে দুনিয়ার রঙিন বস্তু-ও কালচে দেখাবে, রঙিন চশমা দিয়ে সবকিছু রঙিন দৃষ্টিগোচর হবে। চোখ এক, কিন্তু চশমা ভিন্ন হলেই দৃশ্য বদলে যায়। ঠিক তেমনি একই মস্তিষ্ক কিন্তু ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি একটা বিষয়কে ভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করবে, যাচাই কিংবা বিচার করবে।

মুসলিমদের বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আনয়ন জরুরি। এই দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য জাহিলিয়্যাতের ধারণায় নিমজ্জিত থাকা যাবে না। প্রথমেই আমাদের মস্তিষ্ককে থেকে মুক্ত করতে হবে জাহিলিয়্যাত থেকে। এজন্য দরকার জাহিলিয়্যাত সর্ম্পকে সুস্পষ্ট ধারণা। *উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, 'ইসলামের বন্ধন একটি একটি করে তখনই ছুটতে থাকবে, যখন ইসলামের মাঝে এমন লোকদের আবির্ভাব ঘটবে, যারা জাহিলিয়্যাতকে চিনবে না।*[১২১] তাই এ সংক্রান্ত কিতাব পড়ে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে হবে যেন মুসলিম হয়েও জাহেলিয়্যাতের অনুসারী হয়ে না পড়ি। দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা জরুরি, তবেই মুসলিমরা দ্বীন নিয়ে আপত্তি কিংবা প্রশ্ন তুলবে না থেকে। ইমানী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করা শিখবে তখন, জাহেলি চিন্তায় নয়। জাহিলিয়্যাতের থাবা থেকে মুক্ত করতে ইসলাম এসেছে। সুতরাং ইসলামকে বিজয়ী করতে মুসলিমদেরকে জাহিলিয়্যাতের চিন্তাভাবনামুক্ত হওয়া বাঞ্চনীয়।

আত্মশুদ্ধি ও নেক সোহবত

আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য একাকী প্রচেষ্টার তুলনায় সোহবতের দ্বারা পরিশুদ্ধি অত্যন্ত ফলপ্রসূ। নেক সোহবতের মাধ্যমে আখিরাতের ব্যাপারে অধিক যত্নবান হয়ে শরীয়াতের সীমায় অবস্থান করা সম্ভব। এজন্য কোনো মুত্তাকী আলেম কিংবা

কোনো নেককার ব্যক্তির সোহবতে থাকা জরুরি। নেক সোহবতে থেকে ইমানের উপর চলা, আমল করা সহজ। নেক সোহবত সৎকাজে উৎসাহ দেয়, অসৎকাজ থেকে হিফাজত করে। সাহাবায়ে কেরামের(রা) মতো এমন মজবুত ইমানওয়ালা জামাত তৈরি হয়েছে প্রিয় নবীর ﷺ সহচার্যে। কাছ থেকে দেখে শিখেছেন। সর্বদাই যখন রসুল ﷺ কে দুনিয়ার ব্যাপারে নিরাসক্ত দেখেছেন যা দুনিয়ার বাদশাহদের বিপরীত চিত্র – তখন তারাও দুনিয়ার ব্যাপারে নির্মোহ হয়েছেন। তাঁকে দেখেছেন অবাধে দান করতে, তারা-ও আল্লাহর রাহে খরচ করেছেন। শত্রুর খারাপ আচরণে সবর কিংবা বন্দীর সাথে উত্তম ব্যবহার -সমস্ত কিছুই তাদের হৃদয়ের রেখাপাত করেছে- সোহবতের মাধ্যমে এভাবেই দ্বীনের উপর সুদৃঢ় হওয়া সম্ভব। নেক সোহবত ব্যতীত 'আল ওয়ালা'-র উপর আমল করার বিষয়টি অবহেলিত থাকবে, অথচ এটা ইমানের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। 'আল্লাহর জন্যই কাউকে ভালোবাসা'- এটাও নেক সোহবতের দ্বারাই আমল করা সম্ভব হয়। আলেমদের সোহবতে থেকে, হোক সেটা অফলাইনে কিংবা অনলাইনে, ইলম অর্জনে মনোযোগী হওয়া-ও উম্মতের করণীয়। ফরজে আইন পরিমাণ ইলম জানতেই হবে পরিপূর্ণ শরিয়তের অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে। এজন্য হক্কানি আলেমের তত্বাবধানে থেকে তাওহীদ,আকিদা,সীরাহ ইত্যাদি বিষয়ে ইলম হাসিল করতেই হবে। ইতিহাস জানার ব্যাপারেও উম্মাহকে সচেতন হতে হবে, কেননা ইতিহাস ধারন করে একটি জাতির উত্থান পতনের প্রকৃত ঘটনা যা তাকে পতনের হাত থেকে বাঁচিয়ে আবারও বিজয়ী হতে অনুপ্রেরণা যোগাবে এবং পথ দেখাবে। ইতিহাসের জ্ঞান ভুলগুলো শুধরে নিয়ে কিভাবে নেতৃত্বের আসনে আসীন হতে পারবে তার উপায় খুঁজে পেতে সহায়ক হবে।

সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা

উম্মাহর এই ক্রান্তিলগ্নে নবীজির ﷺ নসিহত কতই-না গুরুত্বপূর্ণ। নবীর ﷺ একটি হাদিস ইরবাদ বিন সারিয়া রা. বর্ণনা করেছেন,.......আমি তোমাদের তাকওয়া অবলম্বনের আদেশ দিচ্ছি।........।তোমরা নিত্য-নতুন (বিদআত) বিষয়াবলী থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা সেগুলো ভ্রান্ত। তোমরা যারা সে সময়টা পাবে, তারা যেন আমার সুন্নাহ আঁকড়ে ধরে। আমার হিদায়াতপ্রাপ্ত সুবুদ্ধিসম্পন্ন খলীফাদের পথ আঁকড়ে ধরে। তোমরা তাদের পথকে মযবুতভাবে কামড়ে ধরে রাখবে।[১২২]

হাদিসটি থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, সুন্নাতের অনুসরণের মাঝেই উম্মতের মুক্তি নিহিত। তাই সুন্নাতের প্রতি যত্নশীল হওয়া। তার পাশাপাশি সুন্নাহর প্রচার-প্রসারের দ্বারা মুসলিম সমাজে সুন্নাহকে পুনর্জীবিত করতে হবে। কেননা হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী সুন্নাহকে ছেড়ে দিলেই বিভ্রান্তির পথ উন্মুক্ত হবে আর সুন্নাহকে মানার মাঝেই মুক্তি মিলবে।

সুন্নত এমন কিছু নির্দেশনা যা ঘুম থেকে উঠার পর থেকে শুরু করে ঘুমাতে যাওয়া, এমনকি ঘুমানোর সময়ের নির্দেশনা-ও এর অন্তর্ভূক্ত। অর্থ্যাৎ জীবনের প্রতিটি কাজ, হোক সেটা ব্যক্তিগত কিংবা সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের, প্রতিটি বিষয়ের একটি সুন্নাহসম্মত দিকনির্দেশনা ইসলামে রয়েছে। প্রতিটি বিষয়ে রসুলের ﷺ অনুসরণেই আর্দশগত দৈন্যতা ঘুচবে, উন্মুক্ত হবে হিদায়াতের পথ।

কুরআনে এসেছে, وَاِنۡ تُطِيۡعُوۡهُ تَهۡتَدُوۡا

তোমরা তাঁর আনুগত্য করলে সৎপথ পাবে।(২৪:৫৪)

সুন্নাহ সামাজিক বন্ধনকেও সুদৃঢ় করে। মুসলিমদের পারস্পরিক দূরত্বকে দূর করে মহব্বত পয়দা করতে পারে সুন্নাহ। হাদিয়া দেওয়া, সালাম দেওয়া কিংবা খাওয়ানোর দ্বারাই ঘুচবে পারস্পরিক বিরহ, অবসান ঘটবে দীর্ঘকালের বিরোধের। আবার কারোর মধ্যকার সম্পর্ককে জুড়ে দেওয়া-ও একটি সুন্নাত, এভাবেই সামাজিক জীবনে অশান্তি দূর হয়ে নিজেদের মধ্যকার সম্পর্ক স্বাভাবিক হবে, দূর হবে উম্মাহর মাঝ থেকে অন্যায়-অবিচার।
পশ্চিমাদের থেকে আমাদানিকৃত কালচার নয় বরং সর্বশ্রেষ্ঠ রসুলের অনুপম আদর্শই পারে উম্মাহকে সফলতা এনে দিতে। আল্লাহ বলেন,

لَقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِىۡ رَسُوۡلِ اللّٰهِ اُسۡوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنۡ كَانَ يَرۡجُوا اللّٰهَ وَالۡيَوۡمَ الۡاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيۡرًا ؕ

তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর (চরিত্রের) মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।(৩৩:২১)

এই আয়াতে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, রসূল ﷺ-এর আদর্শে ঐ ব্যক্তি আদর্শবান হবে, যে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে সাক্ষাতে বিশ্বাসী এবং যে বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ করে থাকে। বর্তমানে অধিকাংশ মুসলমান উক্ত দুই গুণ থেকে বঞ্চিত। যার ফলে তাদের অন্তরে রসূল ﷺ-এর আদর্শের কোন গুরুত্ব নেই। এদের মধ্যে যারা দ্বীনদার তাদের আদর্শ হল পীর ও বুযুর্গরা। আর যারা দুনিয়াদার

বা রাজনৈতিক তাদের আদর্শ ও পথপ্রদর্শক হল পাশ্চাত্যের নেতারা। রসূল ﷺ-এর প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসার কথা এরা মুখে খুব দাবী করে, কিন্তু কার্যতঃ তাঁকে নিজেদের আদর্শ, নেতা ও পথপ্রদর্শক মানার ব্যাপারে অধিকাংশই পিছনে।[১২৩] তাফসির থেকে স্পষ্ট হয় উম্মাহর করুণ অবস্থা। এজন্য আয়াতের নির্দেশনা অনুযায়ী নবীজির ﷺ আদর্শকে, তাঁর ﷺ সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরতে হবে, তাহলেই সফলতা অর্জন হবে।

সুন্নাহর পদচারণায় মুখরিত হোক উম্মাহর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। কেননা সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরলে আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচা যাবে এবং লাভ করা যাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও ভালোবাসা। তার সাথে সাথে আদর্শিক দৈন্যতার অবসান ঘটবে, আদর্শিকভাবে সুসংহত হবে উম্মাত।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ * وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۘ

আর রসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা হতে বিরত থাক। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।(৫৯:৭)

আল্লাহ আরও বলেন,

اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

বল, ‘তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর।ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’(৩:৩১)

অর্থ্যাৎ কেবল মৌখিক দাবী এবং মনগড়া তরীকায় আল্লাহর ভালবাসা এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করা যায় না। তাঁর ভালোবাসা ও সন্তুষ্টি লাভ করার পথ তো একটাই। আর তা হল, শেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ -এর উপর ঈমান আনা এবং তাঁর অনুসরণ করা। এই আয়াতে সমস্ত ভালবাসার দাবীদারদের জন্য একটি পথই নির্দিষ্ট করা হয়েছে আর তা হলো রসুলের ﷺ উপর ইমান আনার সাথে তাঁর ﷺ অনুসরণ। অতএব আল্লাহর ভালবাসার অনুসন্ধানী যদি মুহাম্মাদ ﷺ-এর অনুসরণের মাধ্যমে তা অনুসন্ধান করে, তাহলে অবশ্যই সে সফল হবে, পাবে আল্লাহর

ভালোবাসা ও ক্ষমা। এভাবেই সুন্নত পালনের মাধ্যমে আল্লাহর রেজামন্দি হাসিল করে উম্মাহ আবারও ফিরে পাবে তার সোনালী অতীত।

কুরআনের চল্লিশটি জায়গায় আল্লাহর অনুসরণের সাথে রাসূলের অনুসরণের কথা বলা হয়েছে। কাজেই নবীজির ﷺ সুন্নাহ না মেনে উপায় নেই। সুন্নাহর প্রকৃত অনুসারীদের জন্যই কল্যাণের সব দরজা খোলা। [১২৪]

সীরাহ ও সাহাবীদের জীবনী পাঠ এবং জীবন সাজানো

প্রতিটি জাতির সাথে জড়িত থাকে তাদের ইতিহাসে। ইতিহাসের উত্থান-পতন জানা যেমন জরুরি, ঠিক ইতিহাসের সূচনা সম্পর্কে জ্ঞান রাখা তার চাইতেও জরুরি। কেননা এই ইতিহাসই তার শেকড়। আর শেকড় ছাড়া যেমন গাছের অস্তিত্ব অকল্পনীয়, ঠিক তেমনি শেকড়ের ইতিহাস জানা ব্যতীত কোনো জাতির অস্তিত্বও হুমকির মুখে থাকে। আলেকজান্ডার সলযেনিতিসিন নামক একজন বিখ্যাত রাশিয়ান ইতিহাস-রচয়িতা বলেছেন, *'একটি জাতিকে ধ্বংস করার জন্য প্রথমেই সেই জাতিকে তাদের শেকড় কেটে দিতে হবে, তাদেরকে তাদের ইতিহাস ভুলিয়ে দিতে হবে।* [১২৫] ধ্বংস থেকে বাঁচতে হলে শেকড়কে চেনার প্রথম পদক্ষেপ মুসলিম উম্মাহকে তার সূচনালগ্নের ইতিহাস জানতে হবে।

তাই শেকড়ে থাকা ইতিহাস জানা জরুরি, জানতে হবে সীরাতে নবী ﷺ, সাহাবিদের(রা) জীবনী এবং তাঁদের জীবনী অনুযায়ী সাজাতে হবে জীবনকে। পূর্ববর্তীদের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে সেই ভুল থেকে বাঁচা সম্ভব উম্মাহর, আর তাদের ভুলকে সংশোধন করা হয়েছে আসমানী ওহির দ্বারা। তাই তাদের জীবনী জেনে সিরাত্বল মুস্তাক্বীমের পথে অটল থাকা সহজতর হবে।

আবার তাদের 'ইমানী পরীক্ষায় তাদের দৃঢ় অবস্থান থেকে উম্মাহ-ও নিতে পারে সবর-তাওয়াক্কুলের সবক। প্রকৃতপক্ষে কারোর জীবনী থেকে যতটা প্রভাবিত হওয়া সম্ভব তা কেবল কিতাবের ইলম পাঠের দ্বারা এত দ্রুততার সাথে জীবনে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। তাই তাদের জীবনী পাঠ করা অতীব জরুরি, তাদের জীবনী পাঠের দ্বারাই উম্মাহ তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারবে, পারবে তার ইতিহাস জেনে নিজের আসল লক্ষ্যের দিকে মনোযোগ দিতে, যে দিক হতে গাফেল করে রাখতে চায় এ যুগের কাফের-মুশরিকরা।

রসুল ﷺ এর জীবনী পাঠের দ্বারা তাঁর ﷺ জীবন অনুসারে নিজের জীবন সাজানোই হবে উম্মাতের কাজ। তাঁর ﷺ জীবনের লক্ষ্য ছিল ইসলামের প্রচার-প্রসার, ইসলামকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া, কালিমাকে বিশ্বজুড়ে বুলন্দ করা এবং সে

অনুযায়ী তিনি নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন এমনকি এই লক্ষ্যকে সাহাবীদের লক্ষ্য বানিয়েছেন, তাঁর ﷺ ওফাতের পরে সাহাবীরা সেই লক্ষ্য পূরণে সারাজীবন আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তাই নবী ﷺ এর জীবনী পাঠের দ্বারা জীবনের প্রকৃত হাকীকত উপলব্ধি করে তার সঠিক লক্ষ্যেকে জানতে পারবে উম্মাহ। সেই লক্ষ্য পূরণে তাঁর ﷺ পথচলাই হবে উৎকৃষ্ট সমাধান, আবারও নিজেদের হারানো গৌরবময় ইতিহাসকে পুনর্জীবিত করে আবারও উঠে দাঁড়াতে পারবে উম্মাহ।

সাহাবীদের জীবনী পাঠে তাদের প্রতি মহব্বত পয়দা হবে। অনুপ্রেরণা পাবে তাদের মতো হওয়ার। আর নবী আলাইহিমুস সালামদের পরে তাদের আদর্শের থেকে উত্তম আদর্শ আর কাদের হবে?
ইমাম আহমাদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন...

-مَنْ كَانَ مُتَأَسِّيًا فَلْيَتَاسَّ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّهُمْ أَبَرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ قُلُوْبًا وَاعْمَقُهَا عِلْمًا وَ أَقَلُّهَا تَكَلُّفًا وَ أَقْوَمُهَا هَدْيًا وَأَحْسَنُهَا حَالًا . قَوْمٌ إِخْتَا رَهُمُ اللهُ بِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ وَإِقَامَةِ دِينِهِ - فَاعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ وَاتَّبِعُوْا أَثَارَهُمْ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ

'কেউ যদি কারোর আদর্শের অনুসরণ করতে চায়, তবে তার উচিৎ প্রিয় নবীর সাহাবীদের অনুসরণ করা। কারণ গোটা উম্মতের মাঝে তাঁরাই অন্তরের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি পবিত্র, জ্ঞান ও ইলমের বিষয়ে গভীরতম। লৌকিকতার বিচারে স্বল্পতম, আদর্শ, চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের দিক লক্ষ করলে তাঁরা দৃঢ়তম, অবস্থার দিক দিয়ে তাঁরা ছিলেন শ্রেষ্ঠতম। তাঁরা ছিলেন এমন এক কওম যাঁরা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রিয় নবীর সাহচর্যের জন্য এবং দীন প্রতিষ্ঠার জন্য মনোনীত। অতএব, তোমরা তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের কথা জেনে রাখো এবং তাদের অনুসরণ করে চলো। কারণ তাঁরাই সরল, সোজা ও সঠিক পথে পরিচালিত।

উপরে বর্ণিত আয়াত ও হাদীসগুলোতে শুধুমাত্র সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসা, তাঁদের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং জান্নাতের ঘোষণা দিয়েই শেষ করা হয়নি বরং উম্মতের প্রতি জোরালো হুকুম দেওয়া হয়েছে যেন তাঁদের আদব-সম্মান বজায় রাখে এবং তাঁদের অনুসরণ করে চলে।[১২৬]
অর্থ্যাৎ তাদের অনুসরণ করলে সঠিক পথে চলে উম্মাহ তার বর্তমান অধঃপতিত অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে পারে। সেই জন্য তাদের জীবনী জানা জরুরি।

উম্মাহর উপলব্ধি করা জরুরি যে, যেসকল নামের মানুষকে আল্লাহ তাঁর হাবীবের ﷺ জন্য বাছাই করে তাঁর ﷺ সোহবতে থেকে ইমানের উপর পথচলা শিখিয়েছেন তাদের নাম কত-ই না বরকতময়। উম্মাহ তাদের নামগুলোকে পছন্দ করে

নিজেদের সন্তানদের নামকরণ করে অভ্যস্ত হতে পারে , পারে ছোট বেলা থেকেই সেই নামের সাহাবীকে ওই ছোট্ট শিশুকে পরিচয় করিয়ে নিতে। ছোটবেলা থেকেই পরিচয় হতো সাহাবীর সাথে, তবেই তাঁর মতো হয়ে উঠার অনুপ্রেরণা জাগবে ছোট্টবেলা থেকেই। এর সাথে সাথে সমাজেও সাহাবিদের জীবনী ছড়িয়ে পড়তো সবার মুখে মুখে, ধীরে ধীরে তাদের আদর্শকে অনায়াসে গ্রহণ করবে সমাজ। এভাবেই তাদের অনুসরণ করার জন্য প্রস্তুত হবে উম্মাহ। এভাবে সাহাবীদের জীবনী থেকে নিজেদের শিক্ষা নেওয়া এবং তা সমাজে ছড়িয়ে দিয়ে উম্মাহকে তাদের আর্দশের কথা স্মরণ করানোই হতে পারে অত্যন্ত কার্যকরী পদক্ষেপ।

কালিমাকে বুলন্দ করার যতপন্থা আছে সমস্ত পন্থার সন্ধান মিলবে, সেই পথ ধরে চললেই সফলতার দুয়ার খুলে যাবে। বিপর্যস্ত উম্মাহ ফিরে পাবে তার হারানো গৌরবকে। আর পশ্চিমাদের যে এজেন্ডা মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে তা বাঞ্চাল করে দিতে ইতিহাসকে স্মরণ রাখাই হতে পারে উপযুক্ত সমাধান। আমাদেরকে পথহারা করতে দুনিয়াবি ভোগ-বিলাসের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে পশ্চিমারা, বিনোদনের জগতকে ছড়িয়ে দিয়েছে বিশ্বজুড়ে। তাদের ফাঁদে পা দিয়ে উম্মাহ তার মূল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে আদর্শবিরোধী কাজে লিপ্ত হয়ে গেছে। ঠিক এই সময়ে নিজেদের আদর্শগতভাবে মজবুত অবস্থানে পৌঁছাতে নবীজির ﷺ জীবনী, সাহাবায়ে কেরামের জীবনী পাঠ করা দরকার। পরশপাথরের ন্যায় তাদের জীবনীও আমাদেরকে উত্তম আদর্শের অধিকারী করবে। উম্মাহ সেই সফলতার পথ ধরে অধঃপতিত অবস্থা থেকে উত্তরণের সুযোগ পাবে।

দাওয়াহ ও হিসবাহকে আঁকড়ে ধরা

নবুয়তের সূচনালগ্ন থেকে নবী ﷺ দাওয়াত দিয়ে গেছেন জীবনভর। তবে এটা করছিলেন ধারাবাহিকভাবে আল্লাহর নির্দেশক্রমে। প্রথমে গোপনে, পরে প্রকাশ্যে। দাওয়াহর পাশাপাশি মুসলিমদের ইমানের উপর অটল রাখতে হিসবাহ করার জায়গা নির্ধারণ করেন দারুল আরকামকে। তবে, কেউ ইসলাম গ্রহণে আগ্রহী হলে- এই দারুল আরকামে এসে কুরআনের বাণী শুনে অনেকেই জাহিলিয়্যাতকে ত্যাগ করে ইসলামের আলোতে প্রবেশ করেন। মাক্কী জীবনে কেবল নবী ﷺ নন বরং সাহাবীরা-ও দাওয়াতী কাজ করেছেন, ধীরে ধীরে মুসলিমের সংখ্যা বেড়েছে। সেই দাওয়াহর বরকতে মদীনার কয়েকজন ইমান গ্রহণ করলে, তার ধারাবাহিকতায় দাওয়াহর বরকতে মদিনার বেশির ভাগই দ্বীন ইসলাম প্রবেশ করে। সুসংহত হয় মুসলিমরা, স্বতন্ত্র একটি রাষ্ট্রের অধীনে থেকে দাওয়াহ ও হিসবাহ চলমান থাকে। এই দাওয়াত-তাবলীগকে অবহেলা না করে যথাযথ ভাবে এর হক আদায় করতে

হবে। কেননা এভাবে গড়ে উঠেছিল এক সোনালী জামাত, এই আদর্শ নববী আদর্শ। লক্ষ লক্ষ নবী রাসুল দাওয়াতের কাজ নিরলস শ্রম দিয়েছেন, খেটেছেন জীবনভর। জাহিলিয়্যাতে দূর করতে দাওয়াত দিতে হবে। বর্তমান এই পৃথিবীতে কুফফাররা যখন নানান তন্ত্র-মতবাদ নিয়ে হাজির তখন মুসলিমরাই দ্বিধা-সংশয়ে পড়ে ইমান হারাতে বসেছে। তাই নামধারী এসকল মুসলিমদের মাঝে স্পষ্ট করতে হবে জাহিলিয়্যাতের মুখোশ, সকল তন্ত্র-মতবাদের অসারতা ও ইসলামবিরোধী মূলনীতিগুলো সুস্পষ্ট করতে হবে, তাহলে মুসলিম উম্মাহকে বিভ্রান্তির পথ থেকে বাঁচানো সম্ভব হবে। কেননা, আমাদের হিসবাহর দায়িত্ব অবহেলার কারণে কুফরি শক্তি মুসলিমদের মাঝে বিভিন্ন ভ্রান্তমতবাদ ছড়িয়ে দিয়ে ইমান হরণ করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে এবং সফলও হয়েছে। তাই হিসবাহ-দাওয়াহ দুটোকেই অবলম্বন করতে হবে। হিসবাহর মাধ্যমে মুসলিমরা নিজেদের ঐক্যকে টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হবে। ইমাম হযরত শফি রহ. বলেন-

মুসলমানদের জাতীয় ও সমষ্টিগত কল্যাণ দু'টি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল: প্রথমে খোদাভীতি ও আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করার মাধ্যমে আত্মসংশোধন এবং দ্বিতীয়ত প্রচার বা তাবলীগের মাধ্যমে অপরের সংশোধন।[১২৭]

وَلۡتَكُنۡ مِّنۡكُمۡ اُمَّةٌ يَّدۡعُوۡنَ اِلَى الۡخَيۡرِ وَيَاۡمُرُوۡنَ بِالۡمَعۡرُوۡفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ الۡمُنۡكَرِ‌ؕ وَاُولٰٓـئِكَ هُمُ الۡمُفۡلِحُوۡنَ

তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা (লোককে) কল্যাণের দিকে আহবান করবে এবং সৎকার্যের নির্দেশ দেবে ও অসৎ কার্য থেকে নিষেধ করবে। আর এ সকল লোকই হবে সফলকাম।(০৩:১০৪)

এ আয়াতদৃষ্টে পরিলক্ষিত হয়, এক পূর্ববর্তী আয়াতে যে ঐক্যের নির্দেশনা এসেছে তা সেই ঐক্যকে স্থিতিশীল করতে দাওয়াহ-হিসবাহ তথা অপর ভাইয়ের সংশোধন করা অপরিহার্য। অপর ভাইকে সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করার কারণ এই যে তাদের হাত থেকে যেন আল্লাহর রজ্জু ফসকে না যায়।

ওস্তাদ মরহুম শায়খুল ইসলাম মাওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী বলতেন: আল্লাহর এ রজ্জু ছিঁড়ে যেতে পারে না। অবশ্য হাত থেকে ফসকে যেতে পারে। তাই এ রজ্জুটি ফসকে যাবার আশঙ্কার পরিপ্রেক্ষিতে কোরআন পাক নির্দেশ জারি করেছে যে, প্রত্যেক মুসলমান যেমন নিজে সৎকর্ম করা ও গোনাহ থেকে বেঁচে থাকাকে জরুরী মনে করার, তেমনি অপরকেও সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করাকে একটি কর্তব্য বলে মনে করবে।[১২৮]

হকের প্রতি মানুষকে ডাকা আজ মুসলিমদের ইমানী দায়িত্ব। যেহেতু মুসলিমদের অনেক বড় সৌভাগ্য যে তারা সত্য ধর্মের অনুসারী এবং যে সত্য ধর্মের উপর নেই তার কাছে সত্যকে পৌঁছে দেওয়া ইমানের একটি দাবি। মাওলানা আবু সাবের আব্দুল্লাহ বলেন, *এই হক ধর্মটা, সত্য ধর্মটা যেন প্রত্যেক ভাই পায়,*

প্রত্যেকটা মানুষ জাহান্নাম থেকে বেঁচে যায়, নাজাত পেয়ে যায়, এই ফিকির করা, এই দরদ অন্তরে পোষণ করা, এটা ঈমানের দাবি।[১২৯]

শরীয়তের সর্বসম্মত যেসকল বিষয়ের ব্যাপারে মুসলমানদের মাঝে উদাসিনতা দেখা দেয়, তবে ঐ আমল জিন্দা করার জন্য দাওয়াত দেওয়া জরুরি। অর্থ্যাৎ দাওয়াত অমুসলিম আর মুসলমান উভয়ের মাঝেই হবে। উম্মতের প্রতি দরদ নিয়ে দাওয়াত।দাওয়াত দেওয়ার মূলনীতি হলো কোমলতা ও দরদপূর্ণ আচরণ, মুসা আ. কে যখন ফিরআউনের কাছে দাওয়াত দিতে বলা হয় তখন আল্লাহ বলেন–

فَقُوۡلَا لَہٗ قَوۡلًا لَّیِّنًا لَّعَلَّہٗ یَتَذَکَّرُ اَوۡ یَخۡشٰی

তোমরা তার সাথে নরম কথা বলবে। হয়তোবা সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে। (২০:৪৪)

আমাদের নবীজি ﷺ ও দরদের সাথে দাওয়াত দিয়েছেন। নবীজি ﷺ ইরশাদ করেন–

أنا أخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها هلم عن النار، هلم عن النار

আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে কোমর ধরে ধরে টানছি। আর তোমরা আমাকে উপেক্ষা করে জাহান্নামে ঝাঁপিয়ে পড়ছ। তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচো, আমার কাছে আসো। জাহান্নাম থেকে দূরে সরো। (মুসলিম–২২৮৫)

এই দরদ অন্তরে রেখে দাওয়াত ইলাল্লাহ করতে হবে অর্থ্যাৎ সবার কাছে হকের দাওয়াত পৌছাতে হবে, এটা ঈমানের দাবি।

হিসবাহর ক্ষেত্রে কোমলতা ও কঠোরতা উভয়টি দরকার হয়। কেননা হাদিসে প্রথম ধাপে শক্তি বা ক্ষমতা প্রয়োগ, দ্বিতীয় ধাপে মুখে বলা এবং তৃতীয় স্তরে অন্তরে ঘৃণা করতে নির্দেশ দিয়েছে। সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করা যেহেতু ইমানের দাবি তাই তা করতেই হবে এবং সামর্থ্যনুযায়ী ক্ষমতা প্রয়োগ করা ওয়াজিব। হাদিসে এসেছে_

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ "

আমি রসূলুল্লাহ্ -ﷺকে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ গর্হিত কাজ হতে দেখলে সে যেন স্বহস্তে (শক্তি প্রয়োগে) পরিবর্তন করে দেয়, যদি তার সে ক্ষমতা না থাকে, তবে মুখ (বাক্য) দ্বারা এর পরিবর্তন করবে। আর যদি সে সাধ্যও না থাকে, তখন অন্তর দ্বারা করবে, তবে এটা ঈমানের দুর্বলতম পরিচায়ক।[১৩০]

দাওয়াহ-হিসবাহর জন্য দরকার জান-মালের কুরবানি। এগুলো ব্যতীত এই কাজ সফল হবেনা। মুসলমানদের মাঝে হিসবাহ করতে হবে লাগাতার। কেননা এটাই মুমিনদের শান, গুণ।

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُہُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَہٗ ؕ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُہُمُ اللهُ ؕ اِنَّ اللهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

আর বিশ্বাসী পুরুষরা ও বিশ্বাসী নারীরা হচ্ছে পরস্পর একে অন্যের বন্ধু, তারা সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজে নিষেধ করে। আর যথাযথভাবে নামায আদায় করে ও যাকাত প্রদান করে, আর আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে। এসব লোকের প্রতিই আল্লাহ অতি সত্বর করুণা বর্ষণ করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ অতিশয় ক্ষমতাবান হিকমতওয়ালা। (৯:৭১)

এই ফরজ আদায়ের জন্য যতসংখ্যক মুসলিম দরকার ঠিক ততসংখ্যক মুসলিমকেই আত্মনিয়োগ করতে হবে। অন্যথায় পরকালীন জবাবদিহিতার পাশাপাশি কুফফারদের লক্ষ্যবস্তু হবে উম্মাহর ঐক্য। সেই ঐক্য বিনষ্ট হলে মুসলিমরা কখনো মাথা তুলে দাঁড়ানোর সুযোগ পাবে না। এজন্য দাওয়াহ- হিসবাহ করতে হবে, তবে শরীয়তসম্মত উপায়ে। আর এই দায়িত্ব দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা। উম্মাহকে এই দায়িত্বভার নিতে হবে, তবেই মিলবে মুক্তি।

নারীদের মাঝে ব্যাপক দাওয়াহ

নারীদেরকে সংশোধন করতে সক্ষম হলে পশ্চিমারা তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেডের ময়দানে পরাজিত হবে। নারীদেরকে ইসলাহ করলেই অবসান ঘটবে অনেক গুনাহের, বন্ধ হবে নাফরমানির বহু দুয়ার। মুসলিম সমাজে কমবে ফিতনা, আল্লাহর রহমত বর্ষিত হবে। ফিতনামুক্ত সমাজে সফলতার দিকে গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে চলবে মুসলিম উম্মাহ।

প্রথমত তাদেরকে পর্দার হুকুমে আনার প্রচেষ্টা করতে হবে। কারণ যে আল্লাহর হুকুম মানবে তাকেই সর্তক করা যাবে, বুঝানো যাবে যে – 'তাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করছে কুফফাররা, সুতরাং তাদের কথায় কর্ণপাত না করে আল্লাহর মনোনীত দ্বীনের অনুসরণ করোই হবে বুদ্ধিমতীর লক্ষণ।' পর্দার হুকুমকে আঁকড়ে ধরলে জিনা-ব্যভিচার কমে যাবে, ধর্ষণের হারও কমে যাবে। কেননা সমাজে যত

অশ্লীলতার পরিমাণ কমবে, ঠিক সেই হারে ব্যভিচার কমে যাবে। ইসলামে নারীর সম্মানজনক অবস্থার কথা জোরেশোরে প্রচার করতে হবে যেন নারীরা নিজেরাই ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে দ্বীন পালন করা শুরু করে। ইসলামে নারীর ইজ্জতের মূল্যকে উম্মতের সামনে তুলে ধরা অতীব জরুরি। বনু কায়নুকার যুদ্ধ হওয়ার কারণ ছিল একজন মুসলিম নারীকে বিবস্ত্রীকরণ। ঘটনাটি ছিল এইরূপ- সেই মহিলা ইহুদিদের বাজারে কিছু ক্রয় করার জন্য গেলে তাকে জোর করা হয় নিকাব খুলতে, নিকাব খুলতে না চাইলে কাপড়ের নিচের দিকটা আটকে দেয়। যখনই তিনি কাজ সেরে উঠতে যান তার নিম্নাংশের কাপড় সরে গেলে তিনি চিৎকার দিয়ে উঠেন, সাথে সাথে একজন মুসলিম এসে ওই ইহুদিকে হত্যা করে এবং পরে ইহুদিরা সেই মুসলিমকে হত্যা করে। ঘটনাটি তাৎপর্য অনেক – একজন মুসলিম নারীর ইজ্জতের উপর কোনোপ্রকার আঘাতকে বরদাশত করা হয় না ইসলামে। এমনকি মুসলিম ভাইয়েরাও এ ব্যাপারে যথেষ্ট যত্নশীল ছিলেন। ইতিহাস বারবার এই সাক্ষ্য দেয়।

কিন্তু বর্তমানে নারীরা দ্বীন থেকে দূরে সরে গিয়ে পর্দার হুকুম তরক করায় তাদের ইজ্জত ধূলায় লুন্ঠিত হচ্ছে। ধর্ষণের শিকার হচ্ছে নারী ও শিশুরা। কিন্তু মুসলিম কর্তৃক মুসলিমকে ধর্ষণ প্রকৃতপক্ষে এক আজিব ব্যাপার, মুসলিম ভাইয়েরা বরং বোনের ইজ্জতের উপর আঘাতে বোনের সাহায্যে এগিয়ে আসার কথা। এই সমস্যা থেকে উত্তরণে ইসলামে নারীর সম্মানবোধকে নারীদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে। এর সাথে সাথে সমাজের মুসলিম পুরুষদেরকে-ও নারীদের ব্যাপারে সচেতন ও যত্নশীল হওয়ার বিষয়টিকে জোরদার করতে হবে। জিনার ভয়াবহতা সুস্পষ্ট করাও জরুরি, হুদুদের অভাবে মুসলিমদের হৃদয়ে এর সংবেদনশীলতা কমে গিয়েছে। এজন্য হিসবাহ-ইসলাহের বিকল্প নেই, হুদুদের আইনকে জানিয়ে দিতে হবে সর্বস্তরে।

পশ্চিমারা বালআ'মের প্রেসক্রিপশনে পোশাকের মাধ্যমে যে অশ্লীলতাকে ছড়িয়ে দিচ্ছে তা দমনে ইসলামিক সুন্নতী পোশাকের প্রচার-প্রসার দরকার। মেয়েদের মাঝে সুন্নতের মর্যাদাকে তুলে ধরে সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার পরামর্শ দিতে হবে। পারিবারিক ভাবে ও সামাজিকভাবে এ ধরণের সুন্নতী পোশাকের প্রচলনকে স্বাভাবিক করে তুলতে হবে। মেয়েদেরকে সুন্নতী পোশাক পরিধান না করিয়ে ছোটবেলা থেকে পশ্চিমা ধাঁচের পোশাকে অভ্যস্ত করানো এক মস্ত বড় ভুল, এই ভুল চর্চার ও অবসান দরকার। ছোট মেয়েদেরকে-ও যেন পশ্চিমা ও ফাসেকদের অনুসরণে তৈরি পোশাক পরিধাম না করানো হয় - এ ব্যাপারে সামাজিকভাবে সচেতনতা করতে হবে। এজন্য নারীদের মাঝে দাওয়াতি কার্যক্রম মজবুতির সাথে করা অতীব জরুরি। কেননা, পোশাকের সাথে আদর্শের বিষয়টি অঙ্গাঅঙ্গিভাবে

জড়িত–যেই পোশাককে সে ধারণ করবে সেই আদর্শকেই সে মনে মনে লালন করবে। সুন্নতী পোশাকে অভ্যস্ত নারীরা অবশ্যই ইসলামী ভাবধারার হবে। ফলে পর্দার হুকুমে চলা তাদের জন্য সহজতর হবে, সমাজ ও অতি দ্রুত ফিতনা মুক্ত হবে।

সমাজে চলমান ফাহেশা ও অন্যায় দমনে নারীদের সংশোধন করা জরুরি। এতে সফল হতে পারলে ধ্বংসের হাত হতে বাঁচা সম্ভব। বালআ'ম বাউরার কথা মোতাবেক নারীদেরকে মুসলিম মুজাহিদদের মাঝে জিনার উদ্দ্যেশ্যে লেলিয়ে দিলে বনী ইসরাইলের একজন ফিতনায় পড়ে যায় এবং নবী মুসা (আ) এর নিষেধ সত্ত্বেও তাতে লিপ্ত হলেই প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে। কেবলমাত্র এক ব্যক্তির ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার কারণে আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করেন। তাতে একই দিনে সত্তর হাজার ইসরাঈলী মৃত্যুমুখে পতিত হল। এমনকি যে লোক অসৎকর্মে লিপ্ত হয়েছিল, তাকে এবং যার সাথে লিপ্ত হয়েছিল তাকে বনী–ইসরাঈলরা হত্যা করে প্রকাশ্যে টাঙ্গিয়ে রাখল, যাতে অন্যান্যরা শিক্ষা গ্রহণ করে এবং তারা সবাই তওবাও করল। তখন সে প্লেগ দমিত হল। অর্থ্যাৎ যখন তারা এটা দমন করার ব্যবস্থা নেয় তখনই আল্লাহ তার আযাব সরিয়ে নেন। তাই মুসলিম উম্মাহর মাঝে ব্যভিচারের প্রকটতা দমনে নারীদেরকে ইসলাহ করা সময়ের দাবি।

নারীরাই সন্তানদের চিন্তাভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং ছোটবেলা থেকেই নারীর অধীনেই থাকে শিশুরা যখন তাদের মানসিক বিকাশ হয়। খিলাফাহকে পুন:প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রাথমিকভাবে প্রয়োজন এমন একটি প্রজন্ম গড়ে তোলা যারা পরিপূর্ণ ইসলামি ভাবধারার হবে এবং ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার মতো মনমানসিকতা রাখবে। এজন্য উম্মাহর নারীদের মাঝে দাওয়াহ দিতে হবে এবং সন্তানদেরকে সেই মোতাবেক গড়ে তোলার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তাছাড়া তারাও যেন সমসাময়িক অন্যানয় নারীদেরকেও এ ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করতে মনোযোগী হয় সেটা–ও নিশ্চিত করতে হবে।

নারীবাদের ফিতনায় আক্রান্ত প্রতিটি মুসলিম দেশের অধিকাংশ নারী, এমনকি আরবদেশগুলোতেও এটি ছড়িয়ে পড়েছে। এর কারণ সমাজে নারীরা যে অধিকার ইসলাম কর্তৃক পাওয়ার কথা তা যথাযথভাবে আদায়ে হক্বদাতাদের ঘাটতি এবং নারীবাদের ফাঁকাবুলিতে নারীদের পক্ষে আলাপ। আরেকটি সুস্পষ্ট কারণ এবং এটাই প্রধানতম কারণ–তা হলো পশ্চিমা এজেন্ডা এবং তা বিশ্বব্যপী ছড়িয়ে দেওয়া। শিক্ষার কারিকুলামে এমন সব বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত করা যা তার অজান্তেই তার অন্তরে নারীবাদের বীজ বপন করে কিংবা নেটদুনিয়ার সহায়তায় নারীদের মাঝে তার ভিত্তি স্থাপন করে। পরবর্তীতে স্লোগান কিংবা ক্যারিয়ার গঠনের নামে নারী–পুরুষকে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত করে নারীদেরকে ঘর থেকে বাহিরে বের করা

এবং পরিবার ব্যবস্থাকে ধসিয়ে দেওয়া হয়। তাই নারীদেরকে জীবনের প্রকৃত হাকিকত বুঝিয়ে দীনের প্রকৃত অনুসরণ করে ঘরে অবস্থান করার দিকে আহ্বান করা জরুরি এবল এটা তার মাঝে দুনিয়ার নিকৃষ্টতা তুলে ধরে আখিরাতের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরার দ্বারা সম্ভব। অত:পর, তার কাছে পশ্চিমা এজেন্ডার ফাঁকাবুলির প্রকৃত বাস্তবতা–তাদের দেশে নারীদের অবমূল্যায়নকে তুলে ধরা জরুরি। এটা স্পষ্ট করে বুঝাতে পারলে নারীদেরকে ধ্বংস করার নীলনকশা বাতিল করা সম্ভব হবে।

আমেরিকার RAND কর্পোরেশন কর্তৃক ২০০৭ সালে প্রকাশিত 'Building Moderale Muslim Networks' এ বলা হয়েছে...'*ইসলামের বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ে নারী অধিকারের ইস্যুটি অন্যতম বৃহত্তম রণাঙ্গন।*' এইরণাঙ্গনে মুসলিমদের জিততে হলে নারীবাদের মূল 'নারী–পুরুষ সমান অধিকারের ইস্যু'–কে টার্গেট করে নারীদেরকে দাওয়াহ দিতে হবে। এজন্য সমান অধিকারের বিপরীতে ইনসাফপূর্ণ অধিকার নিশ্চিতে ইসলামের ভূমিকাকে প্রচার করতে হবে নারীদের মাঝে। তার সাথে সাথে আসমানী বিধানদাতা আল্লাহর হুকুমকে মানা যে ইমানের দাবি এবং আল্লাহর হুকুমের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকা যে ইমান ভঙ্গের কারণ তাও নারীদের মাঝে সুস্পষ্ট করার জন্য দাওয়াহ দিতে হবে। তাহলেই পশ্চিমাদেরকে পরাস্ত করা সম্ভব হবে বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেডে।

শাহাদাতের তামান্না রাখা ও জিহাদ করা

নবীজি ﷺ বলেছেন, "যে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ না করে অথবা যুদ্ধের বাসনা মনে না রেখে মৃত্যুবরণ করল, সে নিফাকের একটি শাখার ওপর মৃত্যুবরণ করল।"[১৩১] প্রতিটি মুসলিমের হৃদয়ে আল্লাহর রাস্তায় শহিদ হওয়ার তামান্না, আকাঙ্ক্ষা লালন করতে হবে। এই শাহাদাতের মৃত্যুর স্বাদ অন্যরকম। শহিদদের রুহ কবজের সময় অনুভব হয় সবচেয়ে কম মৃত্যুযন্ত্রণা। আর শহিদরা জীবিত ও আল্লাহর পক্ষ থেকে রিযিকপ্রাপ্ত। শাহাদাতের এতসকল ফজিলত উম্মতকে জানানোর পর বিলাসিতা ও দুনিয়ার মোহে 'দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়া' উম্মতের মুসলমানদের নিকট কষ্টসাধ্য মনে হয়। অথচ সত্য এটাই যে মৃত্যুর সময় নির্দিষ্ট এবং তা এড়ানো সম্ভব নয়। এই ভয়ের কারণও স্পষ্ট। মানুষ যে জীবনের জন্য জান–মাল খরচ করে তার প্রতিই তার মায়া বসে যায় এবং তা পরিত্যাগ করা কষ্টকর হয়। দুনিয়াবি কাজে অধিক কষ্ট ও মাল খরচ করার ফলে মৃত্যুর ভয়

অন্তরে সঞ্চার হয়। এই জন্য শাহাদাতের তামান্নাকে গেঁথে দিতে হবে উম্মতের প্রতিটি হৃদয়ে।

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

"যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদের মৃত ভেবো না। বরং তারা জীবিত। তাদের প্রতিপালকের সান্নিধ্যে থেকে তারা রিযিকপ্রাপ্ত হচ্ছে।"(৩:১৬৯)

নবীজি ﷺ বলেন, "শহীদদের আত্মাগুলো থাকে সবুজ পাখির ভেতরে, যারা আল্লাহর আরশ থেকে ঝুলে থাকা ঝাড়বাতিদানে বসা থাকে এবং জান্নাতের যেখানে খুশি সেখানেই ঘুরে বেড়ায়।"[১৩২]

বিছানায় মৃত্যুকে সাহাবীরা অপমান ও লজ্জার মৃত্যু মনে করতেন, কাপুরুষতার লক্ষ্মণ ভাবতেন। আর সুলতান নুরুদ্দীন মাহমুদ জীবনভর জিহাদের ময়দানে কাটিয়েছেন, একক খিলাফাহ পুন:প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালন করেছেন, অথচ তার বক্তব্য ছিল এরূপ...*'আমি একাধিকবার শাহাদাতের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলাম, কিন্তু শাহাদাত-সৌভাগ্য নসিব হয়নি। যদি আমার মাঝে কোনো কল্যাণগুণ থাকত এবং আল্লাহ তাআলার কাছে আমার সামান্য মূল্যও থাকত, তাহলে তিনি অবশ্যই আমাকে শাহাদাতের সৌভাগ্য দান করতেন। অবশ্য আমলের গ্রহণযোগ্যতা নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।'* শাহাদাতের তামান্না তাদের হৃদয়ের গহিনে, সমস্ত শিরা-উপশিরায় ছড়িয়ে ছিল। উম্মতেরও এমন তীব্র আকাঙ্খা লালন করতে হবে ইতিহাসের পাতা থেকে শিক্ষা নিয়ে।

ইবনু তাইমিয়্যাহ বলেন, "সকল মুসলিম একমত যে যুদ্ধের বিধানের ভিত্তি হলো জিহাদ, যাতে দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায় এবং তাঁর কালিমা সুউচ্চ হয়ে যায়। যে-কেউ জিহাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে, তার বিরুদ্ধে লড়াই করা ইজমা অনুযায়ী বাধ্যতামূলক। কিন্তু যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা নিষেধ, যেমন: নারী, শিশু, সন্ন্যাসী, বৃদ্ধ, অন্ধ, জিযিয়া প্রদানকারী আহলে কিতাব, তারা ইসলামের বিরুদ্ধে কথা ও কাজ দিয়ে যুদ্ধ না করলে তাদের হত্যা করা হবে না।" এটিই জমহুর উলামার ইজমা।[১৩৩] জিহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হওয়ার দ্বারাই লাঞ্ছিত অবস্থা হতে আল্লাহ উদ্ধার করবেন, কেননা এটি একটি ফরজ বিধান যা দেওয়াই হয়েছে বিজয় অর্জনের মাধ্যম হিসেবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: যখন তোমরা বাইয়ে ঈনাহ বা সূদভিত্তিক ক্রয়-বিক্রয় শুরু করবে, গরুর লেজ ধারণ করে থাকবে, অর্থাৎ কৃষি কাজ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে আর জিহাদ ছেড়ে দেবে

তখন আল্লাহ তা‘আলা তোমাদেরকে লাঞ্ছনায় পতিত করবেন; আর এ লাঞ্ছনা দূর হবে না যতক্ষণ না তোমরা নিজেদের সঠিক দীনের দিকে ফিরে আসবে।[১৩৪]
নবীজি ﷺ এক হাদিসে জিহাদকে সাব্যস্ত করেছেন ছাদ বা চূড়া, পাঁচ ভিত্তির উপরের ছাদ হলো জিহাদ। অর্থ্যাৎ ভিত্তি কখনো বাড়ির পূর্ণতা দেয় না, বরং ছাদ তার পূর্ণতা ও সুরক্ষাদানে জরুরি। নয়তো ভিত্তি থাকা সত্ত্বেও ‘মুসলিমরা নিরাপদ থাকবে না; বিশ্বজুড়ে এ কারণেই নিরপত্তাহীনতায় নির্যাতিত অবস্থা বিরাজমান। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর বিকল্প নেই।

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ۚ وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۚ وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ؕ

তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর পথে এবং অসহায় নরনারী ও শিশুদের (উদ্ধারের) জন্য সংগ্রাম করবে না? যারা বলছে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! অত্যাচারী অধিবাসীদের এই নগর হতে আমাদেরকে বাহির করে অন্যত্র নিয়ে যাও এবং তোমার নিকট হতে কাউকে আমাদের অভিভাবক কর এবং তোমার নিকট হতে কাউকে আমাদের সহায় নিযুক্ত কর।’(৪:৭৫)

আমাদের নফসের অবস্থা...

وَقَالُوْا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَاۤ اَخَّرْتَنَاۤ اِلٰۤى اَجَلٍ قَرِيْبٍ

আর তারা বলল, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান কেন দিলেন? কেন আমাদেরকে আর কিছু কালের অবকাশ দিলেন না?’(৪:৭৭)
এজন্য রব্বে কারীম বলেন–

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ ۚ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى ۟ وَلَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا، تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ ؕ

বল, ‘পার্থিব ভোগ অতি সামান্য এবং যে ধর্মভীরু তার জন্য পরকালই উত্তম। আর তোমাদের প্রতি সুতো বরাবর(সামান্য পরিমাণ)ও যুলুম করা হবে না।’তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই; যদিও তোমরা সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান কর।(৪:৭৭-৭৮)
নবিজী ﷺ বলেছেন,“ আমাকে কিয়ামতের আগে তরবারিসহ প্রেরণ করা হয়েছে যতদিন না কোনো শরীক ছাড়া এক আল্লাহর উপাসনা করা হয়।”[১৩৫]

জিহাদ করতেই হবে, এজন্য প্রয়োজন আত্মত্যাগ। নিজের পার্থিব জীবনের মায়াকে ত্যাগ করে ইমারত প্রতিষ্ঠা করতে হবে, কয়েকটি ইমারত মিলে খিলাফাহ

পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব। কিছু এর জন্য শুরুটা হবে শাহাদাতের তামান্না রেখে জিহাদের ময়দানে নেমে পড়ার দ্বারা। বর্তমান সময়ে জিহাদ সম্পর্কিত মন্দ ধারণা বা বিকৃত ধারণা, তথা একে সন্ত্রাসবাদ আখ্যায়িত করার পরিবর্তে জিহাদ সম্পর্কে উম্মাহর সুধারণা ও সঠিক জ্ঞান রাখা জরুরি। তাছাড়া শারীরিক সামর্থ্য, সামরিক শক্তি, জামাআতবদ্ধ থাকা - যেসকল বিষয়ে ঘাটতি আছে সে বিষয়ে যত্নবান হওয়া। ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "যখন দুর্বলতার কারণে জিহাদ করা সম্ভব থাকে না, তখন জিহাদের প্রস্তুতি নেওয়া ফরয হয়ে যায়। কারণ যেটি অর্জন ব্যতিরেকে কোনো ফরয দায়িত্ব আটকে থাকে, সেটি অর্জন করাটাই ফরয হয়ে যায়।"[১৩৬] মাদানী জীবনের ১০টি বছরে নবীজি ﷺ সরাসরি ২৭টি জিহাদের নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁর ﷺ পরবর্তীতে অন্যান্য খলিফাগণ ইসলামকে কালিমাকে বুলন্দ করতে জিহাদের ঝাণ্ডাকে সমুন্নত রেখে ইসলামী রাষ্ট্রের সম্প্রসারণ করেন। কালিমাকে বুলন্দ করার এবং আল্লাহর জমিনে আল্লাহর শাসন কায়েম করা। এটা এই উম্মতের বৈশিষ্ট্য, একদল এই জিহাদ করতেই থাকবে। নবীজি ﷺ বলেছেন, "আমার উম্মাতের মাঝে একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে শত্রুদের পরাজিত করতে থাকবে এবং বিরোধিতাকারীদের কোনো পরোয়া করবে না।"[১৩৭] দাওয়াহ ও হিসবাহ দ্বারা যখন ফাসাদ-ফিতনা জমিন থেকে দূর করা সম্ভব না, তখন জিহাদের মাধ্যমে তা দূর করা সম্ভব। এর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট। মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে আল্লাহর দাসত্বের দিকে নিয়ে আসা, পরিস্থিতি অনুযায়ী কর্মপন্থা একেকরকম হতে পারে। *পারস্য সেনাপতি রুস্তম যখন জানতে চাইল, "কীসে তোমাদের এখানে আনল?" তখন মুসলিম সেনা রিবিঈ বিন আমির জবাব দিয়েছিলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের প্রেরণ করেছেন মানুষকে সৃষ্টির দাসত্ব থেকে বের করে স্রষ্টার দাসত্বের দিকে নিয়ে আসার জন্য। মানবরচিত ধর্মের যুলুম থেকে বের করে ইসলামের ন্যায়পরায়ণতার দিকে নিয়ে আসার জন্য। এই দুনিয়ার কাঠিন্য থেকে বের করে আখিরাতের আরাম-আয়েশের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য।"*[১৩৮]

এই ইবাদত আল্লাহর ইচ্ছায় মুমিনদেরকে অসম্মান-অপমানের জীবন থেকে উদ্ধার করে সম্মান-মর্যাদার দিকে নিয়ে যায়। কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদের সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়মগুলো স্পষ্টভাবে বর্ণনা আছে সূরা আত-তাওবাতে। তাতে আল্লাহ আদেশ দেন যে সকল কাফিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। এভাবে জিহাদ পরিণত হলো আল্লাহর দ্বীনকে ছড়িয়ে দেওয়ার ও আল্লাহর কালামকে বুলন্দ করার একটি ফরয বিধানে।

ইমানের একটি বড় দাবি হলে ইসলামকে সর্বক্ষেত্রে বিজয়ী করা। এই জযবা, কামনা দিলে লালন করতে হবে। সাধ্যমত দাওয়াহ, হিসবাহ করার পর পরিস্থিতি সাপেক্ষে জিহাদ করার প্রয়োজন হলে তা করতে এগিয়ে আসতে হবে। উলামায়ে

কেরামের কখন জিহাদ ফরজে আইন, কখন ফরজে কিফায়া তা সুস্পষ্ট করে বললে সে অনুযায়ী উম্মাহকে জিহাদ করার করতে হবেই। কেননা এর দ্বারাই সাহাবীদের মতো সম্মানিত জীবন পাওয়া সম্ভব, জিল্লতির ও অপমানের এই অবস্থা থেকে উত্তরণ করা সম্ভব।
আল্লাহ বলেন–

هو الَّذِیٓ اَرۡسَلَ رَسُوۡلَهٗ بِالۡہُدٰی وَدِیۡنِ الۡحَقِّ لِیُظۡہِرَهٗ عَلَی الدِّیۡنِ کُلِّهٖ ۙ وَلَوۡ کَرِهَ الۡمُشۡرِکُوۡنَ

তিনিই পথনির্দেশ (কুরআন) এবং সত্য ধর্ম সহ নিজ রসূল প্রেরণ করেছেন, যাতে তাকে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন, যদিও মুশরিকরা অপ্রীতিকর মনে করে।(৯:৩৩)
আরেকটা হাদীসে নবীজি ﷺ বলছেন–

إن الإسلام يعلو ولا يعلى

ইসলাম বিজয়ী হওয়ার জন্য এসেছে। ইসলাম পরাজিত হওয়ার জন্য আসেনি।[১৩৯]

এ কারণে ফরজ জিহাদ ত্যাগ করা নয় বরং এর উপর আমল করতে হবে। পরিপূর্ণ দ্বীনে দাখিল হয়ে জিহাদ করে খিলাফাহকে প্রতিষ্ঠা করার দ্বারাই মুসলিম উম্মাহ তার হারানো গৌরবকে ফিরে পাবে, ইন শা আল্লাহ।

দুনিয়ার মুহাব্বত ত্যাগ

মুসলিম উম্মাহ ভোগ-বিলাসিতায় মত্ত হয়ে আছে। তারা পার্থিব উন্নতির পিছনে এমনভাবে ছুটছে যা অকল্পনীয়, কেননা এমনভাবে তার আখিরাতের পানে ছোটার প্রয়োজন। পার্থিব উন্নতি না হওয়াকে বিফলতা আর ধনসম্পদের প্রাচুর্যকে সফলতা মনে করছে। সফলতার মানদণ্ড বদলে গেছে উম্মাহর নিকট কেবল এই নিকৃষ্ট দুনিয়ার মোহে পড়ে। উম্মতের মাঝে আখিরাতের চিন্তা কমে গিয়ে গুনাহে লিপ্ত হও মাত্রা তা-ই উচ্চহারে বেড়ে গিয়েছে, কিন্তু এটা যে তার ধ্বংসের কারণ তা ঘুণাক্ষরেও টের পায়না। *ইসলামের বিজয় আনতে যত কুরবানি প্রয়োজন, তা দুনিয়াবিমুখিতা ছাড়া অসম্ভব। এই পাথেয়ের অভাব থাকলে সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে।*[১৪০] এ কারণে উম্মাহকে অবশ্যই দুনিয়ার মোহে আচ্ছন্ন হওয়া যাবে না, হৃদয় থেকে ঝেটিয়ে বিদায় করতে হবে দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা। এটার দ্বারা ধ্বংস থেকে পরিত্রাণ পাবে উম্মাতে ইসলামিয়্যাহ। বিজয় আসবে তখনই সাহাবিরা দুনিয়ার পিছনে ছুটতেন না, তাদের পিছনে দুনিয়া ছুটত। দুনিয়াবি মাল পেয়ে তারা দুনিয়ায় ডুবে যাননি, বরং তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করেছেন। বাস্তবতা

হলো, দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী এবং ধোঁকাবাজ। দুনিয়ার নাগাল কখনো পাওয়া যাবে না, তবে যখন পরকালকে মূল উদ্দেশ্য, টার্গেট বানাতে পারবে তখন দুনিয়া তার পিছনে আসবে, অর্থ্যাৎ আল্লাহ তাকে দুনিয়ার প্রয়োজন পূরণ করে দিবেন এবং অভাব মোচন করবেন। নুরুদ্দিন মাহমুদের একটি ঘটনা উল্লেখ কথা থাকা–

একদিন তিনি তার জনৈক সঙ্গীকে নিয়ে ঘোড়ায় আরোহণ করে কোথাও যাচ্ছিলেন। সূর্য ছিল তাদের পেছনে, ছায়া ছিল সামনে। তারা দ্রুত ছুটেও ছায়ার নাগাল পাচ্ছিলেন না। ফিরতি পথে ছায়া পেছনে চলে যায় (কারণ, সূর্যের অবস্থান তখন সামনে)। নুরুদ্দিন তার ঘোড়াকে খুব দ্রুতগতিতে পরিচালিত করেন, ছায়াও দ্রুত পিছু পিছু চলতে থাকে। তখন তিনি তার সঙ্গীকে বলেন, 'জানো, আমাদের এই পরিস্থিতির সঙ্গে কিসের তুলনা হতে পারে? আমি একে তুলনা করছি দুনিয়ার সঙ্গে। যে তার নাগাল পেতে পিছু ছুটে বেড়ায়, দুনিয়া তার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ায়। আর যে দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করে পালাতে চায়, দুনিয়া তার পিছু ছুটতে থাকে।

উম্মাহর ইতিহাসে শাসকরা যখন তাকওয়াবান ও দুনিয়ার ব্যাপারে নির্মোহ থেকেছেন তখন মুসলিমরা হকের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত, কাফেরদের বিরুদ্ধে দোর্দন্ড প্রতাপের সাথে অর্জনকারী। কিন্তু যখনই খলিফার ও শাসকরা দুনিয়াবি ভোগবিলাসিতায় নিমজ্জিত থাকতেন, তখনই জিহাদ হেড়ে দিতেন, ফলাফল - কুফফাররা মুসলিম ভূমিগুলোকে দখল করে ফেলতো। ইতিহাস সাক্ষী–দুনিয়াবিমুখ শাসকরাই উম্মাহকে সুরক্ষিত একটি পরিবেশ দিতে পেরেছিল। তাই দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্ত হয়ে আখিরাতকে উদ্দেশ্য করার প্রতি উম্মাহকে মনোযোগী হতে হবে। তাদের শাসনে তৎকালীন মুসলিমরা-ও ভোগবিলাসিতায় কম লিপ্ত হতো।

দুনিয়া হলো জরুরত - এটা কঠিন বাস্তবতা। দুনিয়া মাকসাদ না, মাকসাদ আখিরাত। দুনিয়ার আসক্তি ধ্বংস ডেকে আনবে। দুনিয়া আখিরাতের এই বিষয়টি এভাবে বলা যায় –

"নৌকার যখন তার গন্তব্য পৌঁছতে চায় তখন তাকে নদীর উপর দিয়ে চলতে হয়। সেই পথে নৌকায় যতটুকু পানি প্রবেশ করে তা বাইরে ফেলে দিতে হয় যাতে একসময় নৌকা ডুবে না যায়। পানি অপসারণ করতে থাকলে তার গন্তব্যে পৌঁছাতে সক্ষম হবে।"এখানে নদীর উপমা দুনিয়া আর গন্তব্য হলো আখিরাত। নৌকা একটি মানুষের দৃষ্টান্ত। কেউ যদি দুনিয়াকে নিজের মাঝে স্থান দিতে চায় তবে তার ধ্বংস নৌকাডুবির ন্যায় অবশ্যম্ভাবী। আর যদি দুনিয়াকে জরুরত গণ্য করে দূরে সরিয়ে দেয় পানি অপসারণের ন্যায়, তবে তা তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছাতে বাঁধা হবে না।"

এমনকি আসমানি ইলমের বরকত তারাই পাবে যারা দুনিয়ার মোহ থেকে মুক্ত। কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী চলার জন্য দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা থাকা যাবে

না, থাকলেই তা বাধা হয়ে দাঁড়াবে। আবদুল্লাহ (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'ইলম বা জ্ঞানের ধারক-বাহকগণ যদি নিজেদের জ্ঞানকে সুরক্ষিত রাখতেন এবং তা উপযুক্ত ব্যক্তিদের নিকট পেশ করতেন, তাহলে তারা এই জ্ঞানের মাধ্যমে সমকালীন লোকদের নেতৃত্ব দিতে পারতেন। তা না করে, তারা জ্ঞানকে নিয়ে গেছেন দুনিয়া-পূজারিদের সামনে; ফলে তারা তাচ্ছিল্যের শিকার হয়েছেন।[১৪১] আসমানী ইলম তাদের কোনো উপকারে আসে না যাদের হৃদয়ে দুনিয়ার মুহাব্বত থাকে। *হযরত শকীক বলখী (রহ.) বলেছেন- যদি কোন ব্যক্তি এক সিন্দুক জ্ঞান অর্জন করে এবং তার মধ্যে এই তিনটি গুণ না থাকে তাহলে ইলমের দ্বারা তার কোন উপকার হবে না। গুণ তিনটি হলো- ১. তার অন্তরে দুনিয়ার কোন মহব্বত থাকতে পারবে না। কারণ, এই দুনিয়া মুসলমানের ঠিকানা নয়।.....*[১৪২]

আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে দুনিয়া ভোগ-বিলাসিতা থেকে হিফাজত করেন। দুনিয়ার ভোগ-বিলাসিতা পরীক্ষার বস্তু, এক প্রকার ফিতনা। দুিয়ার মূল্য আল্লাহর কাছে মশার একটা ডানার সমান হলেও দুনিয়ার ভোগ-বিলাসকে আল্লাহ তুলনা করেছেন 'পশুর বিষ্ঠা ও আবর্জনা'র সাথে আর দুনিয়ার চাকচিক্যকে তুলনা করেছেন ধ্বংসাত্মক চারণভূমির সাথে। 'পশুর বিষ্ঠা ও আবর্জনায় ভরপুর জায়গায় কোনো উট বিশ্রাম নিতে চাইলে রাখাল যেভাবে তার উটকে তাড়িয়ে অন্যদিকে নিয়ে যায়, তেমনিভাবে আমি আমার বন্ধুদেরকে দুনিয়ার ভোগ-বিলাস থেকে তাড়িয়ে দিবো; রাখাল যেভাবে তার উটকে ধ্বংসাত্মক চারণভূমি থেকে দূরে রাখে, আমিও সেভাবে আমার বন্ধুদেরকে দুনিয়ার চাকচিক্য থেকে দূরে রাখবো। এর মাধ্যমে আমি তাঁদের অবস্থানকে উজ্জ্বল করতে চাই, তাঁদের অন্তঃকরণসমূহকে পবিত্র রাখতে চাই। এটি তাঁদের চিহ্ন-যা দিয়ে তাঁদেরকে শনাক্ত করা যাবে, আর এটিই তাঁদের জন্য গৌরবের ব্যাপার' [১৪৩]

আল্লাহ তায়ালা তাঁর হাবিবকে উদ্দেশ্য করে দুনিয়ার জাঁকজমকপূর্ণ বস্তুর দিকে তাকাতেই নিষেধ করেছেন। যদি নবী ﷺ কে আল্লাহ এভাবে বলেন, তাহলে মুমিনদের এ ব্যাপারে কতটুকু সাবধান থাকা উচিত। রসুল ﷺ এর অন্তর ছিল পবিত্র এবং নিষ্কলুষ, আর উম্মতের অন্তরের অবস্থা এত উঁচু পর্যায়ে নেই যে সে নিজেকে এই ফিতনা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হবে।

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ؕ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى

আর তুমি কখনো প্রসারিত করো না তোমার দু'চোখ সে সবের প্রতি, যা আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে দুনিয়ার জীবনের জাঁক-জমকস্বরূপ উপভোগের উপকরণ হিসেবে দিয়েছি। যাতে আমি সে বিষয়ে তাদেরকে পরীক্ষা করে নিতে পারি। আর তোমার রবের প্রদত্ত রিযক সর্বোৎকৃষ্ট ও অধিকতর স্থায়ী। (২০:১৩১)

দুনিয়াতে আরাম আয়েশ করতে চাওয়া মুমিনের সিফাত নয়। কেননা মুমিন ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াতে কষ্ট করবে আর চিরস্থায়ী আখিরাতের জীবনে ভোগ করবে, আরাম করবে। কিন্তু দুনিয়ায় বিলাসিতায় ডুবে থাকবে না। নবিজী ﷺ উম্মতের প্রাচুর্যের ব্যাপারে ভয় করেছেন, দারিদ্র্যের নয়। কেননা, প্রাচুর্য উম্মতের মাঝে দুনিয়াপ্রীতি তৈরি করে যা উম্মতের মাঝে পরকাল ভাবনাকে কমিয়ে দেয়। তখন কুফফাররা তাদেরকে ধ্বংসের ফিকিরে লিপ্ত থাকা অবস্থায় উম্মত থাকে ভোগ বিলাসিতায় নিমজ্জিত। দুনিয়ার ভালোবাসার ফলে নির্বিকার অবস্থা তাদেরকে খড়কুটোর মতো ভাসিয়ে নিয়ে যাবে বলেই হাদিসে সতর্ক করা হয়েছে। 'নবি ﷺ বলেছেন,

الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ

দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানা আর কাফিরের জন্য জান্নাতস্বরূপ।" [১৪৪]
ইবনু উমার (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাপড় কিংবা শরীরের কোনো এক অংশ ধরে বললেন,

يَا عَبْدَ اللَّهِ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُوْرِ

"আবদুল্লাহ! দুনিয়াতে এমনভাবে থাকো যেন তুমি একজন অপরিচিত ব্যক্তি কিংবা মুসাফির, আর নিজেকে কবরের বাসিন্দাদের অন্যতম হিসেবে গণ্য করো।"[১৪৫]
আবূ যার গিফারি (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একব্যক্তি নবি ﷺ-এর নিকট এসে বললো, 'হে আল্লাহ'র রাসূল, দুর্ভিক্ষ তো আমাদেরকে খেয়ে ফেললো।' নবি ﷺ বললেন,

غَيْرُ ذُلِكَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَصُبَّ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا صَبًّا فَلَيْتَ أُمَّتِي لَا يَلْبَسُونَ الذَهَبَ

"প্রাচুর্য তো তোমাদের জন্য আরো বেশি ভয়ঙ্কর। (তখন) দুনিয়া তোমাদেরকে নিমজ্জিত করে ফেলবে। হায়! আমার উম্মাহ'র লোকেরা যদি স্বর্ণ পরিধান না করতো!" [১৪৬]

তিনি উম্মতকে দুনিয়ার প্রতি আসক্ত না হওয়ার জন্য অধিক আসবাব যা জীবনের উপকরণ তা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। হতে পারে তা পোশাক,সাজ-সরঞ্জাম, রান্নার আসবাব, ফার্নিচার, ঘরবাড়ি কিংবা জমিজমা। 'রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

لَا تَتَّخِذُوا الضَّيْعَةَ فَتَرْغَبُوا فِي الدُّنْيَا

"তোমরা (অধিক) জীবনোপকরণ গ্রহণ কোরো না, অন্যথায় দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়বে।"[১৪৭] পরিশুদ্ধির জন্য দুনিয়ার মোহকে ত্যাগ করতে হবে, আর এভাবেই সাহাবিদের(রা) ন্যায় পরিশুদ্ধ হওয়া যাবে।
'রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

صَلَاحُ أَوَّلِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالزُّهْدِ وَالْيَقِيْنِ

“এই উম্মতের প্রথম অংশটি পরিশুদ্ধি লাভ করেছে দুনিয়া-বিরাগ ও দৃঢ় ঈমানের মাধ্যমে।”[১৪৮]

আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা

দ্বীন বিজয়ী করতে জানের কষ্ট, পরিশ্রম, কুরবানির সাথে সাথে প্রয়োজন সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা। দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে সম্পদ ব্যয় করার নির্দেশনা কুরআনে হাদিসে এবং এর ফজিলত ও দান না করার ব্যাপারে হুঁশিয়ারি এসেছে। নবি ﷺ বিলাল (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কক্ষে গিয়ে তাঁর কাছে খেজুরের একটি স্তূপ দেখতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এগুলো কী?" বিলাল (রদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'এগুলো খেজুর; আমি জমা করে রেখেছি।' নবি ﷺ বললেন, "তোমার কি ভয় হয় না যে এর জন্য জাহান্নামের আগুনের উত্তাপ বাড়তে পারে? বিলাল! খরচ করো; আরশের অধিপতি (তোমার রিযক) সঙ্কুচিত করে দিবেন-এ আশঙ্কা কোরো না।" [১৪৯]

জিহাদের নির্দেশের পাশাপাশি এসেছে সম্পদ ব্যয় করার নির্দেশ...

فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً

যারা স্বীয় জানমাল দ্বারা জিহাদ করে, আল্লাহ তাদেরকে যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন(৪:৯৫)

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۙ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ

যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, আর আল্লাহর পথে নিজদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করেছে, আল্লাহর কাছে তারা বড়ই মর্যাদাবান আর তারাই সফলকাম। (৯:২০)

সালাত কায়েম করার সাথেও আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার কথা এসেছে। সত্যিকারের মুমিন তারাই যারা..

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ؕ

যারা যথাযথভাবে নামায পড়ে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে দান করে।(০৮:০৩)

قُلْ لِّعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلٰلٌ

আমার বান্দাদের বল, 'যারা ঈমান এনেছে, তারা যেন সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, ঐ দিন আসার পূর্বে যে দিন কোন বেচা-কেনা থাকবে না এবং থাকবে না বন্ধুত্বও।(১৪:৩১)
কুরআনের শুরুতেই সুরা বাকারাতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে কাদের জন্য কুরআন হিদায়াত,তাদের একটি সিফাত...

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۙ

যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, যথাযথভাবে নামায কায়েম করে ও তাদেরকে যা দান করেছি তা হতে ব্যয় করে। (০২:০৩)

তাদের একটি বৈশিষ্ট্য আল্লাহ যে রিযিক দিয়েছি তা হতে আল্লাহরই পথে খরচ করে। এটাই সিরাত্বল মুস্তাক্বীমের পথের উপর থাকা মুমিনদের বৈশিষ্ট্য।
সালাত কায়েম করা কিংবা জিহাদের নির্দেশনাসংবলিত আয়াতের অধিকাংশেই মাল খরচ করার ব্যাপারে বলা হয়েছে। এমনকি একে ব্যবসার সাথে তুলনা করা হয়েছে, কখনো-বা আল্লাহকে কর্জ দেওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। অর্থ্যাৎ উৎসাহ-অনুপ্রেরণা দেওয়া হয়েছে।

مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ وَلَهٗۤ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ۚ

এমন কে আছে যে, আল্লাহকে উত্তম করয দিবে ? তাহলে তিনি তার জন্য তা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দিবেন এবং তার জন্য রয়েছে সম্মানজনক প্রতিদান। (৫৭:১১)

اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ ۙ

নিশ্চয় যারা আল্লাহর কিতাব অধ্যয়ন করে, সালাত কায়েম করে এবং আল্লাহ যে রিযক দিয়েছেন তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসার আশা করতে পারে যা কখনো ধ্বংস হবে না। (৩৫:২৯)

এককভাবে-ও মাল খরচ করার নির্দেশ এসেছে বহুবার।

اٰمِنُوۡا بِاللّٰهِ وَرَسُوۡلِهٖ وَاَنۡفِقُوۡا مِمَّا جَعَلَكُمۡ مُّسۡتَخۡلَفِيۡنَ فِيۡهِ‌ؕ فَالَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا مِنۡكُمۡ وَاَنۡفَقُوۡا لَهُمۡ اَجۡرٌ كَبِيۡرٌ

তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং তিনি তোমাদেরকে যা কিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন, তা থেকে ব্যয় কর। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে তাদের জন্য রয়েছে বিরাট প্রতিফল। (৫৭:০৭)

সাহাবিরা তাদের সম্পূর্ণ, অর্ধেক, এক তৃতীয়াংশ কিংবা দশভাগের একভাগ, বিশ ভাগের একভাগ -যে যে পরিমাণে সম্ভব আল্লাহর রাস্তায় খরচ করেছেন। আবু বকর রা. সম্পূর্ণ সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করেন, উমর রা. দেন সম্পদের অর্ধেক। সাদ ইবনে আমর আল জুমাহী রা. গভর্নর থাকা অবস্থায় গরিবদের তালিকার শীর্ষে ছিলেন, তখন আমিরুল মু'মিনীন উমর রা. তার জন্য ৫০০ দিরহাম পাঠালে গ্রহণ করতে চান নি, স্ত্রীর পরামর্শে গ্রহণ করলেন ঠিকই কিন্তু সেদিনই সব দান করে দিয়ে আসেন। তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা) বাণিজ্যিক মুনাফার সবটুকু অর্থ্যাৎ ৭ লাখ দিরহাম দান করে দেন একরাতে। আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা) দুই বস্তা স্বর্ণখণ্ড দেন তাবুক যুদ্ধে, উসমান রা. এত অধিক দেন যে বাহিনীর এক তৃতীয়াংশের খরচ বহনের সমপরিমাণ সম্পদ খরচ করেন। মুসলিমদের উদ্দেশ্যে আল্লাহর প্রশ্ন-

وَمَا لَكُمۡ اَلَّا تُنۡفِقُوۡا فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِيۡرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ‌ؕ

তোমাদের কি হলো যে তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করবে না? অথচ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মালিকানা তো আল্লাহরই। (৫৭:১০)

দ্বীনের জন্য কুরবানি করার মানসিকতা

সাহাবায়ে কেরামের(রা) সম্মানিত জামাত দ্বীনের জন্য নিজেদের পরিবার, সম্পদ এমনকি জানকে কুরবানি করেছেন। তাদের অন্তরের সবটুকু জুড়ে ছিলো দ্বীনের জন্য ভালোবাসায় পরিপূর্ণ। দ্বীনের জন্য এভাবে নিজের সবটুকু উৎসর্গ করার নজির নেই। তাদের এমন মানসিকতার ফলে তারা কুফফারদের শক্তিমত্তার সামনে মাথানত করেননি, দুনিয়াবি প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রস্তাবকে নাকচ করে দিয়ে ইমানের উপর অটল অবিচল এ থেকেছেন, নিজের প্রযোজনের উপর অপর মুমিন ভাইয়ের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিতে পেরেছিলেন।

উম্মাহকেও দ্বীনের জন্য কুরবানি করার মানসিকতা থাকতে হবে। তখন জিহাদের ডাকে-ও সাড়া দিতে মন সায় দিবে, মাল অকাতরে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করতে

দ্বিধা কিংবা অলসতা করবে না এবং ইমানকে প্রাধান্য দিয়ে নফসকে দমিয়ে রাখতে পারবে উম্মাহ। দ্বীনের জন্য ত্যাগ করার মানসিকতা দুনিয়ার ব্যস্তাতাকে পিছনে ফেলে তাকে দাওয়াহ-হিসবাহ করতে আগ্রহী করে তুলবে । এই মানসিকতা তাকে নফসের উপর লাগাম পরানোর ব্যাপারে সহায়ক হবে। এই মানসিকতাই তাকে সাহাবীদের মতো দ্বীনের একনিষ্ঠ অনুসারী বানাবে, ইমানকে করবে সুদৃঢ়। ফলে উম্মাহর পরাজিত অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ সুগম হবে। পিতা ইবরাহিমের আদশে আদর্শবান হয়ে রবের প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে।

নফসে লাগাম পরানো

নফসে লাগাম পড়ালেই দ্বীনবিধ্বংসী কাজ থেকে বাঁচতে পারবে অনায়াসে।ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী মুমিনের একান্ত কর্তব্য হলো, মুহাসাবাহ ও আত্মবিচার থেকে কখনই গাফেল না হওয়া, নিজের আত্মার প্রতি কঠোরতা করার ব্যাপারে উদাসীন না থাকা। বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে এবং প্রতিটি পদক্ষেপে নিজের ওপর শরিয়ত আরোপিত বাধ্যবাধকতা ও বিধি-নিষেধ আরোপ করা।[১৫০] সাহাবিরা(রা) জান্নাতের সুসংবাদ পাওয়ার পরও নফসের সাথে কঠোরতা করেছেন। নফসের হিসাব নিয়েছেন কড়ায়-গণ্ডায়। নিজেকে বিলাসিতাপূর্ণ জীবন কিংবা পোশাকে অভ্যস্ত করেননি। এ কারণেই তারা পরিশুদ্ধ হতে পেরেছিলেন।
রাসূলুল্লাহ ﷺবলেছেন,

صَلَاحُ أَوَّلِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالزُّهْدِ وَالْيَقِيْنِ

“এই উম্মতের প্রথম অংশটি পরিশুদ্ধি লাভ করেছে দুনিয়া-বিরাগ ও দৃঢ় ঈমানের মাধ্যমে।”[১৫১]

উমর রা. সারাদিন ইবাদত করার পর রাতে দোররা নিয়ে নিজের পায়ের পাতায় আঘাত করে বলতেন, হে নফস!বলো আজ সারাদিন কি কি আমল করেছো?’ নামাজে মূহুর্তের জন্য ধ্যান বাগানের পাখির দিকে নজর চলে যাওয়ায় আবু তালহা রা. নিজের নফসকে তিরস্কার করেন এবং নফস যেই বাগানের জন্য রব ও তার মাঝে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে সেই বাগানকে আল্লাহর রাস্তায় দান করে দেন। এই ছিল তাদের নফসকে লাগাম পরানোর নজির।
যে তাকওয়া হবে আমাদের পাথেয়, সেই তাকওয়ার অর্জনের জন্য নফসের সাথে কড়াকড়ি করতেই হবে। মায়মুন ইবনে মিহরান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, একজন ব্যক্তি যেভাবে তার ব্যবসায়ী অংশীদার (পার্টনারের) কাছ থেকে অর্থের কড়াকড়ি হিসাব গ্রহণ করে, সেভাবে তার নিজের নফসের কঠিন হিসাব না নেওয়া পর্যন্ত মুত্তাকি হতে পারবে না।[১৫২]

নফসকে লাগাম পড়ানোর দ্বারা নফসকে আল্লাহর হুকুমে পাবন্দী করানো সম্ভব। মুসলিমরা ফরজ পালন করে না, কিংবা দাওয়াহ হিসবাহ করে না জানমাল খরচ করে না- এই প্রতিটি বিষয়ের সমাধানে নফসকে লাগাম লাগাতে হবে সর্বপ্রথম। তবেই সহজেই মুসলিমদেরকে ফেরানো সম্ভব। কুফফারদের মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের হাতিয়ার অবাধ যৌনতা ও অশ্লীলতাকে হারাতে পারে নফসকে লাগাম পরানোর মাধ্যমেই, এজন্য মুসলিমসমাজে নফসের সাথে কঠোরতা করার বিষয়টিকে জোরদার করতেই হবে। এটি অত্যন্ত জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ।

সালাম ইবনে মিসকিন রাহিমাহুল্লাহ বলেন, একবার হাজ্জাজ ইবনে মিনহাল রাহিমাহুল্লাহ ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন। ভাষণে তিনি বললেন, হে লোকসকল! তোমরা প্রত্যেকেই নিজের আত্মার সমালোচনা ও নিন্দা করা শেখো। আত্মার লাগাম নিজের হাতে ধরা শেখো। এবং লাগাম ধরে আত্মাকে আল্লাহর নাফরমানি থেকে বের করে এনে ইবাদতে লাগিয়ে দাও। এরূপ পদক্ষেপ ও সচেতনতা ছাড়া নিজেকে সংশোধন করা অসম্ভব।[১৫৩]

নফসকে খেয়াল খুশিমত চালায় কাফেররা, কেননা দুনিয়া তাদের নিকট জান্নাত তুল্য। কিন্তু মুমিনের জন্য দুনিয়া জেলখানাসদৃশ, জেলখানাতে স্বাধীনতা নেই। ঠিক তেমনি মুমিনকে-ও দুনিয়াতে আল্লাহর হুকুম ও নবী ﷺ-এর নির্দেশিত শরীয়াতের বাইরে যাওয়া যাবেনা। নফসকে এভাবেই শরীয়াতের নির্দিষ্ট গণ্ডিতে এনে পরিপূর্ণ দ্বীনের অনুসারী করে সাহাবীদের কদমে কদম মিলিয়ে পরাজিত অবস্থার ইতি টেনে সফলতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করা সম্ভব।

প্রায়োরিটি লিস্ট ঠিক করা

প্রতিটি মানুষের নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ, অভিরুচি থাকতে পারে। এই পছন্দ-অপছন্দের মাপকাঠিতেই সে কাউকে ভালোবাসে, কাউকে প্রাধান্য দেয় কিংবা ঘৃণা করে। তবে একজন মুমিন ইমান আনার পরই তার পছন্দ-অপছন্দের মাপকাঠিকে বদলে দেয় শরীয়াত নির্ধারিত মানদন্ড অনুযায়ী। সেই মানদণ্ড অনুসারে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতে হবে আল্লাহকে, অতঃপর তাঁর রসুলকে ﷺ। পৃথিবীর সকল মানুষের চেয়ে, সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্য হলেন প্রিয়তম রসুল ﷺ।

قُلۡ اِنۡ كَانَ اٰبَآؤُكُمۡ وَاَبۡنَآؤُكُمۡ وَاِخۡوَانُكُمۡ وَاَزۡوَاجُكُمۡ وَعَشِيۡرَتُكُمۡ وَاَمۡوَالُ ۨاقۡتَرَفۡتُمُوۡهَا وَتِجَارَةٌ تَخۡشَوۡنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرۡضَوۡنَهَاۤ اَحَبَّ اِلَيۡكُمۡ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوۡلِهٖ وَجِهَادٍ فِىۡ سَبِيۡلِهٖ فَتَرَبَّصُوۡا حَتّٰى يَاۡتِىَ اللّٰهُ بِاَمۡرِهٖ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهۡدِى الۡقَوۡمَ الۡفٰسِقِيۡنَ

বল, ‘তোমাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, স্ত্রী ও আত্মীয়গণ, অর্জিত ধনরাশি এবং সেই ব্যবসা-বাণিজ্য তোমরা যার অচল হওয়ার ভয় কর এবং প্রিয় বাসস্থানসমূহ যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ, তাঁর রসূল ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ অপেক্ষা অধিকতর

প্রিয় হয়, তাহলে আল্লাহর আদেশ(বা শাস্তি) আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। বস্তুতঃ আল্লাহ পাপী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।'(৯:২৪)

অর্থ্যাৎ পিতা, সন্তান, পরিবার, সন্তান, ব্যবসা, ঘরবাড়ি, স্বামী/স্ত্রী, আত্মীয়, ধনসম্পদ এসকল কিছুর প্রতি ভালোবাসাকে ইসলামে নিষিদ্ধ করেনি। তবে এসকল বিষয়ের প্রতি ভালোবাসা অধিক হওয়ার কারণে যদি আল্লাহকে, তাঁর রসুলকে ﷺ প্রাধান্য দিতে না পারে তবে সেই ভালোবাসা নিন্দনীয়। এ কারণেই সাহাবিরা নিজেদের জান-মালের চাইতে-ও আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে ﷺ ভালোবেসেছেন। আখিরাতের কল্যাণকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন দুনিয়ার উপর। নিজের নফসের চাহিদার উপর প্রাধান্য দিয়েছেন আল্লাহর হুকুমকে। মাখলুকের আনুগত্যের বদলে আল্লাহর আনুগত্যকে বাছাই করেছিলেন।

ভালোবাসার ক্ষেত্রে প্রাধান্যের মাপকাঠিও কুরআন বলে দিয়েছে। আনুগত্যের ক্ষেত্রেও তা বলে দিয়েছে শরিয়ত।

মুসলিমদের আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা হবে সর্বাধিক। আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ

কিন্তু যারা বিশ্বাস করেছে, তারা আল্লাহর ভালবাসায় দৃঢ়তর।(২:১৬৫)
আর রসুলের ﷺ প্রতি ভালোবাসা হবে এইরূপ

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ

নবী, মুমিনদের নিকট তাদের প্রাণ অপেক্ষাও অধিক প্রিয়[(৩৩:৬)

মাওলানা আব্দুল মালেক লিখেন.....*ঈমানের গোটা বিষয়টা নির্ভরশীল প্রাধান্যের উপরই। ঈমানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করলে সব জায়গায় এটিই দেখা যাবে, ইমান বিল্লাহর প্রথম কথা, গায়রুল্লাহ থেকে বিমুখ হয়ে আল্লাহর দিকে রুজু করা, শুধু তাঁরই ইবাদত করা, সকল তাগূতের (আল্লাহ ও তাঁর দ্বীনের সাথে যুদ্ধরত বিদ্রোহী) আনুগত্য অস্বীকার করা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ইতাআত (আনুগত্য) করা।*

তদ্রূপ ঈমান বির রাসূলের গুরুত্বপূর্ণ কথা, রাসূলের উপর নাযিলকৃত কিতাব ও শরীয়ত এবং তাঁর উসওয়ায়ে হাসানাকে দুনিয়ার সকল ইজম, মতবাদ ও সংস্কৃতির চেয়ে অগ্রগণ্য মনে করা এবং ঐ সব থেকে বিমুখ হয়ে একেই গ্রহণ করা। আর আল্লাহর মনোনীত দ্বীন ইসলামে পরিপূর্ণভাবে দাখিল হওয়া।

ঈমান ও ইসলামের অর্থই হচ্ছে হেদায়েতকে গোমরাহীর উপর, আলোকে অন্ধকারের উপর, কল্যাণকে অকল্যাণের উপর, তাওহীদকে শিরকের উপর, সুন্নতকে বিদআতের উপর, নেকীকে গুনাহের উপর, আনুগত্যকে বিদ্রোহের উপর, আখিরাতকে দুনিয়ার উপর, ইসলামকে গায়রে ইসলামের উপর, এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অন্য সবার উপর প্রাধান্য দেওয়া।[১৫৪]

এজন্য যখনই কোনো মতবাদকে মুসলিমের সামনে পেশ করা হবে তার দায়িত্ব হলো সেই মতবাদকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে ইসলামকে প্রাধান্য দেওয়া। আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফা আস সাহমীকে(রা) যখন রোম সাম্রাজ্যের অর্ধেক দিয়ে দেওয়ার বিনিময়ে ইমানকে ছেড়ে দিয়ে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করতে বলা হলো তখন তিনি সেই প্রস্তাবকে নাকচ করে দিয়েছিলেন, এমনকি তার ইমানের দৃঢ়তা দেখে সকল মুসলিম বন্দিকে রোম সম্রাট মুক্তি দিয়ে দেয়। এভাবেই প্রাধান্য দিতে হবে আল্লাহর দ্বীনকে দুনিয়ার চাকচিক্যের উপর। হযরত আছিয়া(রা)-কে যখন নির্যাতন করার কোনো এক মুহূর্তে রাজপ্রাসাদের দিকে তার চেহারাকে ফিরিয়ে দিতে বলা হয় এই উদ্দেশ্যে যেন তিনি দুনিয়ার মায়ায় পড়ে আল্লাহর আনুগত্যকে ছেড়ে দিয়ে ফিরআউনকে রব মেনে নেন। ইমানের দৃঢ়তার প্রমাণ দিয়ে তিনি রাজপ্রাসাদ থেকে চেহারাকে সরিয়ে আসমানের দিকে তাকিয়ে দোয়া করেন....

رَبِّ ابۡنِ لِیۡ عِنۡدَکَ بَیۡتًا فِی الۡجَنَّۃِ وَنَجِّنِیۡ مِنۡ فِرۡعَوۡنَ وَعَمَلِہٖ وَنَجِّنِیۡ مِنَ الۡقَوۡمِ الظّٰلِمِیۡنَ ۙ

'হে আমার প্রতিপালক! তোমার নিকট জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ কর এবং আমাকে উদ্ধার কর ফিরআউন ও তার দুষ্কর্ম হতে এবং আমাকে উদ্ধার কর যালেম সম্প্রদায় হতে।' (৬৬:১১)

উসমান রা. হুদায়বিয়াতে মুসলিমদেরকে রেখে দূত হিসেবে কুরাইশদের কাছে উমরা করার সুযোগ দেওয়ার ব্যাপারে আলোচনা করতে গেলে তিনি তার কাপড়কে টাখনুর উপরে রাখেন, অথচ কুরাইশরা কাপড়কে ঝুলিয়ে পড়াকে পছন্দ করত জানা সত্ত্বেও টাখনুর নিচে নামাননি। উসমান (রা) নিজের দ্বীনকে প্রাধান্য না দিয়ে মুশরিকদেরকে সন্তুষ্ট করতে চাননি, এমনই হতে হবে উম্মাহর পছন্দের মাপকাঠি।

দাওয়াতী কাজের দোহাই দিয়ে মুশরিকদের অনুকরণে পোশাক পরিধান করার কোনো যৌক্তিকতা থাকেনা, প্রাধান্য দিতে হবে দ্বীনকে। মুসলিম উম্মাহ আল্লাহকে প্রাধান্য দিবে সকল কিছুর উপরে। নবীর ﷺ আদর্শকে প্রাধান্য দিবে সকল আদেশের উপরে। শরীয়তে মুহাম্মাদীকে প্রাধান্য দিবে দুনিয়ার সকল মতবাদ ও রীতি-নীতির উপরে। দ্বীনকে প্রাধান্য দেবে দুনিয়ার উপর। আল্লাহর হুকুমকে প্রাধান্য দেবে প্রবৃত্তির চাহিদার উপর। কাকে প্রায়োরিটি দিবে এই তালিকা সংশোধন করে কুরআনের আলোকে প্রায়োরিটির তালিকাকে হৃদয়ের গহিনে স্থান দিতে হবে। এই তালিকাকে সামনে রেখে পারি দিতে হবে ক্ষণক্ষায়ী জীবনের পথকে। মুসলিমের কাছে প্রাধান্যের মানদণ্ড ঈমান ও ইসলামের পরিবর্তে নিজের রুচি-অভিরুচি, প্রবৃত্তির চাহিদা কিংবা নিজের দল, গোত্র ও সম্প্রদায়ের পক্ষপাত হবে না। বরং নিজের রুচি-অভিরুচি, প্রবৃত্তির চাহিদা কিংবা নিজের দল, গোত্র ও সম্প্রদায়ের পক্ষপাতের উপর প্রায়োরিটি দিবে ঈমান ও ইসলামকে।

পাথেয় সংগ্রহ

তাকওয়া ও ইলম,ইয়াকীন ও তাওয়াক্কুল, শোকর ও সবর এবং দুনিয়ার উপর আখিরাতের প্রাধান্য -আল্লাহ ও আখিরাতের দিকে যাত্রায় আমাদের এই পাথেয়গুলোই কাজে আসবে। আল্লাহর নির্দেশিত হালাল-হারাম মেনে চলা, শরীয়াতের সীমালঙ্ঘন না করা এবং বিপদ-আপদ সহ্য করার ক্ষেত্রে এগুলো মুসলিমদেরকে সাহায্য করবে।এই পাথেয়গুলো দ্বারাই কুফফারদের পরাজিত করা সম্ভব, জাগতিক উন্নতি লাভ হবে এবং মুসলিমরা আল্লাহর সাহায্য লাভের যোগ্য হবে। একজন পূর্ণাঙ্গ মুসলিমের ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য এসব পাথেয় হলো মৌলিক উপাদান। মুসলিমকে আদেশ দেওয়া হয়েছে যেন সামর্থ্য অনুযায়ী শত্রুর বিরুদ্ধে পূর্ণ প্রস্তুতি নেয়। কিন্তু মুসলিমরা যত বস্তুগত প্রস্তুতি নিক না কেন, শত্রুদের তুলনায় তা হবে নিতান্তই তুচ্ছ। মুসলিমদেরকে জয়লাভ করতে সক্ষম হবে এসকল পাথেয় দ্বারা যা শত্রুদের কাছে নেই।এই পাথেয়গুলোই তাদের সাথে মুসলিমদের সামর্থ্যের এই বিশাল ফারাক মিটিয়ে এনে দেবে কাঙ্ক্ষিত বিজয়।

মুসলিমদেরকে শত্রুর মুখোমুখি হতে হবে দ্বীনি ইলমের অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে। ফলে তারা পথভ্রষ্ট হবে না এবং আল্লাহর মনোনীত পন্থায় ইবাদত করতে সক্ষম হবে। এই দ্বীনের জন্য আল্লাহর সাহায্য আসার ব্যাপারে দৃঢ় ইয়াক্বীন রাখবে যা তাদের উৎসাহিত করবে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করার জন্য। কখনো যদি পথ চলতে গিয়ে বিপদে পড়ে, তা হলে সবর করবে। আর যদি ভালো কিছু পেয়ে যায়, তা হলে মহান দাতা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হবে, তাঁর শান অনুযায়ী শুকরিয়া করবে। তারা আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিক্রি করে দেবে। শত্রুরা যেভাবে জীবন ভালোবাসে, মুসলিমরা সেভাবে মৃত্যুকে ভালোবাসবে। এভাবেই পরাজিত থেকে বিজয়ী হবে মুসলিম উম্মাহ।

তাকওয়া

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ

হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর। এবং তোমরা আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।(৩:১০২)

মুসলিম উম্মাহর শক্তি হলো তাকওয়া, আল্লাহর রজ্জুকে শক্ত করে ধরার পূর্বেই এসেছে তাকওয়ার নির্দেশ। এই তাকওয়া অবলম্বন না করলে আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য করবেন না, কবুল করবেন না আমাদের প্রচেষ্টাকে।

اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ
আল্লাহ তো কেবল মুত্তাকিদের কুরবানীই কবুল করে থাকেন।(৫:২৭)
স্বয়ং আল্লাহ তাকওয়াকে শ্রেষ্ঠ পাথেয় সাব্যস্ত করেছেন।

وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ۫ وَاتَّقُوْنِ يٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ
আর তোমরা পাথেয় সংগ্রহ কর এবং তাকওয়া-ই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। হে বিবেকসম্পন্নগণ! তোমরা আমাকেই ভয় কর।(২:১৯৭)

হাক-বাতিলের পার্থক্য করার ক্ষমতা-ও আল্লাহ দিবেন তাকওয়ার বদৌলতে। তাকওয়া মুসলিমদেরকে হকের কাছে নিয়ে যাবে, আর পথভ্রষ্টতা থেকে হিফাজত করবে। উত্তরণের পথ উন্মুক্ত করবেন আল্লাহ এই তাকওয়ার জন্যই।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا
হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাহলে তিনি তোমাদেরকে ন্যায়-অন্যায় পার্থক্যকারী শক্তি দেবেন(৮:২৯)

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۙ
আর যে কেউ আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার নিষ্কৃতির পথ করে দেবেন।(৬৫:০২)

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا
আল্লাহকে যে ভয় করবে, তিনি তার সমস্যার সমাধান সহজ করে দেবেন।(৬৫:০৪)

আবু সাইদ খুদরি রা.-কে উপদেশ দিতে গিয়ে রসুল তাকওয়া অবলম্বন করতে বলেন কেননা তাকওয়া-ই সব বিষয়ের চূড়া।[১৫৫] তাকওয়া অবলম্বন কিভাবে করতে হবে এবং তাকওয়া কি -এ ব্যাপারে সালাফদের কিছু উক্তি...

হাসান বাসরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “মুত্তাকী হলো তারা, যারা আল্লাহর নিষিদ্ধকৃত জিনিস থেকে বিরত থাকে এবং তাঁর আদেশ পালন করে।“[১৫৬]

আবুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, “সত্যিকারের তাকওয়া হলো বান্দা আল্লাহকে এমনভাবে ভয় করবে যে অণু পরিমাণ মন্দও এড়িয়ে চলবে এবং সন্দেহজনক হালাল থেকেও বিরত থাকবে।“[১৫৭]

সুফিয়ান সাওরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “তাঁদেরকে মুত্তাকী বলার কারণ হলো- অন্যেরা যা এড়িয়ে চলে না, তাঁরা তাও এড়িয়ে চলেন।”[১৫৮]

ইলম

উম্মত কি থেকে বেঁচে চলবে, কোনটি করতে পারবে, অর্থ্যাৎ হালা-হারাম-মাকরুহ কোনগুলো তার জন্য দরকার ইলম। তাকওয়া অবলম্বন করা-ও সম্ভব না যদি শরীয়াতের ইলম না থাকে। কখন সবর করতে হবে আর কখন বাতিলের জবাব দিতে হবে তার জন্য -ও দরকার ইলম। জাহেলিয়াত ও বাতিলকে চিনতে হলে দরকার ইলম। কিভাবে তাওয়াককুল করতে হবে তার জন্য দরকার ইলম, অন্যথায় তাওয়াক্কুলের নামে অস্ত্রবিহীন ময়দানে পরাস্ত হতে হবে শত্রু কর্তৃক। আল্লাহর উপর ইয়াক্বীন রাখতেও দরকার ইলম, কেননা আল্লাহর পরিচয়-গুণাবলি না জেনে তাঁকে যথাযথ ভয় করা ও ভালোবাসা সম্ভব না।

বিশুদ্ধ আকিদা রাখার জন্য সে বিষয়ে ইলম হাসিল করতে হবে।যে হিসবাহ-র দায়িত্ব পালন করবে তাকে হিসবাহ-র মাসআলা জানতে হবে। কিভাবে হিসবাহ তথা সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করবে ও কখন করবে তার জন্য ইলম দরকার।

قُلۡ ہٰذِہٖ سَبِیۡلِیۡۤ اَدۡعُوۡۤا اِلَی اللّٰہِ ۟ؔ عَلٰی بَصِیۡرَۃٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِیۡ ؕ

তুমি বল, ‘এটাই আমার পথ। আমি আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহ্বান করি জেনে-বুঝে এবং আমার অনুসারীরাও।(১২:১০৮)

জিহাদের ময়দানে যাওয়ার পূর্বে জিহাদের বিধিবিধানগুলোর ব্যাপারে জ্ঞান রাখতে হবে, নাহলে অযথা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পরাজয়কে টেনে আনবে। দাওয়াহর ময়দানে কাফির-মুশরিকদের সাথে মুআমালাত আর জিহাদের ময়দানে মুআমালাতের পার্থক্য করার জন্য ইলম দরকার নাহলে কঠোরতা ও নম্রতার ভুল প্রয়োগের ফলে হিতে বিপরীত হতে পারে। খিলাফাত কায়েমের পূর্বে আমিরের আনুগত্য কিভাবে করতে হবে তার জন্য ইলম দরকার, নয়তো মুসলিমরাই খলিফার বিরুদ্ধাচারণ করে পতন ঘটাবে যেভাবে তুর্কিরা করেছিল। ইলম হলো সকল আমলের দরজা, ইলম-ই আমাদের পথ দেখাবে, হিফাজত করবে ভুলভ্রান্তি থেকে।

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “একজন মানুষকে ততটুকু জ্ঞান অর্জন করতেই হবে, যতটুকু হলে সে সালাত আদায় ও ঈমান প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।”.....মুসলিম জামাতের প্রতিটি সদস্যকে আল্লাহর ব্যাপারে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করতে হবে। যতটুকু জ্ঞান থাকলে সে আল্লাহর আনুগত্য করতে পারবে, তাঁর আদেশ মেনে চলতে পারবে এবং তাঁর অবাধ্যতা এড়িয়ে চলতে পারবে। তাদের উচিত এ জ্ঞান অর্জনের জন্য একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করা।

কারণ যার জ্ঞান যত বেশি হবে, সে আল্লাহর ততই নিকটবর্তী হবে। তারপর সঠিক আকীদা, ইবাদত ও মুয়ামালাত সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এগুলো ফরযে আইন। একেকজনের দ্বীনি ও দুনিয়াবি জীবন পরিচালনায় যতটুকু জ্ঞান আবশ্যক, ততটুকু তার ওপর ফরযে আইন।[১৫৯]

ইয়াক্বীন

দৃঢ় বিশ্বাসের বিপরীত হলো সন্দেহ, সংশয়, দ্বিধা। কুরআনের শুরুতেই বলা হয়েছে এটি এমন একটি কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ নেই, নেই কোনো ভুল। আরবি ريب শব্দটি সন্দেহ ও ভুল উভয়কেই বুঝায়। অর্থ্যাৎ কোনো প্রকার সন্দেহ রাখালে এই কিতাব তার জন্য সঠিক পথ দেখাবে না, পদে পদে সে থমকে যাবে দৃঢ় বিশ্বাসের অভাবে। কুরআন সত্য, এর কথাগুলো সত্য, এতে আল্লাহ যে ওয়াদা দিয়েছেন তা সত্য। এই দ্বীন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, এই দ্বীনকে আল্লাহ বিজয়ী করবেন।

هو الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ٪

তিনিই তাঁর রসূলকে প্রেরণ করেছেন পথনির্দেশ এবং সত্য দ্বীনসহ সকল দ্বীনের উপর তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দানের জন্য; যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে। (৬১:০৯)

এতে যদি সন্দেহ থাকে তাহলে কখনোই বিজয় আসবে না। কেননা মুসলিমদের শত্রুরা সংখ্যা, শক্তি ও অস্ত্রে মুসলিমদের চেয়ে বহুগুণ শক্তিশালী। তাদেরকে পরাজিত করাবেন আল্লাহ, কিন্তু মুসলিমদেরকে জিহাদের ময়দানে দৃঢ় বিশ্বাস তথা ইয়াক্বীন রাখতে হবে যে বিজয় আসবে হকের পক্ষেই, বাতিল পরাজিত হবে। পরাজিত করবেন আল্লাহ। বদরের যুদ্ধে ময়দানে ছিলেন সাহাবিরা, কিন্তু বিজয় দিয়েছেন আল্লাহ...

فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللهَ قَتَلَهُمْ ۪ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللهَ رَمٰى

তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি, বরং আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছেন।এবং তুমি যখন নিক্ষেপ করেছিলে তখন তুমি নিক্ষেপ করনি, বরং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন। (০৮:১৭)

ইয়াক্বীন তাকে বলবে, সংখ্যা কোনো বিষয় নয়, আল্লাহর ওয়াদা সত্য। তার ইয়াক্বীন আল্লাহর আয়াতে...

كَمۡ مِّنۡ فِئَةٍ قَلِيۡلَةٍ غَلَبَتۡ فِئَةً كَثِيۡرَةًۢ بِاِذۡنِ اللّٰهِ‌ؕ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيۡنَ

আল্লাহর ইচ্ছায় কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাজিত করেছে! আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে রয়েছেন।'(২:২৪৯)

ইমানদারদেরকে আল্লাহ পরীক্ষা করলে-ও দৃঢ়তার সাথে ইয়াক্বীনের কারণে মুসলিমরা বলতে পারবে যেমনটা সাহাবিরা বলেছিল, حَسۡبُنَا اللّٰهُ وَنِعۡمَ الۡوَكِيۡلُ 'আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কর্মবিধায়ক।' যখন শত্রুরা শক্তি,সংখ্যা ও অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে দমিয়ে দিতে চাইবে তখন বলে উঠবে حَسۡبُنَا اللّٰهُ وَنِعۡمَ الۡوَكِيۡلُ 'আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কর্মবিধায়ক'।

চরম কঠিন অবস্থায় মুনাফিকদের উক্তি... لَا مُقَامَ لَكُمۡ فَارۡجِعُوۡا

তোমরা(শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে) দাঁড়াতেই পারবে না, অতএব ফিরে যাও (৩৩:১৩)

তখন মুসলিমরা ইয়াক্বীনের কারণে বলতে পারবে..

كَلَّا‌ ۚ اِنَّ مَعِىَ رَبِّىۡ سَيَهۡدِيۡنِ

'কিছুতেই নয়! আমার সঙ্গে আছেন আমার প্রতিপালক; তিনি আমাকে পথনির্দেশ করবেন।'(২৬:৬২)

মুসলিমদের ইয়াকীন রাখতে হবে যে, আল্লাহ তাদের সাথে আছেন। তিনি শত্রুদের চেয়ে অধিক ক্ষমতাবান, প্রতিশোধ গ্রহণে দ্রুততর। তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি তাঁর সত্যপন্থী বান্দাদের সাহায্য করেন ও তাদের বিজয়ের দিকে নিয়ে যান। তিনি তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করেন এবং এর বিরুদ্ধে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা বাতিলকে পরাজিত করেন। এই ইয়াকীনের গুণে গুণান্বিত না হয়ে মুসলিমরা ইসলামের জন্য কাজ করতে পারবে না, পারবে না জিহাদের ময়দানে সামনে এগোতে।

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

"আর যখন তারা ধৈর্য অবলম্বন করেছিল তখন আমি তাদের মধ্য হতে মনোনীত করেছিলাম নেতা-যারা আমার নির্দেশ মোতাবেক সৎ পথ প্রদর্শন করত, এবং আমার আয়াতসমূহের ওপর ইয়াকীন রেখেছিল।"(৩২:২৪)

তাওয়াক্কুল

ইয়াকীনের ফলাফল হলো তাওয়াক্কুল আ'লাল্লহ। দুর্বল ইমানের অধিকারী কখনোই পরিপূর্ণ তাওয়াককুল করতে পারবে না। তাওয়াক্কুল করার অর্থ হলো যথাসাধ্য বাহ্যিক সকল

উপায়–উপকরণ অবলম্বন করার পর আল্লাহর উপর ভরসা করা। অর্থাৎ, বাহ্যিক উপায় অবলম্বন পরিহার নয়, বরং বাহ্যিক উপায়কেই সব কিছু মনে না করা; তাদের ইয়াকীন এই যে- সকল কর্ম আল্লাহর ইচ্ছাতেই সম্পন্ন হয়। অতএব যতক্ষণ আল্লাহর ইচ্ছা না হবে, ততক্ষণ বাহ্যিক উপায় অবলম্বন কোনই কাজে আসবে না।

اِنۡ یَّنۡصُرۡکُمُ اللّٰہُ فَلَا غَالِبَ لَکُمۡ ۚ وَ اِنۡ یَّخۡذُلۡکُمۡ فَمَنۡ ذَا الَّذِیۡ یَنۡصُرُکُمۡ مِّنۡۢ بَعۡدِہٖ ؕ وَ عَلَی اللّٰہِ فَلۡیَتَوَکَّلِ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ

যদি আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেন তবে তোমাদের উপর বিজয়ী কেউ নেই। আর যদি তিনি তোমাদেরকে লাঞ্ছিত করেন তবে কে এমন আছে যে, তোমাদেরকে এর পরে সাহায্য করবে? আর আল্লাহর উপরই যেন মুমিনগণ তাওয়াক্কুল করে।(৩:১৬০)

তাওয়াক্কুল ব্যতীত কখনোই শক্তিসামর্থ্যে ভালো অবস্থানে থাকা কুফরি শক্তির মোকাবেলার হিম্মত অর্জন হবে না। তাওয়াক্কুলের সবক হলো আল্লাহই যথেষ্ট।

حَسۡبُنَا اللّٰہُ وَ نِعۡمَ الۡوَکِیۡلُ

আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কর্মবিধায়ক(০৩:১৭৩)

وَ مَنۡ یَّتَوَکَّلۡ عَلَی اللّٰہِ فَہُوَ حَسۡبُہٗ ؕ

আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করবে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট হবেন।(৬৫:০৩)

হুনায়নের ময়দানে ১২০০ সৈন্য দেখে একজন বলেছিলেন,“আজ আমরা সংখ্যা স্বল্পতার কারণে পরাজিত হবো না”, সেই জিহাদেই ময়দান থেকে পলায়ন করে মুজাহিদরা। পরবর্তীতে মাত্র আশিজন বিজয় ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হয় আল্লাহর উপর তাওয়াককুলের ফলেই। এতেই শিক্ষা আছে, তাওয়াককুল ছাড়লে জিহাদের ময়দান থেকে মুসলিমরা পিছপা হয়ে যাবে।

প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য হলো...

وَّ عَلٰی رَبِّہِمۡ یَتَوَکَّلُوۡنَ

এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপরই ভরসা রাখে।(০৮:০২)

<u>শোকর</u>

مَا یَفۡعَلُ اللّٰہُ بِعَذَابِکُمۡ اِنۡ شَکَرۡتُمۡ وَ اٰمَنۡتُمۡ ؕ

তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর ও বিশ্বাস কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে শাস্তি দিয়ে কি করবেন? (৪:১৪৭)

আল্লাহর নিয়ামত পেয়ে মুসলিমরা আনন্দ উৎফুল্ল হবে না,বরং রবের শুকরিয়া করবে। কাঙ্খিত বস্তু পেয়ে শুকরিয়া করতে ভুলবে না, কেননা এটা আল্লাহর পরীক্ষা। সুলায়মান আ. তা বুঝতে পরে বলেছিলেন...

قَالَ ہٰذَا مِنۡ فَضۡلِ رَبِّیۡ ۟ۖ لِیَبۡلُوَنِیۡۤ ءَاَشۡکُرُ اَمۡ اَکۡفُرُ ؕ وَمَنۡ شَکَرَ فَاِنَّمَا یَشۡکُرُ لِنَفۡسِہٖ ۚ وَمَنۡ کَفَرَ فَاِنَّ رَبِّیۡ غَنِیٌّ کَرِیۡمٌ

তখন সে বলল, ‘এ আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ; যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করতে পারেন, আমি কৃতজ্ঞ, না অকৃতজ্ঞ। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে তা নিজের কল্যাণের জন্য করে এবং যে অকৃতজ্ঞ, সে জেনে রাখুক যে, নিশ্চয় আমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, মহানুভব।’(২৭:৪০)

মুসলিম জামাতের দৃঢ়তা-অবিচলতার জন্য এর সদস্যদের আল্লাহর শোকরগুজার বান্দা হতে হবে, নয়তো আল্লাহর শাস্তির উপযুক্ত হবে।

اِنَّا ہَدَیۡنٰہُ السَّبِیۡلَ اِمَّا شَاکِرًا وَّاِمَّا کَفُوۡرًا

অবশ্যই আমি তাকে পথ প্রদর্শন করেছি, হয় সে শোকরকারী অথবা অকৃতজ্ঞ।(৭৬:০৩)

দুটোর একটি বাছাই করতে হবে, মুসলিমরা অবশ্যই শোকরকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

<u>সবর</u>

রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘জেনে রেখো,বিজয় আসে ধৈর্যের মাধ্যমে।’ [১৬০] বিজয়ের জন্য সবর করতেই হবে, এটি ব্যতীত বিজয় আসবে না। গুনাহ থেকে বাঁচতে হলেও সবরের সাথে লেগে থাকতে হবে। নেককাজ করতে গেলেও সবরের সাথে এগিয়ে যেতে হয়। ইলম হাসিলেও সবর করতে হয়। স সবরকারীর সাথেই আছেন আল্লাহ। সবর করার পরেই সাহায্য চাইতে হবে এবং তখনই আল্লাহর সাহায্য আসবে।

یٰۤاَیُّہَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوا اسۡتَعِیۡنُوۡا بِالصَّبۡرِ وَالصَّلٰوۃِ ؕ اِنَّ اللّٰہَ مَعَ الصّٰبِرِیۡنَ

হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন।(২:১৫৩)

<u>দুনিয়ার উপর আখিরাতকে প্রাধান্য</u>

وَاٰثَرَ الۡحَیٰوۃَ الدُّنۡیَا ۙ فَاِنَّ الۡجَحِیۡمَ ہِیَ الۡمَاۡوٰی ؕ

এবং পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছে, নিশ্চয় জাহান্নাম হবে তার আবাসস্থল। (৭৯:৩৮-৩৯)

দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দিতে হবে আখিরাতকে, কেননা আখিরাত স্থায়ী। এই মনোভাব কাফির ও মুসলিমের মাঝে বড় একটি পার্থক্য করে দেয়। মুমিন যখন আল্লাহর রাহে লড়াই করে তখন সে জান্নাতের আশায় করে, আর কাফির করে ক্ষণস্থায়ী বিজয়ের জন্য। কাফিররা জীবনকে যেমন ভালোবাসে আর মৃত্যুকে ভয় পায়, মুমিন আখিরাতকে প্রাধান্য দেওয়ায় জীবনের চেয়ে শাহাদাতের মৃত্যুকে পছন্দ করে। এটাই তাকে জিহাদে প্রাণপণ লড়াইয়ের অনুপ্রেরণা দিবে কঠিন থেকে কঠিন পরিস্থিতিতে, দুটির একটি সে পাবেই,হয়তো শাহাদাত নয়তো বিজয়। কিন্তু দুনিয়ার প্রতি আসক্তি তাকে কয়েকধাপ পিছনে ফেলে দেয়। তাদের অবস্থা হয় এমন যে...

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ ؕ اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ

হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কী হল, যখন তোমাদের বলা হয়, আল্লাহর রাস্তায় (যুদ্ধে) বের হও, তখন তোমরা আরো জোরে মাটি কামড়ে ধরো? তবে কি তোমরা আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট হলে? অথচ দুনিয়ার জীবনের ভোগ-সামগ্রী আখিরাতের তুলনায় একেবারেই নগণ্য। (৯:৩৮)

এই কারণেই খোঁড়া পা নিয়ে আমর ইবনে জামুহ রা. বৃদ্ধাবস্থায় তিন ছেলের অনুরোধকে উপেক্ষা করে, ওজরেট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও উহুদের ময়দানে ঝাপিয়ে পড়ে শাহাদাতের অমীয় সুধাপান করেছেন। উমায়র বিন হুমাম রা. আসমান-জমিন প্রশস্ত জান্নাতের প্রতিশ্রুতি শুনার পর খেজুর খাওয়ার সময়টুকুও নষ্ট না করে শহীদ হয়েছেন। এমন সদস্যরা মুসলিম জামাতের বিজয়ের মিছিলের সঙ্গী হতে পারবে, মুসলিম জামাতকে দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্ত করতে হবে, আকিরাতের প্রতি আগ্রহী করে তুলতে হবে।

ইসলামিক সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসার ও হাকিকত জানা

ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা নিয়ে নেই কোনো সন্দেহ, ইবাদতেই কেবল সীমাবদ্ধ নয় ইসলাম। এটি কেবল ধর্ম নয়, বরং জীবন চালানোর আসমানী দিকনির্দেশনা। এজন্য এর রয়েছে স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় কাঠামো, পারস্পরিক লেনদেনের বিধিবিধান, এমনকি নিজস্ব সংস্কৃতি। ইসলামিক সংস্কৃতি একটি স্বতন্ত্র

সংস্কৃতি, এর একটি প্রধান মূলনীতি হলো 'বিধর্মীদের অনুসরণ ও অনুকরণ বর্জন'। এ মূলনীতির আলোকে ইসলামিক সংস্কৃতি তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য মহিমান্বিত। আফসোসের বিষয় হলো মুসলিমরা এমন একটি সংস্কৃতির ধারক-বাহক হয়েও বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট এবং নিজের দ্বীনের নির্ধারিত মূলনীতির বিরুদ্ধাচরণ করে নিজেদেরকে পরাজিত মানসিকতার পরিচয় দেয়।

মুসলিমদেরকে তাদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতির সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। তাদের মনে কালিমার কারণে তাদের অবস্থা যে কত উপরে এবং তাদের শ্রেষ্ঠত্ব তাদের হৃদয়ে গেঁথে দিতে হবে। ফলে তাদের জন্য রয়েছে একটি সংস্কৃতি, এর পরিপূর্ণ অনুসরণ করার দ্বারা জাতি হিসেবে তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকবে।

এক বর্ণনায় উমার (রা) বলেন:وذروا التنعم وزي العجم

"তোমরা বিলাসিতা ও অমুসলিম অগ্নিউপাসকদের রীতি, পোশাক-পদ্ধতি বা ফ্যাশন পরিত্যাগ করবে।" [১৬১]

উমারের (রা) শাসনামলে ইসলামী রাষ্ট্রের সম্প্রসারণ ঘটার কারণে নতুন বিজিত অঞ্চলের অগণিত অমুসলিম নাগরিক তাদের পূর্বের ধর্মসহ ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্যের অঙ্গিকারের মাধ্যমে ইসলামি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। তখন থেকে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসরত অগণিত অমুসলিম নাগরিক তাদের নাগরিক ধর্মসহ সকল বিষয়ে নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। এমতাবস্থায় পোশাক–পরিচ্ছদ ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে যেন তাদের জীবনযাত্রা মুসলিম নাগরিকদের জীবনে প্রভাব ফেলতে না পারে সেদিকে যত্নসহকারে লক্ষ্য রাখা হয়। এজন্য মুসলমানদেরকে তাদের পোশাক ও তাদেরকে মুসলমানদের পোশাক পরতে নিষেধ করা হতো। দেখলেই যেন মুসলিম ও অমুসলিমের পার্থক্য বুঝা যায় সেজন্য বিশেষ তাকিদ দেওয়া হতো। *সাহাবীগণ ইজমা বা ঐকমত্যের মাধ্যমে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পরবর্তী সকল যুগেই এ পদ্ধতি অনুসরণের বিষয়ে তাকিদ দেওয়া হতো।*[১৬২]

তবে এক্ষেত্রে ইসলামের সৌন্দর্য এই যে, অমুসলিম নাগরিকগণের নির্দেশ ছিল মুসলমানদের পোশাক বর্জন করে এমন পোশাক পরিধান করা যাতে তাদেরকে চেনা যায় এবং যদি এতে তারা রাজি না হতেন তাহলে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেওয়া হতো, অমুসলিমদের পোশাকের বিপরীত এমন পোশাক পরিধান করতে, যেন দেখলেই মুসলিম বলে চেনা যায়। বিভিন্ন ফিকহের গ্রন্থে এ বিষয়ে এমনই বর্ণনা এসেছে।

আনাস রা. নবিজী ﷺ লাউ পছন্দ করতেন জানার পর থেকে লাউ খাওয়াকে পছন্দের খাবার বানিয়ে নিয়েছিলেন। অথচ পানাহারের অভিরুচি ব্যক্তিবিশেষে পরিবর্তিত হতেই পারে, এ বিষয়ে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। উমার রা. রসুল ﷺ যে স্থানে প্রাকৃতিক হাজত সম্পন্ন করতে যাত্রাবিরতি করতেন সেখানে প্রাকৃতিক

প্রয়োজন সারতে কাফেলা নিয়ে যাত্রাবিরতি করতেন। এমনকি ইহুদি-খ্রিস্টানদের সাপ্তাহিক ছুটির দিনে বেশিরভাগ সময় রোজা রাখতেন বিরোধিতা প্রকাশ করতে। বসার ভঙ্গিতেও তাদের অনুকরণকে তিনি ﷺ অপছন্দ করতেন। শারীদ ইবনু সুওয়াইদ (রা) বলেন,

مَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ له وَأَنَا جَالِسٌ هَكَذَا وَقَدْ وَضَعْت يَدِيَ الْيُسْرَى خَلْفَ ظَهْرِي وَاتَّكَأْتُ عَلَى أَلْيَةِ يَدِي فَقَالَ أَتَقْعُدُ قِعْدَةَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ

"রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট দিয়ে গমন করেন। আমি তখন এভাবে আমার বাম হাত পিঠের পিছনে রেখে (ডান) হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির মূলের উপর হেলান দিয়ে বসেছিলাম। তখন তিনি বলেন: যাদের উপর আল্লাহর ক্রোধ তুমি তাদের (ইহুদিদের) অনুকরণে বসেছ?"[১৬৩]

হাদীস শরীফে পোশাক-পরিচ্ছদ ও অন্যান্য জাগতিক বা সামাজিক বিষয়ে অমুসলিমদের অনুকরণ বা তাদের সাথে 'মিল' বর্জন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং সাহাবী, তাবিয়ীগণ ও তাদের পরবর্তী যুগেও এ বিষয়ে অত্যন্ত দৃঢ়তা অবলম্বন করে স্বাতন্ত্র্যের এ ধারা অব্যহত থাকে। সকল যুগের সকল দেশের মুসলিমগণ অমুসলিম অনুকরণকে অত্যন্ত ঘৃণার সাথে পরিত্যাগ করেছেন কেবলমাত্র বর্তমান যুগের সাংস্কৃতিকভাবে পরাজিত মানসিকতাসম্পন্ন মুসলিমরা ব্যতীত। এই স্বতন্ত্র সংস্কৃতিকে সাহাবি, তাবেঈ এবং তাদের পরবর্তীরা যেভাবে দৃঢ়তার সাথে পালন করেছেন এবং ছোটোখাটো বিষয়েও সুন্নতকে বাস্তবায়ন করেছেন সেভাবে সুন্নাহকে ধারণ করতে হবে। আলমুসতারাকের এক হাদিসে এসেছে ইবনু উমার রা. নবীজিকে ﷺ বোতাম খুলে সালাত আদায় করতে দেখার কারণে তিনিও বোতাম খুলে নামাজ পড়েছেন। এটা সাহাবিদের সেই মুহাব্বত যা তাদের ইমানকে পূর্ণতা দিয়েছিল। এভাবে সাহাবিদের রসুলল্লাহ'র ﷺ অনুকরণ করার মতো করে গুরুত্বের সাথে বিজাতীয় সংস্কৃতির পরিবর্তে ইসলামনির্দেশিত ও অনুমোদিত রীতিতে পোশাক, আসবাব, আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে হবে এবং এর জন্য মুসলিমসমাজে প্রচারণা চালাতে হবে।

ছোটদের ব্যাপারেও সাহাবিরা কতটা সতর্ক ছিলেন। ছোট থেকেই ইসলামী রীতিনীতির অনুসরণকে জোর দিয়েছেন। এটাই সাহাবিদের সুন্নাহ। আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াযিদ বলেন,

كنت جالسا مع عبد الله بن مَسْعُودٍ فَأَتَاهِ ابْنٌ لَهُ صَغِيْرٌ قَدْ
البسته أُمَّهُ قَمِيصًا من حرير وهُوَ مُعْجَبٌ بِهِ قَالَ فَقَالَ يَا بنَيَّ من أَلْبَسك هذا قَالَ أَدْنُهُ فَدَنَا مِنْهُ فَشَقَّهُ ثُمَّ قَالَ اذْهَبْ
إلى أُمِّكَ فَلْتُلْبِكَ ثَوْبًا غَيْرَ .

"আমি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা)–এর কাছে বসে ছিলাম। এমতাবস্থায় তাঁর একটি ছোট্ট ছেলে তাঁর কাছে এল। ছেলেটিকে তার মা একটি রেশমী কামীস(জামা) পরিয়ে দিয়েছে। জামাটি পরে ছেলেটি খুব খুশি। তখন আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) ছেলেটিকে বললেন। বেটা, কে তোমাকে এই জামাটি পারিয়েছে? এরপর বললেন। কাছে এস। ছেলেটি কাছে আসলে তিনি জামাটি টেনে ছিড়ে ফেলেন এবং বলেন। তোমার আম্মার কাছে যেয়ে বল, তোমাকে অন্য কোনো কাপড় পরিয়ে দিতে।[১৬৪] মুসলিমদেরকেও ছোটদের ব্যাপারে সচেতন হতে হবে, ছোটবেলা থেকেই সুন্নাহসম্মত পোশাকে অভ্যস্ত করাতে হবে। ছোটদের বেলায় সাহাবিদের এমন আচরণ হলে বড়দের মাঝে এর অনুসরণ কতটা গুরুত্বপূর্ণ!

আর এই সংস্কৃতিকে ধারণ করার হাকিকত জানা জরুরি। প্রথমত আল্লাহ তায়ালা কুরআনে রসুলের ﷺ অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। অগণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মতকে তাঁর অনুকরণ করতে ও তাঁর -ﷺ “সুন্নাত” বা জীবন পদ্ধতি, আদর্শ ও রীতিকে অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এ অনুসরণ ও অনুকরণ সার্বিক। তিনি যে কাজ বা যে পোশাককে যতটুকু গুরুত্ব দিয়েছেন ততটুকু গুরুত্ব দিয়ে তার অনুকরণ করা এ সকল নির্দেশনার অন্তর্ভুক্ত। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি কাজ সুন্নতসম্মত উপায়ে করার পথ জানিয়ে গিয়েছেন নবীজি ﷺ। আর তাঁকে ﷺ ভালোবাসা ইমানের পূর্ণতার লক্ষ্মণ এবং ভালোবাসা প্রকাশ পাবে তাঁর ﷺ অনুসরণের মাধ্যমে যেমনটা সাহাবিরা করে গেছেন। এজন্য জীবনের সর্বক্ষেত্রে সুন্নতের অনুসরণ করতে হবে, ইসলামিক সংস্কৃতিতে হবে আমাদের জীবনের পথচলা। দ্বিতীয়ত, অনুসরণ ও অনুকরণের দ্বারা হৃদয়ে লালিত হয় সেই আদর্শের প্রতি ভালোবাসা, সম্মানবোধ আর আনুগত্য।

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ قُلْ اَطِيْعُوا اللهَ وَالرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ

বল, ‘তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর। ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’বল, ‘তোমরা আল্লাহ ও রসূলের অনুগত হও।’ কিন্তু যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রাখ নিশ্চয়ই আল্লাহ অবিশ্বাসীদেরকে ভালবাসেন না।(৩:৩১-৩২)

আর আমাদের ভালোবাসা, সম্মানবোধ আর আনুগত্য কেবল আল্লাহ, তারপর তাঁর দ্বীন ইসলাম আর তাঁর প্রিয় হাবিবের ﷺ প্রতিই থাকবে - এটাই মুসলিম উম্মাহর বৈশিষ্ট্য। এজন্য রসুলের নির্দেশিত পথে হাঁটতে হবে, হোক তা চাল–চলন, উঠা–

বসা, পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার–অনুষ্ঠান কিংবা যেকোনো জাগতিক বিষয়। এর মাধ্যমে আল্লাহ ﷻ ও তাঁর হাবিবের ﷺ প্রতি ভালোবাসা গড়ে উঠবে ও আনুগত্য করা সহজতর হবে । এটা তার ইমানকে পূর্ণতা দিবে এবং কুফফারদের এজেন্ডাকে ধুলিস্যাৎ করবে। কুফফারদের প্রতি ভালোবাসা কিংবা সম্মানবোধ নি:শেষ হয়ে তাদেরকে অন্তর দ্বারাও বিজয়ী শক্তি কল্পনা করে আনুগত্য করা হতে বিরত থাকতে পারবে উম্মাহ। তাছাড়া রসুলের ﷺ অনুসরণ না করতে করতে শয়তানের ধোঁকায় পড়ে একসময় হৃদয়ে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যেতে পারে যে 'রসুলের ﷺ অনুসরণ করাকে জরুরি নয়', তখন এটা হবে কুফরি। সুরা আল ইমরানের ৩২ আয়াতে তাদের প্রতি বড় তিরস্কার রয়েছে, যারা হাদীসকে হুজ্জত (শরীয়তের দলীল) মানে না এবং রসূল (সাঃ)-এর অনুসরণকেও জরুরী মনে করে না। উভয় শ্রেণীর মানুষই সব সব পদ্ধতিতে এমন মত ও পথ অবলম্বন করে যাকে কুফরী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[১৬৫] তাই ইমানকে বাঁচিয়ে অধ:পতন থেকে বাঁচতে তাঁর নির্দেশিত নিয়মে জীবন চালানো মুসলিমদের করণীয়।

তৃতীয়ত, হাদিসে এসেছে– "যদি কেউ কোনো সম্প্রদায়ের অনুকরণ করে, তাহলে সে উক্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।" এ হাদীসের আলোকে অমুসলিম বা পাপীদের অনুকরণ যেমন নিন্দনীয় ও বর্জনীয় তেমনি মুসলিম ও পুণ্যবানগণের নেতা মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর ﷺ সাহাবীগণের অনুকরণ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় ও করণীয়।

সংস্কৃতির ময়দানে স্বতন্ত্র ও স্বকীয় মহিমায় আবারও উম্মাহ জেগে উঠলে কুফফারদের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে পরাজিত হতে হবে না উম্মাহকে, সাংস্কৃতিক বিজয় এভাবেই আসবে। তবে এই মানসিকতা ধরে রাখতে উপযুক্ত মাহাল তথা খিলাফাহকে পুন:প্রতিষ্ঠায়-ও মনোযোগী হতে হবে।

আল– ওয়ালা ওয়াল বারার উপর পরিপূর্ণ আমল করা

নিজে বাঁচতে এবং উম্মাহকে বাঁচাতে সর্বপ্রথম ধাপটি হচ্ছে 'ওয়ালা এবং বারা' এর ধারণাকে পুনরুজ্জীবিত করা যেন আপনি শত্রুকে বন্ধু ভেবে গুলিয়ে না ফেলেন। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বর্তমান সময়ে বিশেষ চিন্তার দাবি রাখে।[১৬৬]

হাদীস শরীফে নবীজি ﷺ বলছেন–

من أحب الله وأبغض الله فقد استكمل الإيمان

যে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য ভালোবাসল, দুনিয়ার কোনো স্বার্থে না। আর আল্লাহর জন্য অপছন্দ করলো, শত্রুতা রাখলো, তার ঈমান পরিপূর্ণ হলো। [১৬৭]

আল্লাহর জন্যই ভালোবাসা আর আল্লাহর জন্যই ঘৃণা করা – এই হলো আল ওয়ালা আল বারা। হাদিসে এসেছে-

قَالَ اللهُ تَعَالَى وَجَبَتْ مُحَبَّتِى لِلْمُتَحَابِيْنَ فِي وَ الْمُتَجَالِسِيْنَ فِى وَ الْمُتَبَاذِلِينَ فِى وَ الْمُتَزَاوِرِينَ فِي – أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَ ابْنُ حَبَّانٍ عَنْ مُعَاذٍ (رضى) –

আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন, "আমার উদ্দেশে পরস্পরকে যাহারা 'মহব্বত করে, আমার উদ্দেশে পরস্পরের সহিত যাহারা উপবেশন করে, আমার উদ্দেশে পরস্পরের সহিত যাহারা খরচ-করে এবং আমার উদ্দেশে পরস্পরকে যাহারা পরিদর্শন করে, আমার ভালবাসা তাদের জন্য নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে।"[১৬৮]

দুনিয়াতে শাস্তি থেকে বাঁচার একটি উপায় হলো আল্লাহর জন্যই কাউকে ভালোবাসা।

. يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى إِنِّي لأَهِم بَاَهْلِ الْأَرْضِ عَذَابًا فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَى عُمَّارِ بُيُوتِي الْمُتَحَابِيْنَ فِى الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ صَرَفْتُ عَنْهُمْ – أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ –

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীর অধিবাসিগণকে শাস্তি দিতে মনস্থ করি। অতঃপর যখন আমি আমার ঘর আবাদকারী, আমার উদ্দেশে পরস্পরের বন্ধুত্ব বন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্তি ও অতি প্রত্যুষে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনাকারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন আমি তাহাদের উপর হইতে সেই শাস্তি সরাইয়া লই (আমি নিবৃত্ত হই)। "[১৬৯]

সাহাবায়ে আজমাঈন পরস্পরের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা লালন করতেন। মুহাজিররা যখন ঘর বাড়ি ছেড়ে আল্লাহর হুকুমকে মেনে হিজরত করেন নিঃস্ব অবস্থায়, তখন আনসাররা তাদেরকে সাদরে গ্রহণ করে নেয়। কিন্তু দুনিয়ার মানুষের অভিরুচি এই যে নিঃস্ব-গরিবকে নিজ ভূখণ্ডে থাকতে দিতে না চাওয়া, এবং তাদেরকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে। কিন্তু একমাত্র ইমানের কারণে আল্লাহর জন্যই মুহাজিরদের কেবল সাদরে গ্রহণই নয়, বরং হিজরতের পর প্রাথমিক দিকে তারা এক বিশেষ ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাদেরকে নিজ নিজ গৃহে আবাদ করেছেন, নিজেদের ধন-সম্পদে অংশীদার করেছেন এবং অভাবনীয় ইযযত ও সম্ভ্রমের সাথে তাঁদেরকে স্বাগত জানিয়েছেন। এক একজন মুহাজিরকে জায়গা দেয়ার জন্যে এক সাথে কয়েকজন আনসারী আবেদন করেছেন। ফলে শেষ পর্যন্ত লটারীর মাধ্যমে এর নিষ্পত্তি করতে হয়েছে। তাদেরকে আনসাররা নিজেদের বাগানের অর্ধেক দিয়েই ক্ষান্ত হননি বরং বাগানের কাজও আনসাররাই করে দিতেন, কেবল ফসলের ভাগ নিত মুহাজিররা। আল্লাহ বলেন...

وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖۤ اِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ

তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ কর; তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করলেন। ফলে তোমরা তাঁর অনুগ্রহে পরস্পর ভাই-ভাই হয়ে গেলে। তোমরা অগ্নিকুন্ডের (দোযখের) প্রান্তে ছিলে, অতঃপর তিনি (আল্লাহ) তা হতে তোমাদেরকে উদ্ধার করেছেন। এরূপে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শন স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন, যাতে তোমরা সৎপথ পেতে পার। (৩:১০৩)

স্বয়ং আল্লাহ তাদের মধ্যে এমন ভালোবাসার সঞ্চার করে দিয়েছিল। এর ফলেই হুনাইনের যুদ্ধে যখন বিপর্যস্ত অবস্থায় আনসাররা মুখ্য ভূমিকা রেখে বিজয় ছিনিয়ে আনে তখন সমস্ত গণিমত মুহাজিরদের দেওয়ার পরে রসুল ﷺ কে পেয়েই তারা সন্তুষ্ট হায় যান। বনু নামিরের নির্বাসনের পর প্রাপ্ত ফাই-এর সটুকু মুহাজিরদের ও অল্পসংখ্যক আনসারদের মাঝে বিতরণ করা হলেও তারা আনসাররা বিবাদে ভাঙাননি। অথচ বাহরাইন বিজায় সবটুকু আনসার দের দিতে চাইলে তার রাজিনা হয়ে বললেন-" আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুই গ্রহণ করব না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মুহাজির ভাইগণকেও এই ধন-সম্পদ থেকে অংশ না দেয়া হয়। "[১৭০] এই ভালোবাসার সাক্ষ্য দিচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ

لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّاۤ اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ؕ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۚ

(এ সম্পদ) অভাবগ্রস্ত মুহাজির (ধর্মের জন্য স্বদেশত্যাগী)দের জন্য, যারা নিজেদের ঘর-বাড়ী ও সম্পত্তি হতে বহিষ্কৃত হয়েছে; তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে সাহায্য করে। তারাই তো সত্যাশ্রয়ী।আর তাদের (মুহাজিরদের আগমনের) পূর্বে যারা এ নগরী (মদীনা)তে বসবাস করেছে ও বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তারা মুহাজিরদেরকে ভালবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেওয়া হয়েছে, তার জন্য তারা অন্তরে ঈর্ষা পোষণ করে না, বরং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তারা (তাদেরকে) নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয়। আর যাদেরকে নিজ আত্মার কার্পণ্য হতে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলকাম। (৫৯:৮-৯)

আল ওয়ালার প্রকৃত হাকিকত বুঝার পর উম্মাহর যদি এভাবে নিজের ভ্রাতৃত্ববন্ধনকে মজবুত করতো তাহলে ঐক্যবদ্ধ হওয়া কেবল সময়ের ব্যাপার যা আমাদের সফলতার দিকে নিয়ে যাবে।

ইমানের ভিত্তিতে সৃষ্ট বন্ধন হলো ঐক্যবদ্ধকারী সত্যিকারের বন্ধন,বাকি সকল বন্ধন জাহিলিয়াতের বন্ধন-গোত্রীয়, রক্ত সম্পর্কীয়, জাতীয়, ভাষাগত ও চামড়ার রঙভিত্তিক বন্ধন। এই সকল জাহিলি বন্ধন ইসলামের পায়ের নিচে।ইসলাম এসকল চেতনা ধ্বংস করে একমাত্র মহত্তম বন্ধনে মুসলিমদের আবদ্ধ করেছে। শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাপকাঠি তাকওয়ার পরিমাণ। এমনকি যাদেরকে কখনো দেখেনি এমন মুসলিমদের প্রতি তার ভালোবাসা থাকবে....

وَالَّذِيۡنَ جَآءُوۡ مِنۡۢ بَعۡدِہِمۡ يَقُوۡلُوۡنَ رَبَّنَا اغۡفِرۡ لَنَا وَلِاِخۡوَانِنَا الَّذِيۡنَ سَبَقُوۡنَا بِالۡاِيۡمَانِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِىۡ قُلُوۡبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا رَبَّنَاۤ اِنَّکَ رَءُوۡفٌ رَّحِيۡمٌ ٪

যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং বিশ্বাসে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাদেরকে ক্ষমা কর এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো অতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।(৫৯:১০)

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কালে আসন্ন সকল মুমিনদের প্রতি আমাদের ভালোবাসা। সকল মিথ্যে বন্ধন অদৃশ্য করে শুধু ঈমানের বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ থাকো। কেননা আমাদের ঈমানের উৎস, কার্যপদ্ধতি, ভালো-মন্দ পার্থক্য করার জন্য আমাদের মানদণ্ড একই।

আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ ছাড়া অন্য যে-কোনো কিছুর আনুগত্য ও ভালোবাসা আমাদের হৃদয় থেকে সমূলে উচ্ছেদ করে সকল ভালোবাসা নির্ধারিত রাখতে হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং অপেক্ষা করবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতিটি নির্দেশে ঝাঁপিয়ে পড়ার এবং বিজয় আসবে তখনই...

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ) وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ)

"নিশ্চয় তোমাদের ওলি কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে আর আল্লাহর কাছে অবনত হয়। যে-কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং ঈমানদারগণকে ওলি হিসেবে গ্রহণ করবে, (সে দেখতে পাবে যে) আল্লাহর দলই বিজয়ী।"(৫:৫৫-৫৬)

আল্লাহর জন্য কাউকে ঘৃণা করার দৃষ্টান্ত-ও কম নয়। বদরের ময়দানে আবু উবাইদাহ বিন জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পিতাকে হত্যা করেন এবং আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পুত্র আব্দুর রহমানকে (রাদিয়াল্লাহু আনহু, যিনি তখনও মুশরিক ছিলেন) প্রায় হত্যা করেই ফেলেছিলেন। মুসআব বিন উমাইরের রাদিয়াল্লাহু আনহু কথা বলা হচ্ছে, যিনি বদরের জিহাদে আপন ভাই উবাইদ বিন উমাইরকে হত্যা করেন আরেকভাইকে বন্দী করা মুসলিম আনসারকে নিজের ভাই সাব্যস্ত করে সহোদরকে শক্ত করে বাঁধার পরামর্শ দেন।

কাফিরদের প্রতি সামান্যের জন্যও ঝুঁকা যাবে না। সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা.-এর মা তাঁর ইসলাম গ্রহণের পর বাপ-দাদার ধর্মে ফিরে যাওয়ার জন্য নিজে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ দেন। কিন্তু মায়ের ভালোবাসা তাঁর আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার ঊর্ধ্বে যায়নি, অটল ছিলেন ইমানের উপর।

وَاِنۡ جَاہَدٰکَ عَلٰۤی اَنۡ تُشۡرِکَ بِیۡ مَا لَیۡسَ لَکَ بِہٖ عِلۡمٌ ۙ فَلَا تُطِعۡہُمَا وَصَاحِبۡہُمَا فِی الدُّنۡیَا مَعۡرُوۡفًا

তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে শরিক করতে পীড়াপীড়ি করে, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের কথা মান্য করো না, তবে পৃথিবীতে তাদের সঙ্গে সদভাবে বসবাস কর(৩১:১৫)

یٰۤاَیُّہَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تَتَّخِذُوۡۤا اٰبَآءَکُمۡ وَاِخۡوَانَکُمۡ اَوۡلِیَآءَ اِنِ اسۡتَحَبُّوا الۡکُفۡرَ عَلَی الۡاِیۡمَانِ ؕ وَمَنۡ یَّتَوَلَّہُمۡ مِّنۡکُمۡ فَاُولٰٓئِکَ ہُمُ الظّٰلِمُوۡنَ

হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের পিতা ও ভ্রাতৃগণ যদি ঈমানের মুকাবিলায় কুফরীকে পছন্দ করে, তাহলে তাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না। তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে অভিভাবক করবে, তারাই হবে অত্যাচারী।(৯:২৩)

কুফফারদের প্রতি শত্রুতা ও ঘৃণা পোষণ করতে হবে। ইবরাহিম আ.-এর মতো বলতে হবে.....

وَبَدَا بَیۡنَنَا وَبَیۡنَکُمُ الۡعَدَاوَۃُ وَالۡبَغۡضَآءُ اَبَدًا حَتّٰی تُؤۡمِنُوۡا بِاللّٰہِ وَحۡدَہٗۤ

তোমাদের ও আমাদের মধ্যে চিরকালের জন্য সৃষ্টি হল শত্রুতা ও বিদ্বেষ, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছ।'(৬০:৪)

বিষয়টিকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করলে.....

"মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সহচরগণ ... তাওরাতে এবং ইঞ্জিলে তাদের বর্ণনা এরূপ যেমন একটি চারা গাছ যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর তা শক্ত ও মজবুত হয় এবং কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে, চাষীকে আনন্দে অভিভূত করে, যেন আল্লাহ তাদের দ্বারা কাফিরদের অন্তর্জালা সৃষ্টি করেন..." (৪৮: ২৯)

"হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় দ্বীন থেকে ফিরে যাবে, অচিরে আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালোবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ-তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। ..." (৫:৫৪)

সম্পূর্ণ গাছটি হচ্ছে দ্বীন। 'আল্লাহর জন্য ভালোবাসা' হচ্ছে সেই বীজ যা থেকে প্রতিটি কাজ এবং বিশ্বাস-প্রতিটি পাতা এবং ফল-অংকুরিত হয় আর এজন্যই এই ভালোবাসাটাই এ আয়াতে সর্বপ্রথম উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর লাভ হবে সেই

বীজের প্রথম ফল, <u>আল-ওয়ালা ওয়াল বারা-'মুসলিমদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে'।</u>

حديث كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَالْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ، تُفَيِّئُهَا الرِّيحُ مَرَّةً، وَتَعْدِلُهَا مَرَّةً وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَالأَرْزَةِ، لاَ تَزَالُ، حَتَّى يَكُونَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً

কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ নাবী ﷺ বলেছেনঃ মু'মিন ব্যক্তির উদাহরণ হল সে শস্যক্ষেত্রের নরম চারা গাছের ন্যায়, যাকে বাতাস একবার কাত করে ফেলে, আরেকবার সোজা করে দেয়। আর মুনাফিকের উদাহরণ, সে যেন ভূমির উপর কঠিনভাবে স্থাপিত বৃক্ষ, যাকে কোন ক্রমেই নোয়ানো যায় না। অবশেষে এক ঝটকায় মূলসহ তা উৎপাটিত হয়ে যায়।[১৭১]

এই দমকা হাওয়া প্রথমেই বন্ধু আর শত্রুর পার্থক্যকে ভুলিয়ে দিতে চায়, গাছের পাতাকে ঝরিয়ে দিতে চায় কিন্তু মুমিন তাতে নুইয়ে পড়লেও আবার সোজা হয়ে যায় বলে কাফিরদের হৃদয়ে অন্তর্জালা সৃষ্টি হয়। অর্থ্যাৎ 'আল ওয়ালা আল বারা'-র উপর আমল করতেই হবে। যদি কাফেরদের সমঝোতার চিন্তা করে, তবে এটা হলো নিজের আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে মাঝামাঝি পর্যায়ে আসা। অথচ আল্লাহ বলেন 'কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না', আদর্শের ব্যাপারে ছাড় নয়। কিন্তু কাফেরদের প্রতি ঝুঁকলে কাফেররা মুমিনদেরকে তাদের আদর্শ থেকে বিচ্যুত করতে চায়। এজন্য কাফেরদের সাথে শত্রুতা ও বিদ্বেষ রাখতেই হবে, এই পাতাকে ঝরিয়ে দিলে তারা মুসলমানদেরকে দ্বীন থেকে সরিয়ে দিবে।

এক উম্মাহ কনসেপ্ট ও আল্লাহর রজ্জু কুরআনকে আঁকড়ে ধরা

ইবরাহিম (আঃ) এই উম্মতের নাম রেখেছেন মুসলিম। তিনি প্রস্তাব করেছেন এই নামটি, ফলে এ উম্মতের ধর্ম হয়েছে 'মিল্লাতে ইসলামিয়্যাহ' নামে।

مِلَّةَ اَبِيۡكُمۡ اِبۡرٰهِيۡمَ‌ؕ هُوَ سَمّٰٮكُمُ الۡمُسۡلِمِيۡنَ ۙ

তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের মিল্লাত (ধর্মাদর্শ মেনে চল); তিনি পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন 'মুসলিম' এবং এই গ্রন্থে ও;(২২:৭৮)

ইসলাম ধর্ম সমগ্র বিশ্বের জন্য এক অনন্য নির্দেশনামা। ইসলাম মানেই আল্লাহর আনুগত্য, নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ। এই ধর্ম আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম এবং এর অনুসারীদের জন্য নির্দেশনাস্বরূপ কুরআনকে পাঠানো হয়েছে এবং তাতেই নির্দেশ এসেছে একে শক্ত করে ধরার জন্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَاعۡتَصِمُوۡا بِحَبۡلِ اللّٰهِ جَمِيۡعًا وَّلَا تَفَرَّقُوۡا

তোমরা সকলে আল্লাহর রশি(ধর্ম বা কুরআন)কে শক্ত করে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।(০৩:১০৩)

এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মুক্তি ও ঐক্যের পথ বাতলে দিয়েছেন।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের রেওয়ায়েতে হুযুর ﷺ বলেন,

كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء الى الارض

অর্থাৎ, কোরআন হল আল্লাহ তাআলার রজ্জু যা আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত প্রলম্বিত। (ইবনে কাসীর) যায়েদ ইবনে আরকামের রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, حبل الله هو القرآن অর্থাৎ, 'আল্লাহর রজ্জু হচ্ছে কোরআন।' (ইবনে কাসীর)[১৭২]

কুরআন-হাদিসে সাব্যস্ত করা হয়েছে কুরুআনকে আল্লাহর রজ্জু বা রশি অর্থে। রশি যার মাধ্যমে আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক কায়েম হয় এবং কুরআনকে আঁকড়ে ধরার মাধ্যমে আল্লাহর অন্যান্য বান্দাদের হক আদায়ের মাধ্যমে তাদের সাথেও সম্পর্ক কায়েম হয়।

তাফসিরে এসেছে...*কোরআন অথবা দ্বীনকে 'রজ্জু' বলার কারণ এই যে, এটা একদিকে আল্লাহ তাআলার সাথে বিশ্ববাসী মানুষের সম্পর্ক কায়েম করে এবং অন্যদিকে বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে পরস্পর ঐক্যবদ্ধ করে একদলে পরিণত করে।* [১৭৩]

এমনকি ইমাম শফি রহ. এই নীতিটিকে মুসলমানদের জাতীয় শক্তির দ্বিতীয় ভিত্তি অভিহিত করেছেন। [১৭৪] এক উম্মাহর এই ধারণাকে মুসলিমদের মাঝে প্রোথিত করে ঐক্যের সুতায় নিজেদেরকে বাঁধতে হবে। আয়াতের পরের অংশেই রয়েছে আরেকটি নির্দেশ -রশি শক্ত করে ধরার পর বিভক্ত না হওয়া অর্থ্যাৎ ইফতিরাক না করে হোক সেটা ইখতিলাফের মুখোশে। তবেই নিজেদের মধ্যকার বিভেদ দূর হবে, আল ওয়ালার পুনর্জাগরণ হবে। ফলাফল হবে এই যে,

وَاذۡكُرُوۡا نِعۡمَتَ اللّٰهِ عَلَيۡكُمۡ اِذۡ كُنۡتُمۡ اَعۡدَآءً فَاَلَّفَ بَيۡنَ قُلُوۡبِكُمۡ فَاَصۡبَحۡتُمۡ بِنِعۡمَتِهٖۤ اِخۡوَانًا ۚ وَكُنۡتُمۡ عَلٰى شَفَا حُفۡرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنۡقَذَكُمۡ مِّنۡهَا ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَـكُمۡ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُوۡنَ

তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ কর; তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করলেন। ফলে তোমরা তাঁর অনুগ্রহে পরস্পর ভাই-ভাই হয়ে গেলে। তোমরা অগ্নিকুন্ডের (দোযখের) প্রান্তে ছিলে, অতঃপর তিনি (আল্লাহ) তা হতে তোমাদেরকে উদ্ধার করেছেন। এরূপে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শন স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন, যাতে তোমরা সৎপথ পেতে পার।(৩:১০৩)

আল্লাহ দুনিয়াবি মুসিবত বা ঝগড়া ফাসাদের অবসান করে তো দিবেনই এবং পরস্পর মিল–মহব্বত সৃষ্টি করে দিবেন। তাছাড়া এই আয়াতে ইফতিরাকের দরজাকে বন্ধ করে নিজেদেরকে 'এক উম্মাহ'– ধারণার উপর একত্র হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন আল্লাহ। তিনি কুরআন প্রণয়নের মাধ্যমে দ্বীন ইসলামের গণ্ডিতে মুসলিমদেরকে প্রবেশ করিয়ে জাহান্নামের কিনারা থেকে টেনে এনে মুক্তি–ও দিবেন কেবলমাত্র আল্লাহর রজ্জুকে শক্ত করে ধরে অনৈক্য থেকে বেঁচে থাকলে। নবী ﷺ এর উম্মতের কল্যাণকামিতার দিকে তাকালে উম্মতের প্রতি তার দরদ স্পষ্ট হওয়ার সাথে সাথে এ কথাও বুঝা যায় যে তিনি আমাদের ঐক্যবদ্ধ অবস্থায় থাকাকে পছন্দ করবেন। সহিহ মুসলিমের এক হাদিসে নবিজির ﷺ আল্লাহর কাছে দুহাত তুলে বারবার কান্নাজড়িত কণ্ঠে اللهم امتي امتي বলে কান্না করার কথা এসেছে। আল্লাহ তায়ালা জিবরাইল (আ) কে কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করতে প্রেরণ করলেনঃ (এবং বললেন, অবশ্য আমি সব জানি।) জিবরাঈলের(আ) জওয়াবে আল্লাহ্ রসূল ﷺ বললেনঃ ‘আমি আমার উম্মতের মাগফেরাত চাই।’ আল্লাহ্ তাআলা জিবরাঈলকে বললেনঃ ‘যাও, গিয়ে বল যে, আল্লাহ্ তাআলা উম্মতের ব্যাপারে আপনাকে সন্তুষ্ট করবেন এবং আপনাকে দুঃখিত করবেন না।’

যে উম্মাহর এত বড় সৌভাগ্য যে তাদের নবী ﷺ তাদের জন্য আল্লাহর দরবারে ‘আমার উম্মত, আমার উম্মত’ বলে কান্নাকাটি করেছেন, সেই উম্মাহ কি করে ’এক উম্মাহ’ ধারণা থেকে বিচ্যুত হয়? এ বিচ্যুতি থেকে ফিরে এসে এক উম্মাহ কনসেপ্টের উপর মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে যার রশি বা ভিত্তি হবে কুরআন ও আল্লাহর মনোনীত দ্বীন ইসলাম। আর জামাআতের অধীনে থাকাকে ইসলাম ফারজে আইন করেছে। অর্থ্যাৎ প্রত্যেকের উপর ফরজ যে ঐক্যবদ্ধ থাকবে, বিভক্ত হবে না যেমনটা পূর্ববর্তীরা করেছিল। এই দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশনা এসেছে এই উম্মাহর প্রতি।

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِىْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ؕ

তিনি তোমাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন দ্বীন; যার নির্দেশ দিয়েছিলেন নূহকে এবং যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি তোমাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই বলে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওতে মতভেদ করো না।(৪২:১৩)

দ্বীন প্রতিষ্ঠার এই কাজ সাহাবিরা(রা) করে গেছেন। তারা পুরো জামাআত এই যাত্রার অভিযাত্রী ছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম(রা) কল্যাণের প্রতি আহ্বান এবং

সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ এর মহান লক্ষ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করে অল্পদিনের মধ্যে সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। এমনকি তৎকালীন দুই পরাশক্তি রোম ও পারস্যের বিশাল সাম্রাজ্যকে পদানত করেন। পৃথিবী থেকে সর্বপ্রকার ফিতনা নির্মূলে কুরআনী শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

পূর্ববর্তী জাতির ধ্বংসের কারণ ছিল বিভক্তি ও অনৈক্য। এর বিপরীতে তাই মুসলিমদের দরকার জামাআতবদ্ধ থাকা যেন মুসলিমরা আবার-ও প্রতিষ্ঠা করতে পারে খিলাফাহ যার ভিত্তি হবে কুরআন ও দ্বীনে ইসলাম।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, '*আল্লাহ তোমাদের নিকট হতে তিনটি বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকেন ও তিনটি বিষয়ে অসন্তুষ্ট হন। তিনি যেসব বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকেন তা হলো–তোমরা শুধু তাঁরই ইবাদত করবে ও তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, তোমরা আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে এবং তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না।[১৭৫]*

কুরতুবী রহ. ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বক্তব্য উল্লেখ করে বলেন, *"(তিনি তাদের আদেশ দিয়েছেন) জামাতবদ্ধ থাকার। আল্লাহ তাআলা ঐক্যের আদেশ দেন ও অনৈক্যকে নিষেধ করেন। কারণ অনৈক্য হলো ধ্বংস আর ঐক্য হলো নাজাত।*"[১৭৬]

আল্লাহর রশি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অর্থ আল্লাহর হুকুম-আহকাম থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া। যেসকল বিধান জামাআতের সাথে আদায় করা জরুরি তা আদায় করার জন্য জামাআতবদ্ধ থাকতেই হবে- জিহাদ, হিসবাহ, দাওয়াত।

ভিত্তি হবে দ্বীনে ইসলাম বা কুরআন। জাহিলিয়াত হবে পরাজিত যখন ইসলামকে প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগকৃত প্রত্যেকেই শরীয়তের সীমা লঙ্ঘন করবে না কিংবা শিথিলতা প্রদর্শন করবে না। সীমা লঙ্ঘন কিংবা শিথিলতার মানে হলো আল্লাহর রজ্জুকে ঢিলেঢালাভাবে ধরা, তাই সম্ভাবনা থাকে নিজে তা থেকে ছিটকে যাওয়ার বা রশিটি হাত থেকে ফসকে যাওয়ার। এজন্য শক্ত করে ধরতে হবে অর্থ্যাৎ উম্মাতকে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করতে হবে এবং পরিপূর্ণ শরিয়াহ মেনে চলতে হবে এবং উম্মতের বাকিদেরকেও শরিয়াহর অনুকূলে চলার আহ্বান জানাতে হবে। এই রশি কখনো ছিড়বে না, তাই দৃঢ়তার সাথে ধরতে হবে।

ইখতিলাফকে পাশে রেখে জামাআতবদ্ধ হওয়া

ইসলামে ভ্রাতৃত্ববোধের গুরুত্ব এত অধিক যে হত্যাকারীকে নিহত পরিবার-পরিজনের ভাই বলা হয়েছে।[১৭৭] ইমানের ভিত্তিতে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে সেই

মুমিন ভাইদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা মানে ইমানকে মূল্যায়ণ করা। কেননা *উম্মতের বিভক্তির অন্যতম কারণ বিভিন্ন অজুহাতে ঈমানের গুরুত্ব অবমূল্যয়ন করা।.... ....আর ভিন্ন মতের কারণে মুমিনের ঈমান, সালাত, সিয়াম ও অন্যান্য সকল ইবাদতকে অবমূল্যায়ন করে তার বিরুদ্ধে অবজ্ঞা, বিদ্বেষ বা শত্রুতা পোষণ বা প্রচার করা আরো অধিক অন্যায়।* [১৭৮]

ইখতিলাফকে বড় করে দেখা মানে নিজেদেরকে কুফফারদের ইসলামবিরোধী এজেন্ডা বাস্তবায়নে সহায়তা করা। কেননা তাদের এক গবেষণাপত্রে ইখতিলাফি দ্বন্দ্বকে উৎসাহিত করার পরামর্শ ব্যক্ত করেছে ইসলামকে ধ্বংস করার হীন উদ্দেশ্যকে। এ কারণে ইখতিলাফে মাহমুদকে সমর্থন করে ইখতিলাফে মাদ্বমুমকে পরিহার করা জরুরি। কুফরি শক্তি চায় মুসলিমদের ঐক্যে ফাটল ধরাতে। কেননা তারা জানে মুসলিমরা এমন এক কালিমার অনুসারী যে কালিমা সকল প্রকার বিভেদকে দূর করে বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করে দেয়। তাই তারা মুসলিমদের ঐক্য বিনষ্ট করাকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে। এক্ষেত্রে পরিপূর্ণ হিকমাহর পরিচয় দেওয়ার মাধ্যমে কুফফারদেরকে থামিয়ে দিতে হবে।

মুসকান ইস্যুতে যখন সারা ভারতজুড়ে তোলপাড় তখন ইমান-কুফর সংঘর্ষকে কাফেররা ঘুরিয়ে দিয়ে মুসলিমদের মাঝে অভ্যন্তরীণ ইখতিলাফি দ্বন্দ্বকে উস্কে দিতে হলুদ মিডিয়া এক টকশোতে একজন আলেমে দ্বীনকে প্রশ্ন করে যে মুখ ঢাকা কি ফরজ নাকি মুস্তাহাব। সেই আলেমের দ্বীনের প্রজ্ঞাপূর্ণ ও বুদ্ধিদীপ্ত জবাব ছিল, "যার লজ্জা যত সে তত বেশি ঢেকে রাখবে।" অর্থ্যৎ তিনি মুসলিমদের মাঝে বিদ্যমান ইখতিলাফকে পাশে রেখে হিকমাহর পরিচয় দিয়েছেন, কুফফারদের হীন ষড়যন্ত্র মোকাবেলায় আলেমদের এমন সক্রিয় ও হিকমাহপূর্ণ ভূমিকা জরুরি ও প্রশংসনীয়।

আমাদের বর্তমান অবস্থা সত্যি সেই জাতির মত হয়েছে, যাদের মাঝে হিংসা ও বিদ্বেষ বিদ্যমান ছিল। হিংসা ও বিদ্বেষ শব্দ দুটির অবস্থানও পাশাপাশি। মূলত হিংসা থেকেই বিদ্বেষের জন্ম নেয়। বর্তমানে এই হিংসাও বিদ্বেষ প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে আলেম এবং ওলামাদের মাঝেও। আলেম এবং ওলামারা দীনের মুজতাহিদ। অথচ একজনের সাথে অপরজনের মতের মিল না হলেই পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ শুরু করে।.....এই অবস্থা যেন তৈরী না হয় সে জন্য ইসলামে 'ইখতিলাফের সুযোগ রয়েছে।....ইখতিলাফের মূল সৌন্দর্য হল, মতভেদ সত্ত্বেও কেউ কারো মতকে বাতিল বলে গণ্য না করা। কারো প্রতি বিদ্বেষ পোষণ না করা এবং সর্বোপরি পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা না হারানো।....কিন্তু বর্তমানে ইখতিলাফের স্থান 'ইফতিরাক দখল করে নিয়েছে। [১৭৯]

ইখতিলাফের অবকাশ আছে, নেই ইফতিরাকের। ইফতিরাক মানে ভিন্ন মতের কাউকে সমর্থন না করে তাকে বাতিল বলা, এগুলো দ্বীনে ইসলামে নিষেধ করা হয়েছে, সাহাবিরা এমন কখনো করেননি। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَہُمُ الْبَيِّنٰتُ

আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, বিচ্ছিন্নতা ও মতবিরোধের কারণে পূর্ববর্তী জাতিসমূহ ধ্বংস হয়ে গেছে। তোমরা তাদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর এবং নিজেদের মধ্যে এ ব্যাধি অনুপ্রবেশ করতে দিও না।[১৮০]

সাহাবিরা ইখতিলাফে বিশ্বাস করতেন, অবশ্যই তা ইখতিলাফে মাহমুদ। তারা কখনোই ইখতিলাফে মাদমুমের চর্চা করেননি। এমনকি আকিদাগত মতভেদের ক্ষেত্রেও ঐক্যের কথা ভুলে যাননি, লক্ষ্য রেখেছেন জামাআত বা ঐক্যবোধের দিকে। খারিজীরা সাহাবিদেরকে কাফির সাব্যস্ত করলেও সাহাবিরা খারিজীদের ইমান ও আমলের মূল্যায়ণ করেছেন। এমনকি তাদের পিছনে সালাত-ও আদায় করেছেন। আর বর্তমান উম্মাহ তো এক মাযহাবের মুসলিম অন্য মাযহাবের কাউকে সহ্য করতে পারে না, এমনকি ভিন্নমতের অনুসারীদের মসজিদে সালাতও আদায় করতে চায় না। আমাদের সাহাবিদের নীতির অনুসরণ করা উচিত। কেননা....

সমকালীন বিভক্তির অন্যতম কারণ মতভেদের ক্ষেত্রে সাহাবীগণের কর্মধারা পরিত্যাগ করা। আমরা দেখি যে, সাহাবীগণের যুগ থেকেই উপরের দু'প্রকারের মতভেদ বিদ্যমান ছিল। উভয় ক্ষেত্রেই তারা জামাআত বা ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের দিকে লক্ষ্য রেখেছেন। সাহাবী-তাবিয়ীগণ আকীদা বিষয়ক মতভেদকে নিন্দনীয় ও বর্জনীয় বলে গণ্য করেছেন। কারণ আকীদা অপরিবর্তনীয় ও স্থির।.....এরপরও তারা আকীদা বিষয়ক মতভেদ বাবিভ্রান্তিতে লিপ্তদের প্রতি জামাআত, ভ্রাতৃত্ব বা ঐক্যবোধের চেতনা লালন করতেন.....ফিকহী মতভেদকে সাহাবী-তাবিয়ীগণ নিন্দনীয় বা বর্জনীয় বলে গণ্য করেননি। এক্ষেত্রে সাধারণত তারা নিজের মতের পক্ষে দলিল পেশ করতেন, তবে ভিন্নমতকে বাতিল করতেন না। কেউ ভিন্ন মত খন্ডন করলেও কখনোই তারা ফিকহী ভিন্নমতের কারণে ভিন্নমতাবলম্বীকে অবজ্ঞা করেননি এবং তার থেকে বিমুক্তি বা বিচ্ছিন্নতার কথা বলেননি। বরং, ভিন্নমত-সহ পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব, ভালবাসা, শ্রদ্ধাবোধ ও ঐক্যবোধ লালন করেছেন। [১৮১]

বর্তমানে ইমাম ও ফকিহগণ ইখতিলাফ বিষয়ক সুন্দর সমাধান দিয়েছেন যা উম্মতের মাঝে ঐক্য বজায় রাখতে সহায়ক। প্রত্যেকেই ইখতিলাফি আলোচনা

করতে পারবে তবে নিজের মত অধিক সঠিক, তবে মতটি ভুল-ও হতে পারে। তাফসিরে এসেছে,

শরীয়ত সম্মত ইজতেহাদী মতবিরোধে যে ইমাম যে পক্ষ অবলম্বন করেন, তন্মধ্যে আল্লাহ তাআলার কাছে এক পক্ষ ভুল ও অপরপক্ষ সঠিক হলেও তা মীমাংসা করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তাআলার। তিনি হাশরের ময়দানে সঠিক ইজতেহাদকারী আলেমকে দ্বিগুণ সওয়াব দান করবেন এবং যার ইজতেহাদ ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হবে, তাকে একটি সওয়াব দান করবেন। ইজতেহাদী মতবিরোধে কারণ একথা বলার অধিকার নাই যে, নিশ্চিতরূপে এ পক্ষ সঠিক এবং ও পক্ষ ভ্রান্ত। অবশ্য কোন ব্যক্তি যদি স্বীয় জ্ঞানবুদ্ধির আলোতে এক পক্ষকে কোরআন ও সুন্নাহর অধিক নিকটবর্তী মনে করে, তবে সে এরূপ বলতে পারে যে, আমার মতে এ পক্ষটি সঠিক, কিন্তু ভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে এবং এ পক্ষটি ভ্রান্ত, কিন্তু সঠিক হওয়ার সম্ভাবনাও আছে। এ নীতিকথাটি ইমাম ও ফেকাহবিদগণের কাছে স্বীকৃত। এতে আরও বুঝা যায় যে, ইজতেহাদী মতবিরোধে কোন পক্ষ এরূপ অসৎ হয় না যে, 'সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ'-এর নীতি অনুযায়ী তাকে নিন্দা করা যেতে পারে। সুতরাং যা অসৎ নয়, তাকে নিন্দা করা থেকে বিরত থাকা অত্যাবশ্যক।[১৮২]

সাহাবি ও তাদের পরবর্তীদের অনুসরণে উম্মাহর এই ক্রান্তিলগ্নে এক কালিমার ভিত্তিতে জামাআতবদ্ধ হওয়াই পারে উম্মাহর পতনকে ঠেকাতে। জামাআতের সংজ্ঞা এসেছে, *হৃদয়ের মধ্যে সকল মুসলিমের প্রতি ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ব অনুভব করা, মতভেদ সত্ত্বেও মুসলিমকে নিজের দ্বীনী ভাই এবং নিজের দলের মনে করা এবং নিজেকে সকলের সাথে ঐক্যবদ্ধ বলে মনে করাই মূলত জামাআত।* [১৮৩] ভিন্নমতের অনুসারী মুসলিম ভাইদেরকে কাছে টেনে নেওয়ার কারণ এই যে আকিদার মৌলিক বিষয়ে কোনো ইখতিলাফ নেই। এজন্য সেই আকিদাকে ভিত্তি করে ভ্রাতৃত্ববোধকে জাগ্রত করতে হবে। কেননা মুসলিমরা এমন এক আকীদা লালন করে যার ফলে ভুল পথে চলতে গিয়েও সঠিক পথের দিশা হয় এই আকীদা। এই আকীদা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তন করে দেয়, দেহটা দুনিয়াতে থাকলেও অন্তর থাকে জান্নাতে। ফলে তারাই পারে এক আল্লাহর দিকে তাকিয়ে মুসলিম ভাইকে কাছে টেনে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে।

খিলাফাত প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হওয়া

খিলাফাত সুসংগঠিত একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা যা একক আল্লাহর দাসত্বের ভিত্তিতে তিষ্ঠিত। খিলাফাত কেবলমাত্র আল্লাহর জমিনে কালিমাকে বুলন্দ করার উদ্দেশ্যে, মানুষকে মানুষের বা বস্তুর গোলামি থেকে সার্বভৌমত্বের অধিকারী রব্বে কারীমের

গোলামির দিকে আনতে। খিলাফাত নিশ্চিত করে মুসলিমদের নিরাপত্তা, নিশ্চয়তা ও দ্বীন পালনের উপযুক্ত মাহাল। এমনকি জিযিয়া কর দিয়ে খিলাফাতের অধীনে অমুসলিমদের জান-মালের নিরাপত্তা ও পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়। ইতিহাস সাক্ষী, অমুসলিমদের অধীনে অমুসলিমরা যতটুকু নিরাপত্তা ও শান্তিতে বসবাস করেছেন তার চাইতে শতগুণ বেশি নিরাপত্তা ও শান্তিতে জীবন পার করতে পেরেছে খিলাফাহর অধীনে। খিলাফাহ কোনো মানবরচিত সংবিধানে নয়, বরং কুরআন ও সুন্নতে নববীর আদর্শে পরিচালিত হয়। খিলাফাহর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার দ্বারা উম্মাহ আবারও সুসংগঠিত হতে পারবে, পতনোন্মুখ উম্মাহ আবারও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে বিশ্বদরবারে, জিল্লতির জিন্দেগীর হবে অবসান।
দ্বীন ও দুনিয়ার সুরক্ষাকল্পে খিলাফাত প্রতিষ্ঠার হুকুম ইসলামই দিয়েছে। এবং ইসলামই এর উদ্দেশ্য, আদর্শ ও নিয়মাবলি বলে দিয়েছে। কারোই ক্ষমতা নেই এই হুকুমকে পাল্টে দেওয়ার, সে যে-ই হোক না কেন। এই হুকুম লঙ্ঘন করলে জাহিলি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, যাকে অপসারণ করা আবশ্যক। মুসলিমরা আজকে যেসব সমস্যার সম্মুখীন, ইসলামি খিলাফাতই হলো সেগুলোর সমাধান। যে অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার কারণে আমরা আজ নাস্তিক্যবাদী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের গোলাম হয়ে আছি, সেটার চিকিৎসা খিলাফাত। কথিত মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জগতে পশ্চাৎপদতার সমাধান খিলাফাত। আমাদের ভূমি ও তীর্থস্থানগুলোর সুরক্ষা দিতে পারার মতো সামরিক অক্ষমতা-দুর্বলতার সমাধানও খিলাফাত। এটিই সমাধা করবে মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়া জুলুম-অবিচারের। মুসলিমদের নৈতিক পদস্খলন, হীনম্মন্যতা ও পরাজিত মানসিকতারও এটিই সমাধান।[১৮৪]

খিলাফাহ পুনঃপ্রতিষ্ঠার কিছু ধাপ মুসলিমদের অতিক্রম করতে হবে।ধাপগুলি নিম্নরূপ.....
প্রথমত, প্রজন্ম তৈরি করা যারা সাহাবিদের মতো বলতে পারবে سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا 'আমরা শুনলাম ও মানলাম'। আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُوْرِ مِنْۢ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصّٰلِحُوْنَ
আর উপদেশ দেয়ার পর আমি কিতাবে লিখে দিয়েছি যে, 'আমার সৎকর্মশীল বান্দাগণই পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবে'। (২১:১০৫)

নবীজি ﷺ জিহাদের মাধমে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বধাপ ছিল দাওয়াহ-হিসবাহর মাধ্যমে একটি প্রজন্মকে তৈরি করা যারা ইসলামের ভাবধারায় ও বেড়ে উঠবে, দিলে লালন করবে ইমানী স্পৃহা। মক্কায় থাকা অবস্থাতে মদীনায় এমন একদলকে তৈরি করতে ও মানসিকভাবে তাদেরকে প্রস্তুত করতে মুসআব ইবনে উমায়ের রা.-কে মদীনায় পাঠানো হয়। আল্লাহ শুরুতেই নবী ﷺ-কে মদীনায়

গিয়ে রাষ্ট্রে ঘোষণা করতে বলেন নি। প্রজন্ম গড়ে তোলার দ্বারা সূচনা করা আসমানী নির্দেশনা মোতাবেক সঠিক সিদ্ধান্ত।

ফিরআউনের কবল থেকে মুক্ত পাওয়া জাতিকে যখন পবিত্র ভূমির প্রতিশ্রুতি দিয়ে জিহাদের আদেশ দেওয়া হয়। তখন তাদের জবাব–

قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ ۖ وَاِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا ۚ فَاِنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنَّا دٰخِلُوْنَقَالَ
رَجُلٰنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۚ فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَاِنَّكُمْ غٰلِبُوْنَ ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْٓا
اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَقَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَآ اَبَدًا مَّا دَامُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَآ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ

তারা বলল, হে মূসা! সেখানে এক দুর্দান্ত সম্প্রদায় রয়েছে এবং তারা সেই স্থান হতে বের না হওয়া পর্যন্ত আমরা সেখানে কক্ষনো প্রবেশ করব না। তারা সেই স্থান হতে বের হয়ে গেলে তবেই আমরা প্রবেশ করব।'তাদের মধ্যে দু'জন যারা (আল্লাহকে) ভয় করত, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন, তারা বলল, 'তোমরা নগরদ্বারে প্রবেশ করে তাদের মোকাবেলা কর, সেখানে প্রবেশ করলেই তোমরা জয়ী হবে। আর তোমরা বিশ্বাসী হলে আল্লাহর উপরই নির্ভর কর।'তারা বলল, *'হে মূসা! তারা যত দিন সেখানে থাকবে, ততদিন আমরা সেখানে প্রবেশ করবই না, সুতরাং তুমি ও তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ কর, আমরা এখানেই বসে থাকব।'* (৫:২২-২৪)

এটা এ কারণে যে তারা দীর্ঘকাল মূর্তিপূজকদের অধীনে ছিল। এ কারণে তারা জান্নাতি খাবারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে আগের খাদ্যাভ্যাসে চলে যেতে চাইছিল। তারা বঞ্চনা ও দাসত্বের জীবন থেকে বের হয়ে আসার মানসিকতা রাখতো না। কিন্তু ৪০ বছরের নির্বাসনের সময়টাতে মুসা আ. এর তত্ত্বাবধানে বড় হয়ে উঠা নতুন প্রজন্ম লালন করেছে জেরুজালেম জয়ের বাসনাকে এবং এদেরকে দিসেই জেরুজালেমে মুসলিমদের কর্তৃত্বকে আল্লাহ প্রতিষ্ঠিত করেন।

দ্বিতীয়ত, সেই প্রজন্মের মাঝে তাকওয়ার বীজ বুনে দেওয়া। প্রজন্ম তৈরির জন্য সেই প্রজন্মকে তাকওয়ার সবক শিখানো জরুরি। কেন? কারণ মুসলিম জাতির শক্তির প্রথম ভিত্তি হলো তাকাওয়া।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ

হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর। এবং তোমরা আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।(৩:১০২)

রসুলুল্লাহ ﷺ যেকোনো বাহিনীকে প্রেরণ করেছেন, তাদেরকে তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন। আবার আবু বকর রা. অন্তিম শয্যায় উমর রা.-কে খিলাফাতের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে শুরুতেই বলেন, 'হে উমর! আল্লাহকে ভয় করো'[১৮৫]

তৃতীয়ত, জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করা ও দাওয়াহ-হিসবাহর দায়িত্ব পালন করা। দুনিয়ার মুহাব্বাতকে তাদের দিল থেকে হটিয়ে আখিরাতের মুহাব্বাত ও মৃত্যুর ভয়কে দূর করে শাহাদাতের তামান্নাকে হৃদয়ের মাঝে গেঁথে দিতে হবে।

চতুর্থত, জামাআতের অধীনে থাকা। জিহাদ পরিচালনা কিংবা দাওয়াহ-হিসবাহ সর্বক্ষেত্রেই-মুসলিমরা দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে যাবে তখনই কুফরি শক্তি তার বিরোধিতা করবে।

وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا

যদি তারা সক্ষম হয়, তাহলে যে পর্যন্ত তোমাদের (সুপ্রতিষ্ঠিত) ধর্ম থেকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে না দেয়, সে পর্যন্ত তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে। (২:২১৭)

তাহলে সমাধান-

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا

তোমরা সকলে আল্লাহর রশি(ধর্ম বা কুরআন)কে শক্ত করে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। (৩:১০৩)

এই জামাতকে এই প্রতিষ্ঠিত হতে হবে পরিপূর্ণ শরিয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত। শাসন-ক্ষমতা পাওয়ার উপায় ও পথ হল সৎকর্ম। আল্লাহ ও রসূলের বিধি-বিধান অনুসারে জীবন অতিবাহিত করা এবং শরীয়তের নিয়ম-কানুন ও সীমা মেনে চলা।

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُوْرِ مِنْۢ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصّٰلِحُوْنَ

আমি (যাবূর) কিতাবে উপদেশের পর লিখে দিয়েছি যে, ‘নিশ্চয় আমার সৎকর্মশীল বান্দারা পৃথিবীর অধিকারী হবে।’(২১:১০৫)

দুনিয়ালোভী ও সেক্যুলার শাসকদের চাটুকার কোনো আলেম নয় বরং হক্কানী, মুত্তাকী আলেমরাই হবে রাহবার। *আল্লাহর ব্যাপারে জ্ঞান কম, এরকম আলিমকে কিছুতেই জামাতের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। এসকল আলিম হারামের ব্যাপারে জ্ঞান রাখলেও নিজেই হারামে লিপ্ত হয়। তাকওয়াবিহীন এসকল আলিম জামাতের জন্য ও এর কর্মীদের জন্য দুর্গতি বয়ে আনবে।*[১৮৬]

ইসলামের একটি মূলনীতি হলো “যেটি ব্যতিরেকে কোনো ফরয দায়িত্ব আটকে থাকে, সেটি অর্জন করাও ফরয।”*আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার ফরয দায়িত্ব পালন করতে গেলেই আমরা এমন এক বাহিনীর মুখোমুখি হব যারা জাহিলিয়াত প্রতিষ্ঠা করতে চায়। পরিকল্পিত সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ছাড়া এসকল বাহিনীকে প্রতিহত করা অসম্ভব। তাই উল্লেখিত মূলনীতি অনুযায়ী, মুসলিমদের জামাতবদ্ধ হওয়া, নেতা নিয়োগ করা, সঠিক জায়গায় সঠিক দক্ষতার লোক নিয়োগ করা সবই আমাদের ওপর ফরয।*[১৮৭]

পঞ্চমত, ‘মুমিন কমানো একই গর্তে দুইবার দংশিত হয়না’ – এই মূলনীতির আলোকে অতীতের ভুলের পুনরাবৃত্তি না করে বরং অতীত থেকে শিক্ষা নিতে হবে, জানতে হবে খিলাফাতের ইতিহাসের আদ্যোপান্ত।

তথ্যসূত্র

[১]তাফসিরুল উশরিল আখির মিনাল কুরআনিল কারিম,পৃ-৬৯
[২]আর-রহস সালাত বইয়ের অনুবাদ 'খুশু-খুযু',পৃষ্ঠা – ২৩
[৩]সংক্ষিপ্ত তাফসিরে মা'আরেফুল কোরআন, পৃষ্ঠা ২৮,২৯
[৪]Tafsir Ahsanul Bayaan, Greentech apps
[৫]সংক্ষিপ্ত তাফসিরে মা'আরেফুল কোরআন, পৃষ্ঠা ১২৯৮
[৬]তাফসিরে ফাতহুল কাদির,Greentech apps
[৭]সংক্ষিপ্ত তাফসিরে মা'আরেফুল কোরআন, পৃষ্ঠা,১১২৫
[৮]সংক্ষিপ্ত তাফসিরে মা'আরেফুল কোরআন, পৃষ্ঠা ৩১৭
[৯]সংক্ষিপ্ত তাফসিরে মা'আরেফুল কোরআন, পৃষ্ঠা ৮৩৯
[১০]https://www.alkawsar.com/bn/article/442/
[১১]ফাজায়েলে আমল,পৃষ্ঠা -১৪(তাবলীগী কুতবখানা তাবলীগী ফাউন্ডেশন)
[১২]তালিমুল মুতাআল্লিম(ইসলামিয়া প্রকাশনী),পৃষ্ঠা-১৪,১৫
[১৩]আদব:সৌভাগ্যের সোপান,পৃষ্ঠা-৯৯
[১৪]যদি জীবন গড়তে চান,পৃষ্ঠা-৪৯
[১৫]আদব:সৌভাগ্যের সোপান,পৃষ্ঠা-৯৯-১০০
[১৬]ইসলামী আকিদা(IOM),পৃষ্ঠা – ৬৩
[১৭]ইসলামী আকিদা(IOM),পৃষ্ঠা–৬৩,৬৪
[১৮]ঈমান সবার আগে,পৃষ্ঠা-৫৪
[১৯]হিউমান বিয়িং,পৃ-১৪৩-৪৪
[২০]হিলইয়াতুল আউলিয়া,২/১৩২৪
[২১]সংক্ষিপ্ত তাফসিরে মা'আরেফুল কোরআন, পৃষ্ঠা-১৯১
[২২]সিরাতে খাতামুল আম্বিয়া,পৃষ্ঠা-১১৯
[২৩]https://youtu.be/WlkyzGr2JeE?si=agEv1zxf9gvAibh2
[২৪] তাফসিরুল উশরিল আখির মিনাল কুরআনিল কারিম(শেষাংশে পাঠকের প্রতি আবেদন)
[২৫]Tafseer Ahsanul bayan,Greentech apps
[২৬]হিউমান বিয়িং,পৃ-০৭
[২৭]বুখারি ও মুসলিম
[২৮]Tafseer Ahsanul bayan,Greentech apps
[২৯]আদব:সৌভাগ্যের সোপান,পৃষ্ঠা-২৪
[৩০]ইসলামী আকিদা(IOM),পৃষ্ঠা – ১৯
[৩১]Tafseer Ahsanul bayan,Greentech apps
[৩২]হিলইয়াতুল আউলিয়া,২/১৩২৪
[৩৩]সাহাবায়ে কেরামের ঈমানদীপ্ত জীবন, ১ম খন্ড(রাহনুমা প্রকাশনী),পৃষ্ঠা: ১৪-১৫)
[৩৪]Tafseer Ahsanul bayan,Greentech apps
[৩৫]ইমানের দাবি(মুআসসাসা ইসলামিয়্যাহ,বাংলাদেশ), পৃ-৪০
[৩৬]ইমানের দাবি(মুআসসাসা ইসলামিয়্যাহ,বাংলাদেশ)
[৩৭]হায়াতুস সাহাবা,২য় খণ্ড,পৃ-৪১০।
[৩৮]ফাজায়েলে আমল,পৃষ্ঠা-০৩(তাবলীগী কুতবখানা তাবলীগী ফাউন্ডেশন)
[৩৯]https://youtu.be/afnoXSTUcDU?si=QOobnWJ6nHchwPka
[৪০]সংক্ষিপ্ত তাফসিরে মা'আরেফুল কোরআন, পৃষ্ঠা-১৯৪
[৪১]সংক্ষিপ্ত তাফসিরে মা'আরেফুল কোরআন, পৃষ্ঠা-৩৮৮
[৪২]https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/2005/MR1716.pdf
[৪৩]আল্লাহর সন্তুষ্টির সন্ধানে(মিসাকুল আমালিল ইসলামি কিতাবের অনুবাদ), পৃষ্ঠা -৩১
[৪৪]কখনো ঝরে যেও না (সিরাত পাবলিকেশন), পৃ-৫৯
[৪৫]https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2007/RAND_MG574.pdf
[৪৬]আল্লাহর সন্তুষ্টির সন্ধানে(মিসাকুল আমালিল ইসলামি কিতাবের অনুবাদ), পৃষ্ঠা -৮২-৮৩
[৪৭]https://youtu.be/pbAqMrf64cw?si=CS1bEqOj1YHIU2Hf
[৪৮] https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/2005/MR1716.pdf
[৪৯]https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/2005/MR1716.pdf
[৫০] https://youtu.be/pbAqMrf64cw?si=CS1bEqOj1YHIU2Hf

[৫১] https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/2005/MR1716.pdf
[৫২]আল্লাহর সন্তুষ্টির সন্ধানে(মিসাকুল আমালিল ইসলামি কিতাবের অনুবাদ), পৃষ্ঠা -১১০
[৫৩]আল্লাহর সন্তুষ্টির সন্ধানে(মিসাকুল আমালিল ইসলামি কিতাবের অনুবাদ),পৃষ্ঠা -১১১
[৫৪]ইমানের দাবি(মুআসসাসা ইসলামিয়্যাহ,বাংলাদেশ),পৃ-১১৭
[৫৫]সহিহ মুসলিম-৮১,Alhadis apps,IRD Foundation
[৫৬]ফাজায়েলে আমল,পৃষ্ঠা -১৪(তাবলীগী কুতবখানা তাবলীগী ফাউন্ডেশন)
[৫৭]ইমানের দাবি(মুআসসাসা ইসলামিয়্যাহ, বাংলাদেশ)-১২১
[৫৮]https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%AB%E0%A6%BE_%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2_%E0%A6%86%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95
[৫৯]https://www.bbc.com/bengali/articles/cgrdr03dl61o.amp
[৬০]আল্লাহর সন্তুষ্টির সন্ধানে(মিসাকুল আমালিল ইসলামি কিতাবের অনুবাদ), পৃষ্ঠা -৮২-৮৩
[৬১]কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পোশাক, পর্দা ও দেহ-সজ্জা,পৃ- ৩০৮
[৬২]রসুলের চোখে দুনিয়া, পৃ-১৭৫
[৬৩]সংক্ষিপ্ত তাফসিরে মা'আরেফুল কোরআন, পৃষ্ঠা ৫০১
[৬৪]কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পোশাক, পর্দা ও দেহ-সজ্জা, পৃ- ২২০
[৬৫]কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পোশাক, পর্দা ও দেহ-সজ্জা,পৃ-২৯৪
[৬৬]https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2007/RAND_MG574.pdf
[৬৮] তাফসিরুল উশরিল আখির মিনাল কুরআনিল কারিম,পৃ-৮৬
[৬৯]সংক্ষিপ্ত তাফসিরে মা'আরেফুল কোরআন, পৃষ্ঠা ১৯৫।
[৭০]বুখারি:৬৪৬৭,মুসলিম :৭৩০০
[৭১]সংক্ষিপ্ত তাফসিরে মা'আরেফুল কোরআন, পৃষ্ঠা ১৪৭৫।
[৭২]ফাজায়েলে আমল,পৃষ্ঠা -১৪(তাবলীগী কুতবখানা তাবলীগী ফাউন্ডেশন)
[৭৩]ইমানের দাবি(মুআসসাসা ইসলামিয়্যাহ,বাংলাদেশ),পৃ-১০৩.
[৭৪]মুসনাদে আহমাদ ৫১১৫
[৭৫]সহিহ মুসলিম ২০৭৭
[৭৬]বায়হাকী, আসসুনানুল কুবরা ৯/১৩৪
[৭৭]বুখারি:১৪৬৯,আবু দাউদ:১৬৪৬,তিরমিজি:২০২৪
[৭৮]আল ফাতহুররব্বানি, ৯/৫৬
[৭৯]আল্লাহর সন্তুষ্টির সন্ধানে(মিসাকুল আমালিল ইসলামি কিতাবের অনুবাদ), পৃষ্ঠা -২০৬
[৮০]সুনানে আবু দাউদ, ৪২৯৭
[৮১]হায়াতুস সাহাবা,২য় খণ্ড,পৃ-৪১০
[৮২]মিশকাত ৪৯৫৪;তিরমিযী ও দারেমী।
[৮৩]আল ফাতহুররব্বানি, ৯/৫৬
[৮৪]আবূ দাঊদ হা: ৩৪৬২
[৮৫]আত্মবিচার,পৃ-১৯
[৮৬]আত্মবিচার,পৃ-৬২
[৮৭]যে জীবন ফড়িঙের,যে জীবন জোনাকির,পৃ-৬৯
[৮৮]আত্মবিচার,পৃ-৮৫
[৮৯]আত্মবিচার,পৃ-৮৫
[৯০]আত্মবিচার,পৃ-১০২
[৯১]মিশকাত,৪৯৬৭
[৯২]মিশকাত,৫২৮১;তাবারানি,আল আওসাত
[৯৩]Tafseer Fathul Majid, Alquran app,IRD Foundation
[৯৪]সহীহ বুখারী হা: ১৪
[৯৫]আবূ দাউদ,৩৪৬২
[৯৬]সংক্ষিপ্ত তাফসিরে মা'আরেফুল কোরআন, পৃষ্ঠা-১১২৪।
[৯৭] রাসুলের চোখে দুনিয়া,হাদিস -৩২৮
[৯৮] রাসুলের চোখে দুনিয়া,হাদিস -৩০৩
[৯৯] রাসুলের চোখে দুনিয়া,হাদিস -৩২৯

[১০০]হাদিসে কুদসি(ইফা),০৯
[১০১]ইমান সবার আগে,পৃ-(১৬-১৭)
[১০২]হাদিসে কুদসি(ইফা),০৯
[১০৩]হাদিসে কুদসি(ইফা),২৯
[১০৪]হাদিসে কুদসি(ইফা),১৫
[১০৫]হাদিসে কুদসি(ইফা),০৮
[১০৬]হাদিসে কুদসি(ইফা),০৯
[১০৭]সংক্ষিপ্ত তাফসিরে মা'আরেফুল কোরআন, পৃষ্ঠা-৮৩৯
[১০৮]আল্লাহর সন্তুষ্টির সন্ধানে(মিসাকুল আমালিল ইসলামি কিতাবের অনুবাদ), পৃষ্ঠা -৬৭
[১০৯]ইমান সবার আগে,পৃ-(১৬-১৭)
[১১০]https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2007/RAND_MG574.pdf
[১১১]Tafseer Ahsanul Bayan
[১১২]আবু দাঊদ হা: ৩৪৬২
[১১৩] https://www.alkawsar.com/bn/article/442/
[১১৪]বুখারি
[১১৫] বুখারী,৪৬৮৬; মুসলিম,২৫৮৩
[১১৬]বুখারি-০১;Alhadis app, IRD Foundation
[১১৭]তালিমুল মুতাআল্লিম(ইসলামিয়া প্রকাশনী),পৃষ্ঠা-২৯
[১১৮]আদব:সৌভাগ্যের সোপান,পৃষ্ঠা-১০০
[১১৯]তালিমুল মুতাআল্লিম(ইসলামিয়া প্রকাশনী),পৃষ্ঠা-২৯
[১২০]যদি জীবন গড়তে চান,পৃষ্ঠা-৪৯
[১২১]মাজমুউল ফাতওয়া লি ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহ. -১০/৩০১
[১২২]একটি সুন্নতকে বাঁচাবো বলে(শায়খ আতিক উল্লাহ),পৃষ্ঠা :০১
[১২৩]Tafseer Ahsanul bayan,Greentech apps
[১২৪]আল্লাহর সন্তুষ্টির সন্ধানে(মিসাকুল আমালিল ইসলামি কিতাবের অনুবাদ), পৃষ্ঠা -২৮
[১২৫]সীরাহ(রেইনড্রপস মিডিয়া),পৃ-১৪
[১২৬]সাহাবায়ে কেরামের ঈমানদীপ্ত জীবন, ১ম খন্ড(রাহনুমা প্রকাশনী),পৃষ্ঠা ১৬-১৭
[১২৭]সংক্ষিপ্ত তাফসিরে মা'আরেফুল কোরআন, পৃষ্ঠা-১৯২
[১২৮]সংক্ষিপ্ত তাফসিরে মা'আরেফুল কোরআন, পৃষ্ঠা-১৯৩
[১২৯]ইমানের দাবি(মুআসসাসা ইসলামিয়্যাহ,বাংলাদেশ)-১১২
[১৩০]সহিহ মুসলিম-৮১,Alhadis apps,IRD Foundation.
[১৩১]মুসলিম: ৫০৪০, আবু দাউদ: ২৫০৪
[১৩২]তিরমিজি :১৬৪১
[১৩৩]আল্লাহর সন্তুষ্টির সন্ধানে(মিসাকুল আমালিল ইসলামি কিতাবের অনুবাদ), পৃষ্ঠা -(১৪৪-১৪৫)
[১৩৪]আবু দাঊদ হা: ৩৪৬২
[১৩৫]আহমাদ,৫১১৫
[১৩৬]আল্লাহর সন্তুষ্টির সন্ধানে(মিসাকুল আমালিল ইসলামি কিতাবের অনুবাদ), পৃষ্ঠা - ১৪১
[১৩৭]মুসলিম:৫০৬৬
[১৩৮]আল্লাহর সন্তুষ্টির সন্ধানে(মিসাকুল আমালিল ইসলামি কিতাবের অনুবাদ), পৃষ্ঠা -১৩০
[১৩৯]বুখারি
[১৪০]আল্লাহর সন্তুষ্টির সন্ধানে(মিসাকুল আমালিল ইসলামি কিতাবের অনুবাদ), পৃষ্ঠা -২০৬
[১৪১]আলবানি,সহিহুল জামি,৬১৮৯
[১৪২]আদব:সৌভাগ্যের সোপান,পৃষ্ঠা-১০১
[১৪৩]আবু নুআইম,হিলইয়া,১/১০-১১
[১৪৪] মুসলিম, ১/২৯৫৬।
[১৪৫] তিরমিজি,২৩৩৩,;বুখারি, ৬৪১৬
[১৪৬] ইবনু আবি শাইবা,৭/৮৫
[১৪৭]তিরমিজি,২৩২৮
[১৪৮]মিশকাত,৫২৮১;তাবারানি,আল আওসাত
[১৪৯] হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/১৪৯।
[১৫০]আত্মবিচার, পৃ-১৯

[১৫১]মিশকাত,৫২৮১;তাবারানি,আল আওসাত
[১৫২]জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম, ১/১৫১
[১৫৩]আত্মবিচার, পৃ-৩৮
[১৫৪]ইমান সবার আগে, পৃ-৬১
[১৫৫]আহমাদ:১১৭৭৪
[১৫৬]ফাতহুল বারি, ১/১৫
[১৫৭] আত-তারিক ইলাল জান্নাহ, ১/২৬০
[১৫৯]আল্লাহর সন্তুষ্টির সন্ধানে(মিসাকুল আমালিল ইসলামি কিতাবের অনুবাদ), পৃষ্ঠা -১৬৯
[১৫৯]আল্লাহর সন্তুষ্টির সন্ধানে(মিসাকুল আমালিল ইসলামি কিতাবের অনুবাদ), পৃষ্ঠা -১৭৬
[১৬০]মুসতাদরাকে হাকিম:৬৩০৪
[১৬১]আহমাদ,মুসনাদে আহমাদ ১/২৮৫
[১৬২]কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পোশাক, পর্দা ও দেহ-সজ্জা, পৃ-৯৯
[১৬৩]আবু দাউদ;আহমাদ,আল মুসনাদ ৩/৩৮৮
[১৬৪]বায়হাকী,শুআবুল ইমান ৫/১৩৫
[১৬৫]Tafsir Ahsanul Bayan, Greentech app
[১৬৬]কখনো ঝরে যেও না(সিরাত পাবলিকেশন্স), পৃ-৫৯
[১৬৭]সুনানে আবু দাউদ ৪৬৮১
[১৬৮]হাদিসে কুদসি(ইফা),১৩২
[১৬৯]হাদিসে কুদসি(ইফা),১৩৪
[১৭০]বুখারি
[১৭১]আল লু'লু ওয়াল মারজান, ১৭৯১,আল হাদিস অ্যাপ,irdfoundation.com
[১৭২]সংক্ষিপ্ত তাফসিরে মা'আরেফুল কোরআন, পৃষ্ঠা-১৯১
[১৭৩]সংক্ষিপ্ত তাফসিরে মা'আরেফুল কোরআন, পৃষ্ঠা-১৯১
[১৭৪]সংক্ষিপ্ত তাফসিরে মা'আরেফুল কোরআন, পৃষ্ঠা-১৯১
[১৭৫]মুসলিম-৪৫৭৮)
[১৭৬]আল্লাহর সন্তুষ্টির সন্ধানে(মিসাকুল আমালিল ইসলামি কিতাবের অনুবাদ), পৃষ্ঠা-১৫১-৫২
[১৭৭] ২:১৭৮
[১৭৮]ইসলামী আকিদা(IOM),পৃষ্ঠা -৫১
[১৭৯]ইসলামী আকিদা(IOM),পৃষ্ঠা -৫২,৫৩
[১৮০]সংক্ষিপ্ত তাফসিরে মা'আরেফুল কোরআন, পৃষ্ঠা-১৯৪
[১৮১]ইসলামী আকিদা(IOM),পৃষ্ঠা -৪৮-৪৯
[১৮২]সংক্ষিপ্ত তাফসিরে মা'আরেফুল কোরআন, পৃষ্ঠা-১৯৪
[১৮৩]ইসলামী আকিদা(IOM),পৃষ্ঠা -৪৭
[১৮৪]আল্লাহর সন্তুষ্টির সন্ধানে(মিসাকুল আমালিল ইসলামি কিতাবের অনুবাদ), পৃষ্ঠা -৮৮
[১৮৫]আহমাদ,১১৭৭৪
[১৮৬]আল্লাহর সন্তুষ্টির সন্ধানে(মিসাকুল আমালিল ইসলামি কিতাবের অনুবাদ), পৃষ্ঠা -১৭৭
[১৮৭]আল্লাহর সন্তুষ্টির সন্ধানে(মিসাকুল আমালিল ইসলামি কিতাবের অনুবাদ), পৃষ্ঠা -১৫৩